সাত পাকে বাঁধা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. মফস্বল শহরের এক পাশ 2
২. অর্চনা বসু 21
৩. বাসে করেই য়ুনিভার্সিটি 69
৪. ঘরের ইজিচেয়ারে ননিমাধব 110
৫. অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল 137
৬. বড় ক্ষতও আপনি শুকোয় 158
৭. বরুণার বিয়ে 215
৮. বিচ্ছেদের পরোয়ানা 232
০৯. পাখি-ডাকা আবছা 260

১. মফস্বল শহরের এক পাশ

মফস্বল শহরের এক পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা রাস্তার এক মাথা এসে থেমেছে মেয়ে-ইস্কুলের সামনে। উঁচু বাঁধানো রাস্তা। নিচে গঙ্গা। অসতর্ক মুহূর্তে গাড়ি ঘোড়া রাস্তা ছেড়ে যাতে নিচের দিকে না গড়ায় সেইজন্য সে-দিকটায় হাঁটু-উঁচু দেড়-হাত চওড়া বাঁধানো কার্নিস। একটু দূরে দূরে এক-একটা অতিবৃদ্ধ বট-অশ্বত্থ ডালপালা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাকে আড়াল করেছে। অন্য দিকটায় বাড়িঘর, দু-চারটে দোকানপাট, চুন-সুরকির আড়ত, আড্ডিদের মস্ত আমবাগান, কোম্পানি আমলের মুসলমান গোরখানা, পাড়ার ক্লাব-ঘর, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ শেখার ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, কেশ-বাহার আর বাবু-আসুন সেলুন–ইত্যাদি।

সকাল নটা না বাজতে রাস্তাটার ভোল বদলায়। ইস্কুল-মুখী মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণের ঝিমুনিভাব কাটিয়ে যেন সজাগ হয়ে ওঠে। সাদা লাল নীল হলদে বেগুনী ফ্রক আর শাড়ির শোভাযাত্রা শুরু হয়। কিশোরী মেয়েদের কলমুখরতায় লাল গঙ্গা আর লালচে অশ্বত্থ-বটের শান্ত উদাসীনতায় বেশ একটা ছেদ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য।

দোতলার বারান্দায় অথবা ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কোন কোন বাড়ির বউয়েরা খানিক দাঁড়িয়ে অলস চোখে এই প্রাণ-তারুণ্য দেখে। দত্ত স্টেশনারির প্রৌঢ় মালিক চকোলেট লজেঞ্জুস বিস্কুট ডালমুট ভরা কাচের বয়ামগুলির ওধারে এসে দাঁড়ায় চুপচাপ। বয়ামগুলি এবারে খানিকটা করে খালি হওয়ার আশা। বুড়ো মুদি মাখন শিকদার চাল ডাল তেল নুন মসলাপাতি ওজনের ফাঁকে অনেকবার অন্যমনস্ক হয়ে সামনের হাফ-জানালার ভিতর

দিয়ে মেয়েদের যাওয়া দেখে। তার নাতনী আছে একটি। ছেলে নেই। নাতনী বড় হচ্ছে। আর একটু বড় হলে এই মেয়েদের মত সাজিয়ে-গুজিয়ে ইস্কুলে পাঠানো সম্ভব হবে কিনা তাই ভাবে বোধ হয়।

চুন-সুড়কির আড়তের কাছে এসে রাস্তা-ঘেঁষা সুরকির স্তূপের মধ্যে জুতোসুদ্ধ পা ঢুকিয়ে দেয় এক-একটা ফ্রকপরা মেয়ে। ইস্কুলে পৌঁছে পা ধোয়ার একটা কর্তব্য পালন করতে পারবে। তাদের দেখাদেখি আবার আরো ছোট এক-আধজন হয়তো পা ঢুকিয়ে দেয় চুনের ঢিপির মধ্যেই। অন্যেরা শাসন করে তক্ষুনি, পা খেয়ে যাবে মরবি–গঙ্গার জলে ধুয়ে আয় এক্ষুনি।

টাইপ-রাইটিং স্কুলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মুখ দিয়ে টকটক টকটক শব্দ বার করবেই কোন না কোন একদল ছোট মেয়ে। আরো-ছোটরা অনুকরণ করে তাদের। ক্লাব-ঘর পেরুনোর সময় উঁচু ক্লাসের মেয়েরা চেষ্টা করে গম্ভীর হয় একটু। নতুবা দাড়ি-গোঁপের আভাস নির্মমভাবে নির্মূল করে, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ে, ফর্সা ধুতি আর ফর্সা স্যাণ্ডো-গেঞ্জি পরে এই সময়টায় নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে ক্লাব-ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ায় দু-পাঁচজন নতুন বয়সের ছেলে। কেউ কলেজের ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, কেউ বা সেটুকুও ছেড়ে সম্প্রতি শুধুই শরীরচর্চা করছে। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা মুখ গম্ভীর করে এদের প্রতীক্ষার মর্যাদা দেয়। কিন্তু একটু এগিয়ে এরাই আবার মুখে কাপড় গুঁজে হাসে সামনের কেশ-বাহার বা বাবু-আসুন সেলুনের দোর দিয়ে কাউকে ঢুকতে-বেরুতে দেখলেই। বিশেষ করে সদ্য চুল হেঁটে কাউকে বেরুতে দেখা গেলে কম করে বিশ-তিরিশ জোড়া চপল চোখ সেই মাথাটা চড়াও করবেই।

দলে দলে মেয়েরা যায় বই বুকে করে, বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে অথবা বই ভরা ছোট ছোট রঙ-করা টিনের বাক্স দোলাতে দোলাতে। রাস্তা জুড়ে চলে তারা। এরই মধ্যে সাইকেল-রিকশর ভেঁপু কানে এলে দু-পাশে সরে আসে। তার পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে যায়।

মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশয় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে মীরাদি আর প্রভাদি। মীরা সান্যাল, প্রভা নন্দী। ওই দুজনের পক্ষে ওটুকু বসার জায়গা যথেষ্ট নয়। বড় মেয়েরা টিপ্পনী কাটে আর হাসে! ছোট মেয়েরা তাদের হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করে। একটু বাদে আবার শোনা যায় সাইকেল-রিকশর ভেঁপু।

কে আসে?

প্রতিভাদি আর শোভাদি। প্রতিভা গাঙ্গুলী, শোভা ধর। তাদের দুজনের মাঝখানে আবার একটা ছোট মেয়েকে অন্ততঃ বেশ বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। সাইকেল-রিকশ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে দু-পাশ থেকে রাস্তার মাঝখানে জড়ো হয়ে চলতে চলতে বড় মেয়েরা এক-একদিন সেই পুরনো গবেষণায় মেতে ওঠে –উল্টে পাল্টে ঠিক করলেই তো পারে সাইকেল-রিকশ–মীরাদির সঙ্গে প্রতিভাদি, আর প্রভাদির সঙ্গে শোভাদি। নয়তো, মীরাদি আর শোভাদি আর প্রভাদি আর প্রতিভাদি। চিরাচরিত সিদ্ধান্তেই এসে থামতে হয় আবার। অর্থাৎ যার সঙ্গে যার ভাব।

আবার কে আসে?

ও বাবা। মালতীদি আর স্মৃতিদি! মালতী রায়, স্মৃতি কর! হেডমিসট্রেস আর সহকারী হেডমিসট্রেস। সর সর!

রাস্তার দু-পাশ ঘেঁষে চলে মেয়েরা। একটানা ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল রিকশ তরতরিয়ে চলে যায়। সাইকেল-রিকশর চালকও আরোহিণীদ্বয়ের মর্যাদা জানে যেন।

এদিক থেকেই আসেন মেয়ে-স্কুলের বেশির ভাগ টিচার। শেয়ারের মাস ভাড়া সাইকেল-রিকশ, সকালে নিয়ে আসে বিকেলে পৌঁছে দেয়।

শুধু একজন ছাড়া। অর্চনা বসু।

হেঁটে আসে, হেঁটেই ফেরে।

পৌনে দশটা নাগাদ যে মেয়েরা ইস্কুলের কাছাকাছি এসেছে, নিজেদের অগোচরে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাবে তারা। দেখতে পেলে অস্বস্তি, না পেলে উসখুসুনি। ঠিক সময় ধরে এলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হবেই দেখা।

হেঁটে আসে–তবু সামনের মেয়েরা ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝতে পারে অর্চনাদি আসছে। কারণ, যেখান দিয়ে আসে তার আশপাশের প্রাণতারুণ্য হঠাৎ যেন থেমে যায় একটু।

কান সচকিত করা ভেঁপু নেই সাইকেল-রিকশর, তবু সরবার পালা মেয়েদের। পথের মাঝখান থেকে ধারে সরে আসা নয়, ধারের থেকে মাঝখানে বা ও-ধারে সরে যাওয়া। যে আসছে গঙ্গার দিকের কার্নিস দেওয়া রাস্তার ধারটা যেন তার দখলে।

ফ্যাকাসে সাদা গায়ের রঙ। ধপধপে সাদা পোশাক। সাদা ফ্রেমের চশমা। সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড। পায়ে সাদা জুতো। সব মিলিয়ে এক ধরনের সাদাটে ব্যবধান। মেয়েদের আভরণে যে-সাদা রিক্ত দেখায়, তেমন নয়। যে সাদা চোখ ধাঁধায়, প্রায় তেমনি।

বাড়ির বারান্দায় অথবা ঘরের জানালায় বউদের অলস চাউনিতে তখন ঔৎসুক্যের আমেজ লাগে একটু। কিন্তু এ সময়টায় দেওর-ভাসুরদেরও অনেক সময় বারান্দায় বা জানালার দিকে আসতে দেখা যায় বলে তাদের সতর্ক থাকতে হয়। মুদি-দোকানের বুড়ো মাখন শিকদার দোকান ছেড়ে এক-একদিন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। রিকশয় চেপে যে-টিচাররা ইস্কুলে যান–তাঁরা কখন যান চোখে পড়ে না। শুধু এই একজনের সঙ্গে আগামী দিনে তার পড়ুয়া নাতনীর একটা সহৃদয় সম্পর্ক কল্পনা করে মাখন শিকদার। কল্পনা করে, আর ভয়ে ভয়ে দেখে।

দত্ত স্টেশনারির প্রৌঢ় দত্ত ঘাবড়েছিল সেই দু-বছর আগে। সে-ও এই শ্বেতবসনা টিচারটিকে দেখে যত না, তার থেকে বেশি তাঁর সন্নিধানে মেয়েদের চকিত ভাব-ভঙ্গী দেখে। এ আবার কোত্থেকে জ্বালাতে এলো কে–তাকে দেখলে মেয়েগুলো দোকানে ঢোকা দূরে থাক, দোকানের পাশ ঘেঁষেও হাঁটে না যে! অনবধানে দোকানে ঢুকে পড়ার পরে কোন মেয়ের সঙ্গে যদি চোখাচোখি হয়েছে তো সেই মেয়ের মুখ যেন চোরের মুখ। কিন্তু ক-টা দিন না যেতেই মনে মনে খুশীতে আটখানা দত্ত, স্টেশনারির দত্ত। এক এক দঙ্গল মেয়ে নিয়ে ফেরার পথে নিজেই দোকানে ঢুকেছে নতুন শিক্ষয়িত্রী। মেয়েদের চকোলেট লজেন্স ডালমুট কিনে দিয়েছে। দত্ত ঠোঙা ভরেছে আর ভেবেছে, টিচার ঠিক এমনিটিই হওয়া উচিত। তা না, নিজেরা নাক উঁচু করে যাবেন সাইকেল রিকশয়, আর মেয়েগুলো হেঁটে মরুক! লজ্জাও করে না!

কিন্তু দু-বছর বাদে এখন আবার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে দত্ত। বিরক্ত হয় না। শুধু অবাক হয়। কি হল হঠাৎ? দোকানটাকে যেন আর চেনেও না। মেয়েগুলোকেও না। সকালে ওই গঙ্গার দিকের কার্নিস ঘেঁষে ইস্কুলে যায় আর বিকেলে ওই দিক ঘেঁষেই ফেরে। মেয়েগুলোর হাবভাবই বা এমন বদলে গেল কেন? ভাবে, ফাঁকমত জিজ্ঞাসা করবে কোন মেয়েকে।

সে আসছে টের পেলে চুন-সুরকির ঢিপিতে পা গলাতে আসে না একটি মেয়েও। টাইপ-স্কুলের সামনে মুখের টকটক শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ছেলেরা সুটসাট ঢুকে পড়ে ক্লাবরের মধ্যে।

দু-বছর হল অর্চনা বসু এসেছে এই মেয়ে-ইস্কুলে।

তার আসার গোড়ায় কটা দিন যেমন দেখা গিয়েছিল, এখন আবার ঠিক সেই রকমটিই দেখে আসছে মেয়েরা। কোনদিকে না চেয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে আসে। না, ঠিক কোনদিকে না চেয়েও নয়। মাঝে মাঝে গঙ্গার পাড়ের দিকে চোখ পড়ে। জলের ধারে ছোট কোন ছেলেমেয়ে দেখলে থমকে দাঁড়ায়। ইস্কুলের মেয়ে কিনা দেখে লক্ষ্য করে। চুন-সুরকিতে পা ডুবিয়ে অনেক মেয়ে ঘটা করে পা ধুতে যেত। অনেক চঞ্চল মেয়ে আবার আসার পথে খেলার ছলে রাস্তার ধারের সেই হাঁটু-উঁচু কার্নিস থেকে দৌড়ে গঙ্গার পাড়ে নেমে যেত। জলের ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে করতে ইস্কুলের পথে এগোত। বেশি দুরন্ত দুই একটা মেয়ে অনেক সময় জুতো আর বই হাতে করে জলে পা

ভিজিয়ে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভিজে ফ্রক আর ভিজে বই-জুতো নিয়ে ইস্কুলে এসে হাজির হত।

এখন সে-সব বন্ধ হয়েছে।

হেডমিসট্রেস বা সহকারী হেডমিসট্রেস বা অন্য কোন শিক্ষয়ত্রীর তাড়নায় নয়। অর্চনাদির ভয়ে। যাকে একবার নিষেধ করা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয়বার নিষেধ করতে হয় না আর। ছোট বড় সব মেয়েই জানে, অর্চনাদির বিষম জলের ভয়। শুধু তার চোখে পড়ার ভয়েই এখন আর জলের দিকে পা বাড়ায় না কেউ।

চোখে পড়লে কি হবে?

অর্চনাদি রাগ করবে না বা কটু কথাও বলবেন না কিছু। শুধু বলবে, জলের ধারে গেছলে কেন? খেলার তো এত জায়গা আছে। তোমাদের দেখাদেখি আরো ছোটরাও যাবে। আর যেও না।

এটুকুর মুখোমুখি হতেই ঘেমে ওঠে মেয়েরা। অথচ অন্য টিচারদের গঞ্জনাও গায়ে মাখে না বড়। অর্চনাদির বেলায় কেন এমন হয় বুঝে ওঠে না।

মেয়েদের চোখে মহিলাটির এই জল-ভীতির পিছনে অবশ্য ঘটনা আছে একটা।

এখানে আসার পর অর্চনা বসুর প্রথম হৃদ্যত এই ইস্কুলের মালী ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রীর সঙ্গে। ইস্কুল-চত্বরের এক প্রান্তে জোড়া আমগাছের পিছনের আটচালাতে বউ

আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে ভগবান তেওয়ারী। থাকে সবাই জানে। কিন্তু লক্ষ্য করে না কেউ। লক্ষ্য করার কারণ ঘটেনি কখনো।

ঘটল অর্চনা আসার পর।

টিফিনের সময়টুকু সহ-শিক্ষয়িত্রীদের জটলা এড়িয়ে নিরিবিলিতে কাটানোর জন্যে অর্চনা এই জোড়া আমগাছের ছায়াটুকু বেছে নিয়েছিল। বই হাতে সেখানে এসে বসত। ইস্কুল-বাড়ি থেকে অনেকটাই দূর। তাই কারো চোখেই এটা স্বাভাবিক লাগেনি খুব। মেয়েরা প্রথম প্রথম সসম্ভ্রমে দেখত দূর থেকে। টিচাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতেন আর মুখ টিপে হাসতেন।

অর্চনা বই খুলে বসত বটে, কিন্তু পড়া হত না। আমগাছের পিছনের আটচালায় দুটো ছেলেমেয়ের দস্যিপনার আভাস পেত। মাঝে মাঝে ছুটোছুটি করতে দেখত তাদের। ছেলেটার বছর সাতেক হবে বয়স, মেয়েটা বছর তিনেকের। দুটোই সমান দুরন্ত। কিন্তু দুরন্তপনা ভুলে এক-একদিন বেশ কাছে দাঁড়িয়েই হাঁ করে তারা ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখত। অর্চনা বই থেকে মুখ তুলতেই আবার ছুটে পালাত। আটচালার ভিতর থেকে ওদের মায়ের মুখখানাও মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দেখা যেত। ইস্কুলের অত বড় বাড়ি ছেড়ে এই গাছতলায় বসে বই-পড়াটা দুর্বোধ্য লাগত বোধ হয়।

একদিন ওই ছোট মেয়েটার আচমকা আর্ত চিৎকারে বই ফেলে অর্চনাকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল। ছাপরা ঘরের ভিতর থেকেই আসছে শব্দটা। মেয়েটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে যা দেখল, চক্ষুস্থির। গোবর লেপা মাটির মেঝেতে

মেয়েটাকে চিত করে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে ছেলেটা। মেয়েটা যত চেঁচায় ছেলেটার তত ফুর্তি।

ঘরের ভিতরে ঢুকে এক হ্যাঁচকায় ছেলেটাকে টেনে তুলল অর্চনা। মেয়েটার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ততক্ষণে ওদের মা-ও এসে ঘরে ঢুকেছে। আধভেজা কাপড়ে অনুমান, কুয়োতলায় ছিল। অর্চনাকে বলতে হল না কিছু, নিজেই দেখেছে ছেলের কাণ্ড। ছেলেটাকে একটু কড়া সুরেই ধমক দিল অর্চনা, ওর বুকের ওপর চেপেছিল কেন, মরে যেত যদি?

মরে যাওয়া-টাওয়া বোঝে না, কিন্তু বোনের বুকে চেপে বসার এই ফলটা ভয়ানক অপ্রত্যাশিত। হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। আর একরত্তি মেয়েটাও ব্যথা ভুলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক-নেত্রে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। অদূরে আধ-হাত ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের মা।

অর্চনার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে গাছতলায় বই নিয়ে বসল আবার। কিন্তু বইয়ে চোখ দেবার আগেই ছেলেটার বিকট কান্নায় সচকিত হয়ে উঠল। মায়ের শাসন শুরু হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু এ কি রকম শাসন। মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে।

থাকতে পারল না। আবার উঠতে হল। এগোতে হল। ভগবান তেওয়ারীর বউয়ের মাথার ঘোমটা গেছে। ফর্সা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। দেড়হাত প্রমাণ একটা সরু ডাল দিয়ে বেশ আয়েস করে ছেলে পিটছে সে। ছেলেটা মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার

করছে। মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই, ওইটুকু শরীরে জায়গা বেছে বেছে জুতমত ঘা বসাচ্ছে। বোনের বুকে চেপে বসে ছেলে কতটা অন্যায় করেছে সেটা সে নিজেও সঠিক উপলব্ধি করেনি। এমন একটা অন্যায় করেছে যার দরুন গাছতলা থেকে ওই সাদা পোশাকের মাস্টার বিবিকে উঠে আসতে হয়েছে–এটুকুই শুধু বুঝেছে। তাই শাসন তেমনি হওয়া দরকার।

তীক্ষ কণ্ঠে ধমকে উঠল অর্চনা।–ও কি হচ্ছে! মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে?

চমকে ফিরে তাকালে ভগবান তেওয়ারীর বউ। থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে ছড়ি হাতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওটা ফেলো হাত থেকে।

ফেলে দিল।

ধুলোমাটি মাখা শরীরে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। নাকের জলে চোখের জলে একাকার। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় কাঁদতেও পারছে না, হেঁচকি তুলছে শুধু। ছোট মেয়েটা এক কোণে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছে।

মায়ের উদ্দেশে এবারে একটু নরম সুরে অর্চনা বলল, এমন করে মারে! বুঝিয়ে বলতে হয়।

ফিরে আসতে গিয়েও ছেলেটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। দুই এক মুহূর্তের সঙ্কোচ কাটিয়ে তার হাত ধরে ডাকল, আয় আমার সঙ্গে।

গাছতলায় এসে বসল। ওকে বলল, বোস–।

হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছতে মুছতে ছেলেটা বসল। ভড়কেই গেছে একটু। অর্চনা বই হাতে তুলে নিল। পড়ার জন্যে নয়, এমনি। চোখ পড়ল ছেলেটার ধুলোমাখা পিঠের ওপর। দাগড়া দাগড়া দাগ পড়ে গেছে, ফুলে উঠেছে এক-এক জায়গা। অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠল। ওর মায়ের ওপর রাগে লাল হয়ে উঠল প্রথমে। তারপর নিজের ধপধপে সাদা রুমাল বার করে পিঠটা মুছে দিল। রুমালটা ওর হাতে দিয়ে বলল, চোখমুখ মুছে ফেল বেশ করে, দুষ্টুমি করিস কেন?

ছেলেটা চেয়েই আছে। তার কচি পিঠের মারের দাগগুলোর ফলাফল বুঝলে খুশী হত। ফর্সা রুমালটা ময়লা মুখে লাগাতে সঙ্কোচ। অর্চনা আবার বলল, মুছে ফেল, রুমালটা তোকে দিলুম।

মুখ মুছে একটা সম্পত্তি হাতে নিয়ে বসে থাকার মতই রুমাল হাতে করে বসে রইল ছেলেটা।

তোর নাম কি?

গণেশ।

তোর বোনের নাম কি?

লছমী।

তোর বাবার নাম কি?

ভগোয়ান।

তুই পড়িস?

মাথা নাড়ল। পড়ে না।

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। অর্চনা বই হাতে করে উঠে দাঁড়াল।– আচ্ছা, এবারে ঘরে যা।

পরদিন সকালে গ্লাস-কেসের ওপারে দাঁড়িয়ে অন্য সব দিনের মতই বিদ্যার্থিনীদের মিছিল দেখছিল দত্ত স্টেশনারির দত্ত। কলরব থামিয়ে মেয়েদের ঘন ঘন পিছন ফিরে তাকানো দেখে বুঝেছিল তিনি আসছেন। রাস্তার ওপাশ থেকে এ-পাশে সরে আসা দেখেও বুঝেছিল, আসছেন তিনি। অর্চনা ইস্কুলে যোগ দিয়েছে তিন সপ্তাহও হয়নি তখনো। কিন্তু তার যাওয়া-আসার স্বাতন্ত্র্যটুকু মফস্বল শহরের এই পথে তিনদিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিন সপ্তাহ তো অনেক দিন। পসারের দিক থেকে কাল্পনিক বাধা ভেবে দত্তর মনোভাব বিরূপ তখনো।

কিন্তু দত্ত হকচকিয়ে গিয়েছিল সে-দিন।

রাস্তার ও-পার দিয়ে দোকানটা ছাড়িয়ে যাবার মুখে অর্চনা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘুরে দোকানটাকে দেখেছিল দুই এক বার। দত্ত ভেবেছিল, কোন মেয়ে ঢুকেছে কিনা তাই দেখছে। কিন্তু না। রাস্তা পেরুলো। দোকানে ঢুকলো।

টফি আর লজেন্স কিনল। ছোট ছোট কলের পুতুল কিনল দুটো। তারপর দোকানের চারদিকে দেখল একবার, আর কি নেওয়া যায়। এক কোণে ঝকঝকে ট্রাই-সাইকেলটার ওপর চোখ পড়ল। দত্তর মনে হল ওটাই চাইবে। কিন্তু কি ভেবে মত পরিবর্তন করল বোধ হয়। একটা রবারের বল নিল শুধু। কাগজের বাক্সয় পুতুল আর বল প্যাক করে দিয়ে হাত কচলাতে লাগল দত্ত।

আমগাছতলায় বই খুলে বসে অনেকক্ষণ কান পেতে ছিল অর্চনা! কিন্তু পিছনের চালাঘরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। মালীর ঘরে কাল ঢুকে পড়েছিল, ঢুকতে হয়েছিল বলে। আজ সঙ্কোচ। মালীর বউটা অবাক হবে...।

অর্চনা বসুর তাগিদ কোথায় ও জানে না। কেউ জানে না। ওই মালীর ঘরেই আজও না এসে পারবে না। না এসে পারেনি।

পিছনের গলি-পথ দিয়ে ঠিক সেই সময় ছেলেমেয়ে নিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে চান সেরে ফিরেছে ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রী। সিক্ত ছাপা শাড়ি ভিজে গায়ে লেপটে আছে। টানাটানি সত্ত্বেও মনমত ঘোমটা উঠল না মাথায়। ছেলেটা একটু থতমত খেয়েই এক দৌড়ে ভিতরের উঠোনের দিকে গা-ঢাকা দিল। ভিজে প্যান্ট ছেড়ে ফেলেছিল–সামনেই সেটা আবার টেনে তোলার বিড়ম্বনা ভোগ করতে রাজী নয়।

ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে ভাব হতে এর পর তিন দিনও লাগেনি। গাছতলায় এসে বসলেই দুটিতে এসে হাজির হয়। কোন কোন দিনে আগেই আসে। গাছতলায় ছুটোছুটি করে আর টিফিনের ঘণ্টার প্রতীক্ষা করে। অর্চনা খালি হাতে এলেও অবিশ্বাসভরে লজেন্সের ঠোঙা বা রুমালে টফির ঠোঙার সন্ধান করে। ভাইবোনের রেষারেষিও কম নয়। ছেলের জন্যে বই-স্লেট আনার ফলে মেয়ের জন্যেও আনতে হয় আর এক দফা। টিফিনের এই এক ঘণ্টার মধ্যে সামনে বসে একটু পড়াশোনাও করতে হয় গণেশচন্দ্রকে।

সাবিত্রীর লজ্জা কমেছে। দেখলেই আর ঘোমটা টানে না এখন। তবে তার সঙ্গে দেখা বড় হয় না। শালপাতায় করে মাঝে মাঝেই আমের আচার, লেবুর আচার, লঙ্কার আচার পাঠায় আমগাছতলায়। আর অবাক হয়ে এই অদ্ভুত শিক্ষয়িত্রীর কথা ভাবে। আট বছর ধরে সংসার পেতে বসেছে এখানে। এমন তো কখনো দেখেনি।

আমগাছতলার ব্যাপারটা ইস্কুলের মেয়েরা প্রথম প্রথম দেখেছে, দূর থেকে। তার পর সহ-শিক্ষয়িত্রীরা দেখেছেন। ভগবান মালীর পরিবারের সঙ্গে অর্চনা বসুর হৃদ্যতা বেশ কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের কাছে। তবে, মেয়েদের অর্চনাদির সম্বন্ধে শুধু কৌতূহলই বেড়েছে। অর্চনাদি ছেলেমেয়ে ভালবাসে কত, এ কয় মাসে সেটা তারা নিজেদের দিয়েই বুঝেছে। তার এই ধপধপে সাদা সাজসজ্জা সত্ত্বেও মেয়েদের সঙ্গে এমন সাদাটে ব্যবধান গড়ে ওঠেনি তখনো। বিশেষ করে খুব ছোট মেয়েদের সঙ্গে। ইস্কুলের মধ্যেই খপ করে এক-একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে কাঁধে তুলে নেয়। ক্লাসের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে টেনে কোলে বসিয়েই হয়তো ক্লাসের পড়া শুরু করে

দেয়। ছোটবড় দু-পাঁচটা মেয়েকে তে রোজই বাড়ি নিয়ে যায়। চকোলেট দেয়, লজেন্স দেয়, বিস্কুট দেয়।

...কিন্তু তা বলে মালীর ছেলেমেয়ে!

অর্চনা বসুর রকম-সকম দেখে প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন অন্য টিচাররা। নীরব বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাঁরা। অন্তরঙ্গ হতেও চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁদের ভিতরের কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো বন্ধুত্ব জমেনি। উল্টে বিচ্ছিন্নতাই এসেছে এক ধরনের। নিজেদের মধ্যে অনেক জটলা করেছেন এই নবাগতাকে নিয়ে। চেহারা-পত্র, চালচলন, পুওর ফাণ্ড-এ মোটা চাঁদা দেওয়ার বহর দেখে তো বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হয়। বড়লোক না হোক, নামজাদা লোকের মেয়ে যে সেটা এখন সবাই জানে। এম. এ পাস। দেখতে সুশ্রী। শুধু সুশ্রী নয়, বেশ সুন্দর। কিন্তু বয়েস ঠিক বোঝা না গেলেও খুব কম তো হবে না বোধ হয়। বিয়ে হয়নি কেন? আড়ালে কানাকানি করেন তাঁরা, হাসাহাসি করেন। মেয়েদের নিয়ে এসব কী কাণ্ড!

শেষে এই মালীর ছেলেমেয়ে নিয়ে! বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি!

সংস্কৃতর টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলীর সঙ্গে বেশি ভাব বিজ্ঞানের টিচার শোভা ধরের। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর–পড়ান বিজ্ঞান। সাইকেল-রিকশয় ফিরতি পথে সঙ্গোপনে বলেন প্রতিভা গাঙ্গুলিকে।–আসলে এটা একটা রোগ। আমি বইয়ে পড়েছি। মনের রোগ। ওই ছত্রী মালীটাকে লক্ষ্য করে দেখেছ? ছাঁদ-ছিরি আছে–

বুঝতে সময় লেগেছিল সংস্কৃতর টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলির। বুঝে একেবারে হাঁ করে ফেলেছিলেন তার পর। বিস্ময়াতিশয্যে ফিসফিস করে বলেছেন, তা যদি হবে তাহলে কল্যাণীদির ওই ভাইকে আমল দিচ্ছে না কেন? অমন সুন্দর চেহারা, অমন শিক্ষিত ভদ্রলোক, তার ওপর সেক্রেটারির ভাইপো...

তাহলে আর রোগ বলছি কেন। বান্ধবীর সংশয়ে ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শোভ ধর– রোগ হলে ওই রকমই হয়। আমি পড়েছি।

বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি প্রতিভা গাঙ্গুলি। তবে প্রতিবাদ করতেও ভরসা হয়নি আর। মনোবিজ্ঞান-পড়া বান্ধবীকেই রোগে ধরেছে কি না, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে সেই খটকাও লেগেছিল সংস্কৃত টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলির মনে।

আরো দেড় বছর কেটেছিল এইভাবে। তার পর সেই অঘটন।

ইস্কুলের পিছনেই গঙ্গার বাঁধানো ঘাট। বাইরের অনেকেই চান করে সেখানে। বিশেষ করে আশেপাশের খড়ো ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা। দুপুরে টিফিনের সময় ইস্কুলের ছোট মেয়েদের খেলার আর বড় মেয়েদের বসার জায়গা ওই ঘাট।

ঘাটের দু-পাশের উঁচু উঁচু ধাপগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা-নামা করে ছোট মেয়েরা। শীতকালে জল অনেকটা নিচে থাকে। কিন্তু বর্ষায় ওই সিঁড়ির অর্ধেকটা তো ডোবেই, উঁচু ধাপগুলোরও দুদিক ছাপিয়ে জল উঠে আসে।

এই গেল-বর্ষায় এক দুপুরে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘাটে চান করতে এসেছিল ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রী।

রোজ দুপুরেই আসে। সেদিনও এসেছিল।

ছাপা শাড়ির আট হাত ঘোমটা টেনে পাকলে চান করাচ্ছিল লছমীকে। ছেলেটা নতুন সাঁতার শিখেছে, তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া ভার।

সেই দুপুরে বর্ষার ভরা গাঙের বিষম স্রোত আট বছরের ছেলেটাকে টেনে নিয়ে গেল।

তার মায়ের বুক-ফাটা কান্নায় আর চিৎকারে গোটা ইস্কুলটাই ভেঙে পড়ে ছিল এই ঘাটে। কোথা থেকে কত লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক নেই।

গণেশকে তোলা গিয়েছিল অনেক পরে। অনেক দূরে। নিষ্প্রাণ কচি দেহ আপনি ভেসে উঠেছিল।

এদিকে ঘাট থেকে নড়ানো যায়নি সাবিত্রীকে। ঘাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিল।

তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছিল, ওই শোকার্ত মায়ের দিকে চেয়ে দুই গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছে আর একজনেরও।

সেদিন আর ক্লাস নিতে পারেনি অর্চনা বসু।

তার পরদিন থেকে টিফিনের সময় তাকে আর সেই আমতলায় গিয়েও বসতে দেখেনি কেউ।

এর পর গঙ্গার দিকে যতবার চোখ গেছে ততবার যেন শিউরে শিউরে উঠেছে অর্চনা। বর্ষার লাল জলে শিশুদেহগ্রাসী লালসার বিভীষিকা দেখেছে।

...মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে, ছুটোছুটি করে ওই ধাপগুলোর ওপর। ফসকে বা টাল সামলাতে না পেরে একবার ও-পাশে পড়লে–

আতঙ্কে অস্থির হয়ে অর্চনা দৌড়ে গেছে হেডমিসট্রেসের কাছে। টিফিনে মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। বড় মেয়েরা গেলে ছোট মেয়েরাও যাবে –সেটা অত্যন্ত ভয়ের কথা।

হেডমিসট্রেস অবাক। বলেন, কিন্তু ওই মালীর ছেলেটা তো চান করতে গিয়ে ডুবেছে। মেয়েদের আটকাব কেন?

ভয়ের কি আছে আর কেন আটকানো দরকার অর্চনা বুঝিয়ে দেয়। তার সেই বোঝানোর আকূতি দেখে মনে হবে, যেন আর একটি ছোট মেয়েকেই বোঝাচ্ছে সে।

হেডমিসট্রেস চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন খানিক। পরে বলেন, আচ্ছা, আমি তাদের সাবধান করে দেব।

কিছু বলার জন্যেই বলা। নইলে কিছুই তিনি করবেন না জানা কথা। উদার মত-পন্থিনী প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোন কল্পিত ভয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজী নন।

কিন্তু অর্চনা বসুর চোখে এ ভয়টা ভয়ই।

কাজেই, যা করবার নিজেই করতে বসল। একদিন দুদিনে কাজ হল না, কিন্তু চার পাঁচ দিনের মধ্যে হল। অর্চনা বসু তো মাস্টারি করে বাধা দিতে যায়নি কোন মেয়েকে। তার নিষেধের মধ্যে অব্যক্ত অনুনয়টুকুই বাধা হয়ে উঠেছিল বড় মেয়েদের কাছে। অবশ্য একবারেই ঘাটের মায়া ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তারা। কিন্তু অর্চনাদির চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছে। অনুযোগভরা ওই ঠাণ্ডা দু-চোখের অস্বস্তি তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘাটে আসা ছেড়েছে আর নিচু ক্লাসের ছোট মেয়েদেরও আগলে রেখেছে। ফলে টিফিনের সময় ঘাট খাঁ খাঁ করে এখন।

মেয়েরা জেনেছে অর্চনাদির জলের ভয় খুব। কিন্তু সহশিক্ষয়িত্রীরা মুখ টিপে হেসেছে। কানে কানে ফিসফিস করেছে মীরাদি আর প্রভাদি, প্রতিভাদি আর শোভাদি। বিজ্ঞানের টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর তার মত বদলেছেন একটু। রোগ ঠিকই, কিন্তু যে রোগ ভেবেছিলেন সে-রোগ নয়। ভগবান তেওয়ারীর ওই কচি ছেলেটা জলে ডোবায় কয়েকদিনের মধ্যেই মত বদলাবার মত কারণ কিছু ঘটেছিল। অর্চনা বসুর এই বাৎসল্যজনিত আতঙ্কের পিছনে অন্য কিছু আভাস পেয়েছেন সকলেই।

বিস্ময়কর কিছুর।

২. অর্চনা বসু

বড় নির্মমভাবে ধরা পড়েছে অর্চনা বসু।

এক ডানা-ভাঙা পাখি যেন ধরা পড়েছে একদল দুরন্ত অবুঝের হাতে।

এত কাছে থেকেও একদিন যাঁরা তাঁর হদিস পাননি, দিগন্ত-ঘেঁষা নীলিমার ব্যবধান কল্পনা করেছেন ঈর্ষাতুর সম্ভ্রমে–হঠাৎ এই আবিষ্কারের বিস্ময় তাঁদের আনন্দের কারণ হবে বইকি। তাঁদের প্রগলভ কৌতূহলে একটা দুমড়নো ব্যথা খচখচিয়ে উঠলেও মৌন যাতনায় সেটা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। ডানা-ভাঙা পাখির মতই মুখ বুজে একপাশে সরে থাকতে চেয়েছে অর্চনা বসু। সরে থাকতে চাইছে।

মনের নিভৃতে অতলে সারাক্ষণ আলেয়ার যে আলো জ্বলে তারই মায়ায় নিজেকে উদঘাটিত করে ফেলেছিল।

করে ধরা পড়েছিল।

কিন্তু সে-মায়ার প্রলোভন একদিনের নয়। গোপন প্রশ্রয়ে দিনে দিনে বুকের কাছটিতে এসে জমেছিল। ইশারায় বিভ্রান্ত করেছিল। এখানে আসার পরেও একটানা প্রায় দু-বছর যুঝেছিল অর্চনা বসু। দু-বছরের প্রত্যেকটা দিন।

আর এই দু-বছর ধরেই তার আত্মমগ্নতার একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ দেখে এসেছেন অন্য সকলে। সেই প্রথম যেদিন অর্চনা বসু পা দেয় এই মেয়ে-ইস্কুলে সে-দিন থেকেই।

এই দু-বছরের চিত্রটি আগে আর একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার।

সেও ছিল এক ভরা দুর্যোগের দিন।

সকাল থেকে এক ফোঁটা আকাশ দেখা যায়নি। কালি বর্ণ মেঘ গোটা দিন বর্ষানোর পরেও পাতলা হয়নি। দুপুর থেকেই খেয়া পারাপার বন্ধ ছিল। ওপার থেকে এপারে আসতে হলে ট্রেনে ব্রীজ পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

সকলেই ভেবেছিলেন ইন্টারভিউ আর সে-দিন হল না। যাঁদের ডাকা হয়েছে তাঁরা আসবেন কেমন করে? তবে স্থানীয় বা আশপাশ থেকে যে দু-তিনজনকে ডাকা হয়েছে তাঁরা আসতে পারেন। হেডমিসট্রেস অবশ্য কমিটিকে, অন্যথায় সেক্রেটারিকে টেলিফোনে জানিয়েছেন ইন্টারভিউ হবে। কারণ, এই দুর্যোগ মাথায় করেও যাঁরা আসবেন তাঁদের ফেরাবেন কি বলে?

তাঁর আগ্রহের কারণও ছিল একটু। পদ-প্রার্থিনীদের মধ্যে তাঁর এক বান্ধবী আছেন। তিনি এসেই আছেন, এবং যথাসময়ে হাজিরও দেবেন। জলের দরুণ মনে মনে তেমনি খুশী হয়েছিলেন বিজ্ঞানের টিচার শোভা ধর। ইন্টারভিউ দেবার জন্য তাঁরও এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া তাঁর বাড়িতেই এসে উঠেছেন। যথাসময়ে তিনিও আসছেন।

কোন ক্লাসেই সেদিন দু-তিনটির বেশি মেয়ে আসেনি। ছাতা সত্ত্বেও তারা ভিজে চুপসে এসেছে আর এসেই টিচারদের কাছে কড়া ধমক খেয়ে সেই অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে এবং প্রসন্ন চিত্তে টিচাররা নিজেদের ঘরে বসে জল দেখছিলেন আর জটলা করছিলেন।

কর্মপ্রার্থিনীদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল একে একে।

সাতজনের মধ্যে পাঁচজন এসে গেলেন। হেডমিসট্রেস আর শোভা ধর দেখলেন তাঁদের বান্ধবী বা আত্মীয়ার মত চালাক প্রায় সকলেই। আগে থাকতেই যে-যার আত্মীয়-পরিজনের কাছে এসে উঠেছিলেন নিশ্চয়। টিচারদের ঘরেই তাঁদের বসার ব্যবস্থা। টুকরো টুকরো আলাপ পরিচয় চলল। কে কোথা থেকে আসছেন, কোথাও কাজ করছেন কি না, ইত্যাদি। শিক্ষয়িত্রীদের সহজতায় পদপ্রার্থিনীদের সঙ্কোচ বাড়ছে বই কমছে না।

সেক্রেটারি রামতারণবাবু হেডমিসট্রেসের টেলিফোন পেলেন আবার। সাতজনের মধ্যে পাঁচজনই এসে গেছেন। অতএব যেতে হয়। বুড়ো মানুষ, চাদরমুড়ি দিয়ে আয়েশ করে গড়গড়া টানছিলেন আর বৃষ্টিঝরা আকাশ দেখছিলেন। কিন্তু গড়গড়া ছেড়ে এ দুর্যোগে আবার বেরুতে হবে বলে বিরক্তি নেই একটুও। বরং হেডমিসট্রেসের টেলিফোন পেয়ে খুশী।...ভবতারণ গার্লস স্কুলের চাকরি, ঝড়জল মাথায় করেও আসবে বই কি সব ইন্টারভিউ দিতে। পাঁচজন এসেছে, গিয়ে হয়তো শুনবেন আর দুজনও এসে গেছে।

চাকরকে ডেকে তিনি গাড়ি বের করতে বললেন।

খুশী হওয়ার কারণ আছে রামতারণবাবুর। এই ছোটখাটো উপলক্ষ থেকেই ইস্কুলের কদর বোঝা যায়। বাছাই করা কোনো টিচার উন্নতির বা ভবিষ্যতের আশায় অন্যত্র চলে গেলে বিলক্ষণ রেগে যান তিনি। তবু বছরে দু-বছরে এ রকম এক-আধজন তো যায়ই। এবারেও ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রীটি কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেছেন বলেই নতুন শিক্ষয়িত্রী নিতে হচ্ছে। কিন্তু এই ইস্কুলে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব হয় না তা বলে। বরং একজন গেছে বা যাচ্ছে শুনলে বাড়িতে সুপারিশের হিড়িক পড়ে যায়।

গোটা শহরে একটাই মেয়ে-ইস্কুল। সমস্ত জেলায় নামডাক। মেয়েদের একটা হোস্টেল করে দিলে বাইরে থেকেও কত মেয়ে পড়তে আসত ঠিক নেই। এ-জন্যেও অনেক আবেদন নিবেদন এসেছে সেক্রেটারির কাছে। কিন্তু এমনিতেই ইস্কুল ভর-ভর্তি, বছরের গোড়ায় ভর্তি হতে এসে ফিরে যায় অর্ধেক মেয়ে– হোস্টেল খুলবেন কি। ইস্কুলের এত সুনাম শুধু শিক্ষকতা বা বাৎসরিক ফলাফলের দরুনই নয়। সরকারের থেকে এক পয়সা সাহায্য না নিয়েও সরকারী ইস্কুলের দেড়গুণ মাইনে আর কোন ইস্কুলের টিচার পায়? কাগজে একটি শিক্ষয়িত্রী-পদের বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত এসেছিল দেড়-শ। ডাকা হয়েছে সাতজনকে। নেওয়া হবে একজন।

রামতারণবাবু একেবারে মিথ্যে অনুমান করেননি। তিনি এসে পৌঁছুবার আগে সাতজন পদপ্রার্থিনীর বাকি দুজন না হোক, আর একজন এসেছিল।

অর্চনা বসু এসেছিল।

তিন দাগ কাটা একটা ঝরঝরে ঘোড়ার গাড়ি বাগান পেরিয়ে টিচার্স-রুমের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে সকলেই বুঝেছিলেন ঝড়-বাদলা উপেক্ষা করে আর একজন এলো ইন্টারভিউ দিতে। যে পাঁচজন এসে আছেন তাঁদের সকলকেই যে যাঁর মত ওজন করে নিয়েছেন শিক্ষয়িত্রীরা। নতুন কৌতূহলে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চোখ ফেরালেন তাঁরা।

অর্চনা বসু নামল। গায়ে কাচ-রঙের হালকা লেডিস বর্ষাতি। ভিজে সপসপ করছে। মাথা-ঢাকা সত্ত্বেও জলের ঝাপটা থেকে মুখ বা সামনের চুলের গোছ বাঁচেনি। ভাড়া মিটিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো হলঘরের দিকে।

হল-জোড়া বড় টেবিলের সামনের দিকে বসেন কল্যাণীদি। ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী সকলেরই দিদি। এমন কি হেডমিসট্রেসেরও। বয়সের দরুন নয়, বয়স বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের এধারেই হবে। রামতারণবাবুর ভাই-ঝি তিনি, ভবতারণ মিত্রের মেয়ে–যাঁর নামে এই ইস্কুল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।

আর যাঁরা ইন্টারভিউ-এর জন্য এসেছেন তাঁদের চোখে পড়ল সেটুকু। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কেউ কিনা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। অন্যান্য টিচাররা জানেন, তা নয়। কিন্তু নীরব আগ্রহে ঘাড় ফিরিয়েছেন তাঁরাও।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল অর্চনা বসু। বর্ষাতিটা বেজায় ভেজা গা থেকে খুলে ফেলল ওটা, কোথায় রাখা যায় ঠিক বুঝতে না পেরে ঈষৎ কুণ্ঠায় কল্যাণীদির দিকে তাকাল।

বর্ষাতি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা সাদার মায়া ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাচ-রঙা বর্ষাতির আড়ালে এই সাদারই আভাস পাচ্ছিলেন সকলে। সেটা সরে যেতেই সাদায়-সাদায় একাকার। খুঁটিয়ে দেখলে এই সাদার পরিপাটিতে আতিশয্যটুকু বড় হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তার বদলে একটা অভিব্যক্তি বড় হয়ে উঠল।

হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বর্ষাতিটা নিলেন কল্যাণীদি। দরজার আড়ালে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখলেন সেটা। হালকা আনন্দে সুশোভন কিছু বলেও বসতে পারতেন কল্যাণীদি। মহিলা সুরসিকা। চেনা-অচেনা সকলের সঙ্গেই সহজে জমিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু সহজ হওয়া গেল না, চেষ্টাও করলেন না। সাদরে ভিতরে এনে বসালেন শুধু।

আলাপ-সালাপ হল একটু-আধটু। আর পাঁচজনের সঙ্গে যেমন হয়েছে, প্রায় তেমনি। সেদিক থেকেও কোন ত্রুটি চোখে পড়েনি কারো। বরং ওই বেশবাসের মতই পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে। তবু টিচাররা বেশ একটু ব্যবধান অনুভব করেছিল সেই প্রথম দিনেই। সেটুকুই আর ঘোচেনি। বরং বেড়েছে।

ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে যেন ওখান থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই নির্বাচনে নীরবে অংশগ্রহণ করেছেন টিচার্স রুমের সকলেই। যাঁরা এসেছেন ইন্টারভিউ দিতে তাঁরাও। শিক্ষয়িত্রীরাও। শেষ পর্যন্ত ক-জন এলো না-এলো খোঁজ করতে এসেছিলেন হেডমিসট্রেস মালতী রায়। নাম লিখে নিতে এসেছিলেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই চোখও ওই একজনের মুখের ওপরে গিয়ে আটকেছিল। একে একে নাম লিখে নিয়েছেন তারপর। কিন্তু লেখার যেন আর দরকার বোধ করেননি খুব।

অনুমানে ভুল হয়নি। চাকরি অর্চনা বসুই পেয়েছে। চারজনের সিলেকশন কমিটি। সেক্রেটারি রামতারণবাবু, তাঁরই সমবয়সী অবসরপ্রাপ্ত এক প্রফেসার বন্ধু, ভাইপো নিখিলেশ–বাইরের এই তিনজন। ভিতর থেকে হেডমিসট্রেস মালতী রায়। ইন্টারভিউ-এর একরাশ দরখাস্ত যাচাই বাছাই করার দায়িত্ব ছিল হেডমিসট্রেসের ওপর। এই কর্তব্যপালনে সতোর কার্পণ্য করেননি– নিজের বান্ধবী পদপ্রার্থিনী, তা সত্ত্বেও না। কিন্তু নির্বাচনের আসরে বান্ধবীর জন্য পরোক্ষে যুঝতেও ছাড়েননি তিনি। যথার্থই সেটা বান্ধবীর জন্যে কি আর কোন কারণে সঠিক বলা শক্ত। অর্চনা বসুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রাধান্যে কোন ছায়া পড়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন কি না তিনি জানেন। যদি পড়েও থাকে, সেটা রূপেরও নয়, যোগ্যতারও নয়। টিচারদের মধ্যে রূপসী তাঁর থেকে প্রায় সকলেই। অন্যদিকে, তাঁর যোগ্যতা আর কর্মতৎপরতা বিবেচনা করেই স্কুল-কমিটি নিজ-খরচায় তাঁকে বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর আসনে পাকাপোক্তভাবে বসিয়েছেন।

তবু একট হয়তো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন হেডমিসট্রেস মালতী রায়।

সেক্রেটারি বা অন্য বৃদ্ধটির জন্যে তেমন ভাবেননি তিনি। তাঁর অমতে কিছু একটা করে বসতেন না তাঁরা। অন্তত তাঁর মতামতটা ভেবে-চিন্তে দেখতেন। কিন্তু বাধ সেধেছিল তৃতীয় লোকটি। লোকটি কেন, মালতী রায় মনে মনে ছোকরাই ভাবেন তাকে।– নিখিলেশ। সেক্রেটারির ভাইপো, যাঁর নামে এই স্কুল তার ছেলে। কল্যাণীদির বৈমাত্রেয় ভাই। কল্যাণীদির চেয়ে অনেক ছোট, বয়স তিরিশের নিচেই। এম. এস-সি পাস, সুদর্শন। বড়লোকের ছেলে হলেও উদ্যম আর কর্মঠ বলে পাঁচজনে সুখ্যাতি করে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল বছর দুই, মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এইখানেই কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এরই মধ্যে রোজগারও ভালই বলতে হবে। দিনের মধ্যে বহুবার নিজের ছোট একটা মার্কামারা হলদে গাড়িতে শহরময় চক্কর খেতে দেখা যায় তাকে। দু তিনটে বড় বড় ফ্যাক্টরিতে মাল সরবরাহ করে–এই কাজে মোটর হাঁকিয়ে কলকাতায় আসে সপ্তাহের মধ্যে কম করে চার দিন। স্থানীয় বাড়িঘরের কোন কাজ হলে ডাক পড়বেই তার। ইস্কুলের পুরনো দালানটাকেও ঢেলে নতুন করা হয়েছে তারই পরিকল্পনায় আর তত্ত্বাবধানে। নিজের যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুক, বাবার নামের ইস্কুলটির যে-কোন প্রয়োজনে সে এক ডাকে হাজির।

এই নিখিলেশ দত্তও সিলেকশন কমিটির একজন। সে-ই বাদ সেধেছিল। সে-রকম আশঙ্কা অবশ্য মালতী রায় আগেই করেছিলেন। অর্চনা বসুকে টিচার্স-রুমে দেখার পরেই। কমিটির আলোচনায় তাকে নিয়ে যে সংশয়ের কথা তিনি বলেছিলেন, ছেলেটা এক কথায় সেটা নাকচ করে দিয়েছে। যেন সেটা কোন সমস্যাই নয়। অথচ অর্চনা বসুর ইন্টারভিউ-এর আগে পর্যন্ত তার হাবভাবে বেশ আশান্বিত হয়েছিলেন মালতী রায়। একে একে যে কজন ইন্টারভিউ দিয়ে গেল, তাদের সকলকেই প্রায় যোগ্য মনে করেছে নিখিল। হাবভাবে সেরকমই বুঝেছিলেন মালতী রায়। তার বান্ধবী ইন্টারভিউ দেবার পর তো নিয়োগের ব্যাপারটা একরকম সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই ভদ্রমহিলা এম. এ পাস, অন্য ইস্কুলে কিছুদিনের চাকরির অভিজ্ঞতাও আছে।

সব শেষে এসেছে অর্চনা বসু। সব শেষেই ডাকা হয়েছে তাকে।

ডাকতে পাঠিয়ে তার দরখাস্তটা সেক্রেটারির সামনে ঠেলে দিয়েছেন মালতী রায়। নিস্পৃহ মুখে বলেছেন, এঁর এমনি কোয়ালিফিকেশন হয়তো সব থেকে বেশি–কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই...তাছাড়া বেশি কোয়ালিফিকেশন হলে থাকেও না বড়।

সেক্রেটারির এ দুর্বলতা জানেন মালতী রায়। এটুকু সম্ভাবনার কাঁটা সেকালের মানুষটির চোখে অনেক গুণ নিষ্প্রভ করে দেবার মতই। যারা কাজ ছাড়ে, উন্নতির আশাতেই ছাড়ে। কিন্তু উন্নতি মানে কি? বিশ পঞ্চাশ এক শ টাকা বাড়তি? তারই জন্যে মেয়েগুলোর মায়া মমতা ছেড়ে হুট করে মাঝখানেই তাদের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে হবে? এ রকম মন নিয়ে ইস্কুলে পড়াতে আসা কেন? মেয়ে তৈরি করতে আসা কেন? গুণ যতই হোক, এই ত্রুটির দিকটা বরদাস্ত করতে রাজী নন সেক্রেটারি রামতারণবাবু।

কিন্তু অর্চনা বসু ঘরে ঢোকার সঙ্গে এ-সবই বেমালুম ভুলে গেলেন তিনি। শান্ত নম্র অভিবাদনের জবাবে বৃদ্ধটি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। সমবয়সী প্রফেসর বন্ধুটিও। নিস্পৃহমুখে গদি-আটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিল নিখিলেশ। নিজের অগোচরে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল। যে-ভাবে বসে ছিল, সেই ভাবে বসে থাকাটা যেন অসম্মানজনক হত। এমন কি হেডমিসট্রেস মালতী রায়ও ভিতরে ভিতরে একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন–একটু আগে তিনি যে প্যাঁচ কষেছিলেন, এই সাদার ওপর একটা কালো আঁচড় ফেলার মতই সেটা যেন অশোভন মনে হতে লাগল।

দু-চার মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে থেকে ওই মুখে মহাশ্বেতার শুভ্র বেদনা পুঞ্জীভূত দেখলেন যেন সেক্রেটারী রামতারণবাবু। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, বোসো মা, বোসো।

তাঁর সামনের শূন্য চেয়ারটিতে অর্চনা বসল। মা-ডাকটা হেডমিসট্রেসের কান এড়াল না।

ইন্টারভিউ হয়ে গেল। আর সকলের যতক্ষণ লেগেছিল তার অর্ধেক সময়ও লাগেনি। সংশয় যেখানে রেখাপাত করে না সেখানে যাচাই করবেন কতক্ষণ? সাধারণ দু-চারটে মাত্র প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেও শুধু রামতারণবাবুই করেছিলেন, আর কেউ না। দরখাস্তের উপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, এম. এ. পাস করেছ চার বছর আগে–এর মধ্যে আর কোথাও কাজ করেছ?

অর্চনা মাথা নেড়ে জানিয়েছে, কিছুই করেনি।

প্রশ্ন শুনে মনে মনে একটুখানি হিসেব করে নিয়েছিল নিখিলেশ। চার বছর আগে এম. এ. পাস করলে এখন কত হতে পারে?–ছাব্বিশ-সাতাশ। আর কারো দরখাস্ত চোখ চেয়ে দেখেনি। বয়েস দেখার জন্য এটাই বা কাকার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নেয় কি করে–! কিন্তু এই বয়সে ঠিক এ রকম কেন? ভাল করে দেখেও ঠাওর করতে পারেনি কি রকম।

রামতারণবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন, এর আগে তাহলে ছেলেমেয়ে পড়াও নি কখনো?

না।

এরপর হেডমিসট্রেসের কথাটা মনে পড়েছিল রামতারণবাবুর। দরখাস্তের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার যা কোয়ালিফিকেশন কলেজে চাকরি পাওয়া তত কঠিন নয়, ইস্কুলে আসতে চাও কেন?

ইস্কুল ভাল লাগবে মনে হয়েছে।

জবাবটুকুও ভাল লেগেছিল রামতারণবাবুর। দু-চার কথার পর তাকে বিদায় দিয়ে সকলের মনোভাব আঁচ করতে চেষ্টা করেছেন। তার পর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে ফেলেছেন একটা।– মেয়েটির লক্ষ্মীশ্রী আছে—

প্রফেসর বন্ধু হালকা হেসে শুধরে দিয়েছেন, সরস্বতী-শ্রী বলো–

রামতারণবাবু খুশীমুখে স্বীকার করে নিয়েছেন, তারপর সকলের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাহলে–?

তাহলে যে কি, হেডমিসট্রেস অনুমান করেছেন। জবাব এড়িয়ে সমনোযোগে কথাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। জবাবটা এবার প্রফেসর বন্ধুর কাছ থেকেই আসার কথা। কিন্তু তিনিও বললেন না কিছু। অতএব রামতারণবাবুই নিজের মত ব্যক্ত করে ফেললেন, আমার তো মনে হয় এই মেয়েটাকে নেওয়া উচিত।

প্রফেসার বন্ধু সায় দিলেন, আমারও সেই রকমই মনে হয়।

মালতী রায় বললেন, উনি থাকেন যদি ওঁকেই সিলেক্ট করা উচিত শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবেন কিনা সেটাই কথা—

নিখিলেশ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আবার। হেসে বলল, তাহলে আর ইন্টারভিউতে ডাকলেন কেন?

তেমনি হেসেই জবাব দিলেন মালতী রায়, আমি দরখাস্ত বাছাই করেছি–। বিবেচনার দায়িত্ব সকলের।

সুদক্ষা হেডমিসট্রেস হিসেবে তার জোর কম নয়। সেই জন্যেই সেক্রেটারির বিশেষ স্নেহের পাত্রীও তিনি। তাঁর খটকাটা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারেন না রামতারণবাবু। কিন্তু কথাবার্তায় মার্জিত হলেও, বলার যা নিখিলেশ খোলাখুলিই বলে। বলল, থাকবে কি থাকবে না সে আর আপনাকে লিখে-পড়ে দিচ্ছে কে?

মালতী রায় সাফ জবাব দিলেন, যাঁকেই নেওয়া হোক, লেখাপড়া করেই নেওয়া উচিত এবার থেকে– সিজনের মাঝখানে ছেড়ে গেলে বড় অসুবিধে হয়।

বিসদৃশ শোনাবে জেনেও নিখিলেশ বলেই ফেলল, হলেও এই লেখাপড়ার কোন মানে নেই। আপনি যদি এখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে যেতে চান, লেখাপড়ার দায়ে আপনাকে আটকে রাখার কোন অর্থ হয়, না তাতে ফল ভাল হয়? সে-কথা যাক, কাকে নেওয়া হবে সেটাই ঠিক করুন।

মনে মনে রামতারণবাবু ভাইপোর ওপর ক্ষুণ্ণ হলেন একটু। আবার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মতেও সায় দিতে পারলেন না। ফলে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে প্রস্তাব করে বসলেন সেটা আশা করেনি বোধহয় কেউ-ই। ছেড়ে গেলে অসুবিধে তো হয়ই, আবার দেখেশুনে বাছাই করে না নিলে পারা যায় কি করে।–তা এক কাজ করো তোমরা, তেমন কোয়ালিটির কাউকে না পেলে একই গ্রেড-এ আমরা হায়ার স্টার্টও দিতে পারি–একে তাই দাও, মাইনেটা গোড়া থেকেই ভাল হয়ে যাওয়ার কথা বললে যেতে না-ও পারে।

হেডমিসট্রেস কয়েক নিমেষ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে পরে হেসেই নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, আচ্ছা।

ওদিকে ইন্টারভিউ শেষ করে আবার টিচার্স-রুমেই ফিরে এলো অর্চনা বসু। যাবে কি করে, অঝোরে জল পড়ছে। গোটা আকাশটা মেঘে পুঞ্জীভূত।.স্টেশন কম করে পাঁচ মাইল। জলের দরুণ চট করে গাড়ি পাওয়াও সহজ নয়। আর এই জলে গাড়ি ডেকেই বা আনে কে।

ইন্টারভিউ-পর্ব শুরু হতেই টিচাররা বেশির ভাগ যে-যার সুবিধে মত ছুটছাট সরে পড়েছেন। কেউ গেছেন সাইকেল রিকশয়, কেউ বা আকাশের মতিগতির দিকে লক্ষ্য রেখে ছাতা ভরসা করেই বেরিয়ে পড়েছেন! পদ-প্রার্থিনীদের আত্মীয়-স্বজনরা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছেন একে একে–কে কোন্ দিকে যাচ্ছেন জেনে নিয়ে কেউ কেউ তাঁদেরও সঙ্গ নিয়েছেন।

অর্চনা বসু ফিরে এলো যখন, টিচার্স-রুম ফাঁকা বললেই হয়। কল্যাণীদি এবং আর দুই-একজন আছেন। কল্যাণীদির দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইন্টারভিউ শেষ হলে কাকাই তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবেন, নয়তো বাড়ি ফিরে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। অবশ্য কাকার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন না তিনি, নিজের ছোট্ট আলাদা বাসা আছে। ভাই থাকে কাকার সঙ্গে। ঝড়জল দেখলে কাকা গাড়ি পাঠাতে ভোলেন না। আর যে দু-তিনজন টিচার বসে আছেন, তাঁরাও কল্যাণীদির কাকার গাড়ির আশাতেই আছেন।

এরই মধ্যে অর্চনা বসুকে ফিরতে দেখে কল্যাণীদি অবাক। অন্য সকলকেই এর থেকে অনেক বেশী সময় আটকে রাখা হয়েছিল। এ তো গেল আর এলো!

হয়ে গেল?

আগের চেয়ারটিতে বসে অর্চনা মাথা নাড়ল শুধু। বাইরের দিকে চেয়ে, ফিরবে কি করে সেই সমস্যাই তখন বড় হয়ে উঠেছে। ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে কল্যাণীদি বা আর কারো আগ্রহ খেয়াল করল না।

কল্যাণীদি নিরাশ হলেন একটু। ইতিহাস-শিক্ষয়িত্রীর শূন্যস্থানে একেই আশা করেছিলেন তিনিও। কি জানি কেন মনে হয়েছিল একে পেলে ইস্কুলেরই লাভ আর বৃদ্ধি। কমিটির চারজনের মধ্যে দুজনেই তাঁর আপনজন, সে-কথা আভাসে ব্যক্ত করতেও লজ্জা। সে-ভাবে নিজেকে কোনদিনই জাহির করেন না তিনি। মেয়েদের ড্রইং টিচার পরিচয়েই খুশী। এমন কি গোড়ায় গোড়ায় এখানকার হেডমিসট্রেসও অনেকদিন জানতে পারেননি যে কল্যাণীদির বাবার নামেই এই ইস্কুল। আর জেনে লজ্জিতও হয়েছিলেন বড় কম

নয়। কারণ সেক্রেটারির সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন, মেয়েদের ভালমত ড্রইং শেখানোর জন্য পাস করা আর্টিস্ট নিয়ে আসা উচিত কি না। সেক্রেটারী বিব্রতমুখে বলেছিলেন, কেন, ও তো বড় ভাল আঁকে, বাড়িতে অনেক যত্ন করে শিখেছে–তাছাড়া ইস্কুলটার জন্যে সেই গোড়া থেকে করেছেও অনেক, ওরই বাবার ইস্কুল তো–মায়া খুব।

হেডমিসট্রেস বিব্রত হয়েছিলেন চতুর্গুণ। আলোচনা ছেড়ে পালিয়ে আসতে পথ পাননি। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কেউ তাঁকে জানায়নি পর্যন্ত। আর আশা করেছেন কথাটা যেন চাপা থাকে।

কিন্তু চাপা থাকেনি। কথা-প্রসঙ্গে রামতারণবাবুই ভাইপোকে বলেছিলেন। নিখিলেশ দিদিকে ঠাট্টা করেছে, চাকরিটি যে এবারে গেল তোমার!

একগাল হেসে হেডমিসট্রেসকেই বলে এসেছেন কল্যাণীদি; এ চাকরি গেলে বাগানে জল দেবার কাজটা অন্তত দিতে হবে, ইস্কুল ছাড়তে পারব না ... সানন্দে শিক্ষয়িত্রীদেরও না জানিয়ে পারেননি দুশ্চিন্তার খবরটা। বলেছেন, মালতীদিকে বলে এলাম চাকরি গেলে বাগানে জল দেব, হব মালাকর–এই যাঃ! মালাকর, না মালাকরী?

এ-হেন কল্যাণীদি অর্চনা বসুর চাকরি হওয়া সম্ভব কি না স্থির করতে না পেরে নিজের অগোচরেই ছোটখাটো ইন্টারভিউ নিয়ে ফেললেন আবার একটা। হালকা আলাপের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, বি-এ-তে অনার্স ছিল আপনার?

বাইরে থেকে চোখ ফেরাল অর্চনা। মাথা নাড়ল। ছিল না।

তাহলে আর কেমন করে হবে চাকরি। মনে মনে ভাবছেন কলাণীদি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকাও বাধল, তাহলে ইন্টারভিউ পেল কি করে? দরখাস্ত বাছাই করে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে, চেহারা দেখে তো ডাকা হয়নি। তাহলে এম. এ. বোধহয়...।

আপনি এম, এ.?

এবারেও বাধা না দিয়ে অর্চনা মাথা নেড়ে জানাল, তাই। বাইরের দিকে তাকাল, চট করে জল থামার কোন সম্ভাবনা দেখছে না।

আবারও সমস্যা কল্যাণীদির। কেমন এম. এ.? হেডমিসট্রেসের বান্ধবী ক্যাণ্ডিডেটা মাঝারি এম. এ। তার ওপর মেয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে। ...দু-পাঁচ মাসের অভিজ্ঞতার ভারি তো দাম! হেডমিসট্রেস তলায় তলায় কিছু কারসাজি করলেন কি না, চকিতে সে-সংশয় জাগল।

কিন্তু এদিকে যে কথাই বলে না, কি হল-না-হল বোঝা যাবে কি করে!

অবশ্য মুখ দেখে আঁচ করা যাচ্ছে খানিকটা। কিন্তু এই ইস্কুলের চাকরির ব্যাপারে এ ধরনের নিস্পৃহতা ভাল লাগে না কল্যাণীদির। বুঝতে যখন চেয়েছেন, না বুঝে অথবা না বুঝিয়ে ছাড়ার পাত্রীও নন মহিলা। তাঁর কৌতূহলে রাখা ঢাকা নেই। তাছাড়া বলতেও পারেন দিব্যি রসিয়ে মজিয়ে। বললেন, আমি ভাই ড্রইং টিচার এখানকার, বিদ্যেবুদ্ধি বুঝতেই পারছেন। এঁদের নাকি বি এ অনার্স নয়তো ভাল সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ. চাই। আপনাকে দেখেই ভাল লেগেছে, আপনার হলে বেশ হয়। আপনি সেকেণ্ড ক্লাস তো?

এর পরের প্রশ্নটাই হত, কেমন সেকেণ্ড ক্লাস। কিন্তু সে প্রশ্নের আর অবকাশ পেলেন না কল্যাণীদি। তাঁর কথা শুনে অর্চনা বসু মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। তারপর মাথা নাড়ল, সেকেণ্ড ক্লাস নয়।

ও হরি। কল্যাণীদির ভাবনা-চিন্তা গেল। একটু যেন সঙ্কোচও বোধ করলেন, না তুললেই হত কথাটা। তাঁর ধারণা দ্বিতীয় শ্রেণীও নয় যখন, তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া আর কি। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করেছেন তার হাসির মধ্যে যেন বিব্রত ভাব দেখালো না একটুও। চকিতে আবারও মনে হল। তৃতীয় শ্রেণী হলে তো ইন্টারভিউতে ডাকার কথা নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর দরখাস্তের যেখানে অভাব নেই।

তাহলে? তাহলে আর যা সেটা ভরসা করে জিজ্ঞাসা করে ওঠাও সহজ নয়। চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকেন খানিক। একটাই মাত্র শ্রেণী মানায় বটে। শেষে বলেই ফেললেন ঝপ করে, তবে কি ফার্স্ট ক্লাস নাকি?

অর্চনা হেসেই ফেলেছিল।

অন্য দু-তিনজন টিচার ঘুরে বসে সরাসরি নিরীক্ষণ করেছেন তাকে। আর আনন্দের উত্তেজনা কল্যাণীদির কণ্ঠস্বরে। বিস্ময়ভরা চ্যালেঞ্জ গোছের।– তাহলে আপনার চাকরি হবে না কেন?

ঈষৎ বিব্রত মুখে অর্চনা বলেছে, হবে না কেউ তো বলেননি–।

কল্যাণীদি লজ্জা পেলেন। বললেন, কেউ বলেনি অবশ্য, আমারই মনে হচ্ছিল। ইন্টারভিউ থেকে এসেই যে-ভাবে আকাশ দেখছিলেন, ভাবলাম, এখানে যা হবার হয়ে গেছে, ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরতে পেলে বাঁচেন।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অর্চনা আবারও হাসল একটু। ভদ্রমহিলার ওই বয়সের সঙ্গেও যেন সরল তারুণ্যের আপস দেখল। তাঁর অভিযোগটুকুও স্বীকারই করে নিল সে, তাই তো ভাবছিলাম, এ জল শিগগির থামবে না বোধহয়–

বোধহয় কেন, আজ আর মোটেই থামবে না। আকাশ-বার্তাটি যেন কল্যাণীর দৃষ্টি-দর্পণে– আপনি তো যাবেন কলকাতায়?

অর্চনা মাথা নাড়ল।

তাহলে তো মুশকিল। এখানে কেউ নেই আপনার?

না–। বলতে যাচ্ছিল, স্টেশন পর্যন্ত কেউ যদি একটা গাড়ি ডেকে দেয়–। বলা হল না। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। এই জলে কারো পক্ষে বেরুনোও সম্ভব নয়। কালীবর্ণ আকাশের ভাববিকার নেই।

কল্যাণীদি বললেন, না-ই যদি যেতে পারেন একটা দিন থেকে যাবেন।আপনার কোন অসুবিধে হবে না, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ঈষৎ বিড়ম্বিত মুখে অর্চনা জানালো, না, যেতে হবে–।

কল্যাণীদি ভেবে বলেননি। মনের আনন্দে বলে ফেলেছেন, এই পর্যন্ত। ফার্স্ট ক্লাস শোনার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে দারুণ আনন্দ হচ্ছে তাঁর। অত গুণের সঙ্গে বাইরের শ্রীর বরাবরই একটা শুকনো বিরোধ কল্পনা করে এসেছিলেন বোধহয়, সেটা সত্যি নয় দেখেই খুশী। যেতে হবে শুনে খেয়াল হল সত্যিই থাকা চলে না। ইন্টারভিউ দিতে এসে অজানা অচেনা জায়গায় গোটা একটা রাত কাটানোর সম্ভাবনায় যে-কোন মেয়েই অথৈ জলে পড়বে। কল্যাণীদি ঘড়ির দিকে তাকালেন। সবে তিনটে। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যে। ঢের সময় আছে, জল একেবারে না ছাড়ুক ধরবে একটু নিশ্চয়ই।

বললেন, তা হলেও আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা অন্তত আমি করে দিতে পারব।

মনে মনে অর্চনা নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

বেয়ারার হাত দিয়ে হেডমিসট্রেসের ঘরে কাকার কাছে চিরকুট লিখে পাঠালেন কল্যাণীদি।–জনাকতক আছি। বাড়ি পৌঁছেই গাড়িটা পাঠাও আর নিখিলকে বাড়ি থাকতে বোলো।

গাড়িটা মস্ত একটা সাবেকী আমলের চকমিলানো দালানের আঙিনায় ঢুকে পড়ল যখন, অর্চনা তখনো জানে না কোথায় এসেছে। কল্যাণীদির আহ্বানে গাড়ি থেকে নেমে দ্বিধান্বিত চরণে তাঁকে অনুসরণ করল।

রামতারণবাবু নিচের ঘরেই বসেছিলেন। উঠে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

এসো মা এসো, জলটা তোমাকে অসুবিধেয় ফেলেছে, কিন্তু আমার লাভ হল। বোসো–

কোথায় এসেছে জানতে পেরে অর্চনার কুণ্ঠা আরো বেড়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধটিকেও ভাল লেগেছিল। দু-কথার পরেই ইস্কুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। প্রথম কি ছিল, এখন কি হয়েছে আরো কি হতে পারে। এই স্কুলের জন্য অর্চনার দরদ থাকা চাই–দুদিন বাদে হুট করে পালালে চলবে না। এখানে বাড়ির জন্য ভাবনা নেই, বাড়ি তিনিই দেখে দেবেন, ইত্যাদি।

চাকরিটা যে কার হল সেটা জানানোর কথা আর খেয়ালই হয়নি।

ওদিকে কল্যাণীদি ভিতরে ঢুকে দেখেন, নিখিলেশ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মনে মনে মতলব ভেঁজেই ঘরে ঢুকেছেন। ভাল মন্দ যাই বলুন তিনি, ভাইটি উল্টো রাস্তা খোঁজে। তাই ঘরে ঢুকেই বললেন, আজ আবার তোর কলকাতা যাওয়া নেই তো?

জবাব এলে, যাওয়া দরকার। দেখি—

এই ঝড়জলে আর যায় না, শুয়ে থাক।

টিপ্পনী–এ তো আর তোমার ইস্কুলমাস্টারি নয়, এর নাম খেটে খাওয়া।

তাহলে যাচ্ছিস?

ভাইটি বোকা নয়, কিছু একটা কলে পড়তে যাচ্ছে অনুমান করে উঠে বসল–কি মতলব?

কল্যাণীদি হেসে ফেললেন, যাবি তো যা, ভাল সঙ্গী দিচ্ছি–জল দেখে বেচারী ঘাবড়ে গেছে। আমি আশা দিয়ে নিয়ে এলাম–

কার জন্য সুপারিশ তাও অনুমান করে নিতে দেরি হল না। তবু ইস্কুলের কর্মকর্তার গাম্ভীর্যে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল, কাকে নিয়ে এলে?

কাকে আর, যাকে তোরা চাকরি দিলি।...ভাই উচ্চবাচ্য করছে না দেখে সংশয়ের ছায়া পড়ল।–দিয়েছিস তো, না কি?

তুমি ড্রইং মাস্টার, ড্রইং মাস্টারের মত থাকো, তোমার অত খোঁজে দরকার কি।

মরব চাঁটি, বল না?

নিখিলেশ হাসতে লাগল। কল্যাণীদি নিশ্চিন্ত হয়ে টিপ্পনী কাটলেন, আমি আগেই জানি, চারজনের মধ্যে তিনজনই পুরুষ যখন, ওই মুখ দেখে সকলেই ভুলবে।–কলকাতা না যাস তো স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয়।

জোর করে চা-জলখাবার খাইয়ে কল্যাণীদি অর্চনাকে ছাড়লেন আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। ছাতা মাথায় নিজেই গাড়িতে তুলে দিলেন। কিন্তু চালকের আসনে লোকটিকে দেখে অর্চনা আবারও বিব্রত। সামনের দরজা খুলে দিয়ে কল্যাণীদি বললেন, আমার ছোট ভাই নিখিলেশ দত্ত–স্কুল-কমিটির সদস্য, সে তো ইন্টারভিউতেই দেখেছেন। উঠুন–

নমস্কার জানিয়ে অর্চনা কুণ্ঠিত মুখে উঠে বসল। চাকরির চেষ্টায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-ধরনের যোগাযোগ সঙ্কোচের কারণ।

জলের জোর কমেছে, কিন্তু থামেনি। থামার লক্ষণও নেই। গাড়ির সব ক-টা কাচ বন্ধ। কাচ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নেমেছে। রাস্তার দু-পাশে মেঠো জমিগুলি পুকুরের মত দেখাচ্ছে। গাছপালাগুলোও একঘেয়ে বৃষ্টির তাড়নায় বিষম ক্লান্ত। অর্চনা বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল।

একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে নিখিলেশই প্রথম কথা বলল। আজকের এই জলটা আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেলেছে।

অর্চনার কুণ্ঠা একটুও কমেনি। মৃদু জবাব দিল, আপনার খুব কষ্ট হল–

না, আমি বেরুতামই।

নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে নিখিলেশ যথেষ্ট সচেতন। তাই চুপচাপ গাড়ি চালিয়েছে অনেকক্ষণ। চাকরিটা যে এরই হয়েছে সেটা কাকা বা দিদির মুখে নিশ্চয়ই জেনেছে। ভেবেছিল, মহিলা ইস্কুল সম্বন্ধে দু-পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করবে বা একটু অনুগ্রহ দেখাবে। ওর পদমর্যাদার আবরণ সরানো তাহলে সহজ হত। কিন্তু কথা শুরু করেও আলাপ করা সহজ হল না। পার্শ্ববর্তিনী আবারও চুপ একেবারে।

কিন্তু অর্চনা ভাবছে অন্য কথা। ভাবছে না, মনে মনে অবাক হচ্ছে সে। আসার সময় স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে এসেছিল। কিন্তু তাও এতক্ষণ লেগেছিল বলে মনে হয়

না। জলের দরুন অনেকটা ঘোরাপথে চলেছে কি না বুঝছে না। আরো খানিক চুপ করে থেকে শেষে জিজ্ঞাসা করে ফেলল, স্টেশন কি অনেক দূর নাকি?

না। স্টেশন অনেকক্ষণ ছাড়িয়েছি।

বিস্মিত নেত্রে অর্চনা এবারে সোজাসুজি ফিরে তাকাল তার দিকে। এবারে নিখিলেশও অবাক। আমরা তো কলকাতায় যাচ্ছি, দিদি বলেনি আপনাকে?

অর্চনা ঘাড় নাড়ল শুধু। বলেন নি। মুখ দেখেই বোঝা গেল আবারও বিব্রত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাটাও মনঃপূত হয়নি। স্কুল-কমিটির গণ্যমান্য সদস্যের পক্ষে সেইটুকুই হজম করা শক্ত। নিখিলেশ বলল, আমাকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হয়, আপনি অসুবিধে বোধ করেন তো এখনো স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারি, আমি অবশ্য কলকাতা যাবই–।

এবারে অর্চনা লজ্জা পেল একটু। বলল, না, চলুন।

কলকাতায় পৌঁছে তার নির্দেশমত বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড় করাল। বাড়ির সামনের নেমপ্লেটে চোখ আটকাল নিখিলেশের জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর গৌরীনাথ বসু আপনার কে হন?

দরজা খুলে অর্চনা নেমে দাঁড়িয়েছে। মৃদু জবাব দিল, বাবা। আপনি চেনেন?

চিনি নে, তবে অনেককাল তাঁর বই মুখস্থ করতে হয়েছে।

প্রায় নিস্পৃহ মুখেই অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি বসবেন না একটু?

না আজ আর বিরক্ত করব না, নমস্কার—

গাড়িতে স্টার্ট দিল। দেখতে দেখতে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অর্চনা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সাদর অভ্যর্থনা জানালে আসত বোধহয়। কিন্তু সে-ভাবে ডাকেনি। ডাকতে চায়ওনি।

.

যথাসময়ে নিয়োগপত্র এসেছে, স্কুলের কাজও শুরু করেছে। আড়াইখানা ঘরের একটা বাড়ি সেক্রেটারিই ঠিক করে দিয়েছেন।

কিন্তু অর্চনার সেই প্রথম দিনের বিচ্ছিন্নতা ঘোচেনি। টিচাররা তো এক রকমই দেখে আসছেন তাকে। সেই ধপধপে সাদা বেশবাস আর সেই সাদাটে ব্যবধান। সহ-শিক্ষয়িত্রীরা প্রথম প্রথম দলে টানতে চেষ্টা করেছেন, শেষে দেমাক ভেবে নিজেদের মধ্যে আড়ালে-আবডালে টিকাটিপ্পনী কেটেছেন। প্রতিভাদির সঙ্গে শোভাদি, আর মীরাদির সঙ্গে প্রভাদি। এখানকার মহিলা সমিতিটির সঙ্গে যোগ আছে প্রায় সকল মহিলারই। শুধু শিক্ষয়িত্রী নয়, বহু মধ্যবিত্ত এবং বড়লোকের ধনীরাও ছুটির দিনে সেখানে নিয়মিত আসেন এবং জটলা করেন। কল্যাণীদি তো বলতে গেলে পাণ্ডাই একজন। অর্চনার কাছে সেখান থেকেও তলব এসেছে। অর্চনা সভ্যা হয়েছে, চাঁদাও দিয়ে আসছে নিয়মিত–কিন্তু যোগ নেই।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে একেবারে ছোট মেয়েদের সঙ্গে সেই ব্যবধান ঘুচে যেতে দেখা গিয়েছিল। ছুটির দিনে দলে দলে মেয়েদের পাতা পেতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোটাও প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। এর জের সামলাতে হত প্রৌঢ় চাকর দাশুকে। বলা বাহুল্য সে খুব খুশী হত না। কলকাতায় প্রথম অর্চনাদের বাড়িতে আসে যখন, অর্চনা তখন ফ্রক পরত। এখানে অর্চনার চাকর বলতেও সে, পাঁচক বলতেও সে, আর অভিভাবক বলতেও সে-ই। বাড়তি সওদা নিতে এসে মুদী-দোকানের বুড়ো মাখন শিকদারের কাছে সে রাগে গজগজ করত এক-একদিন। –তোমরা তো ভাল বলবেই, সওদা তো আর কম বিক্রি হচ্ছে না– তা যেও একদিন নাতনীকে নিয়ে, দিদিমণির যত্ন-আত্তিটা নিজের চোখেই দেখে এসো। বাচ্চা-কাচ্চা দেখলে তেনার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, নাতনীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তিনিই ইস্কুলের যুগ্যি করে নেবেন।

অর্চনাদির কাছে নিজেদের কদর মেয়েরাও বুঝত। তাই অসময়ে গিয়ে হাজির হতেও বাধত না। লাগোয়া বাড়ির মালা মেয়েটার বয়েস মাত্র দশ, পড়ে ক্লাস সিক্স-এ। তার দেড় বছরের থপথপে ভাইটাকে নিয়ে অর্চনাদি যা করে, দেখে ওই ছোট মেয়েরাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আর হাসে। দু দিন তাকে না দেখলে দাশুকে দিয়ে ভাইসুদ্ধ মেয়েটাকে ডেকে পাঠায়। আর বাড়ির জলখাবার মনের মত না হলে মেয়েটাও ভাই-কোলে এসে হাজির হয়। একা এসেও দেখেছে, কিন্তু ভাইকে নিয়ে এলেই লাভ বেশী।

শিক্ষায়ত্রীদের পক্ষে এতটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। অনেক সময় সামনা সামনি ঠেস দিতে ছাড়েন না তাঁরা। বিশেষ করে বিজ্ঞানের টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর। ক্লাস শুরু হবার আগে ইস্কুল প্রাঙ্গণে কিণ্ডারগার্টেনের বাচ্চাগুলো রোজই একদফা হুটোপাটি করে ছেকে ধরে অর্চনাকে। গল্পের বায়না করে। অর্চনার মুখে আর সে গাম্ভীর্য

দেখা যায় না তখন। আদর করে কারো গাল টিপে দেয়, কারো রিবন ঠিক করে দেয়, কারো বা ঘামে-ধুলোয় জবজবে মুখ নিজের রুমালে করে মুছে দিতে দিতে বলে, খুব দুষ্টুমি করা হয়েছে বুঝি, উঁ–?

সেই সময় শোভা ধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কিছু না কিছু বলবেনই তিনি। বলবেন, বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আপনাকে দেখলে মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে ওরা।... আরো জোরালো ঠাট্টাও করেছেন, বলেছেন, আপনি নিজেই একটা কিণ্ডারগার্টেন খুলে বসুন, অনেক বেশী লাভ হবে। কি ছাই চাকরি করছেন!

বিব্রতমুখে অর্চনা পাশ কাটায়, ব্যবধানের আবরণ মুখে নেমে আসে। L

এর উপর মালীর ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে সেই সম্প্রতি দেখে প্রথমে তো চক্ষুস্থির সকলের। তার পর ফিসফিস, কানাকানি। মীরাদি প্রভাদিকে ঠেলেন, প্রভাদি মীরাদিকে। রোগ সম্বন্ধে প্রতিভাদির কানে কানে রোগনির্ণয় করেন শোভাদি। এমন কি সহকারী হেডমিসট্রেস স্মৃতি করও হালকা বিস্ময় জ্ঞাপন করেন হেডমিসট্রেস মালতী রায়ের কাছে।

কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যেও একজনের কিছু কাছাকাছি এসে গেছে অর্চনা। ড্রইং টিচার কল্যাণীদির। সেটা তার নিজের চেষ্টায় নয়, কল্যাণীদির স্বভাবে। নিজেই হুড়মুড়িয়ে তার বাড়ি এসেছেন যখন তখন, বাচ্চাদের অত আদর দেওয়া নিয়ে মন-খোলা ঠাট্টা করেছেন, আবার নিজের বাড়িতেও জোর করেই ধরে নিয়ে গেছেন ওকে। অর্চনার ভাল লাগত, এর পর নিজেই যেত তার বাড়ি, জোর করতে হত না। অনেক সময় অবাক হয়ে

ভেবেছে, কাকার সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে কেন নিজের বাড়িতে থাকেন না কল্যাণীদি। সুন্দরী না হলেও কুৎসিত নন, কেন বিয়েই বা করেননি...। তাঁর ছোট্ট বাড়িটা যেন ছোটখাটো চিড়িয়াখানা একটা। খাঁচায় খাঁচায় কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, বুলবুল হীরামন–একগাদা রঙবেরঙের খরগোশ, হাঁস, পায়রার ঝাঁক, রঙচঙা জারের মাছ–কত কি! এদের সামলাতে গিয়ে কল্যাণীদি স্কুলেও লেট হন এক-একদিন।

প্রথম প্রথম অবাক হয়ে অর্চনা তাঁর পশুপাখির সেবাযত্ন দেখত। ভালও লাগত। কিন্তু এখানে আসায়ও ছেদ পড়েছে শিগগিরই। এলেই আর একজনকে দেখত। কল্যাণীদির ভাইকে। বিকালের দিকে দিদির কাছে একবার অন্তত আসেই নিখিলেশ। আড়াল থেকে ভাইয়ের উদ্দেশে দিদির ছদ্ম অনুশাসন আর বিদ্রূপও কানে আসত। কিন্তু অর্চনার কাছে তাঁর মুখে ভাইয়ের প্রশংসা যেন ধরে না। ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে দুচোখ তাঁর সজল হতেও দেখা গেছে।

ফেরার সময় কল্যাণীদি ভাইকে বলতেন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। প্রথম প্রথম অর্চনা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, নিখিলের গাড়িতেই ফিরেছে। তার পর কিছু একটা অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। কখনো বলেছে পরে যাবে, কখনো বলেছে হেঁটে যাবে। কল্যাণীদি বুঝেছেন, বুঝেই আর সে-রকম ব্যবস্থা করেননি। তবু আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে অর্চনা, কখনো-সখনো কল্যাণীদি একেবারে স্কুল থেকে ধরে নিয়ে এলে আসে।

কল্যাণীদি বলতে ছাড়েননি, কি ব্যাপার বলো দেখি তোমার, এ ভাবে থাকো কেন?

আর কেউ হলে অর্চনা জবাব না দিয়ে শুধু চেয়েই থাকত। এখানে একটু হেসে বলেছিল, আমিও যদি আপনাকে ফিরে এ কথাই জিজ্ঞাসা করি?

কল্যাণীদি অবাক হতে চেষ্টা করেছিলেন প্রথম, ও মা, আমার আবার কি দেখলে?...তার পর হেসেই জবাব দিয়েছেন, আমার কথা ছেড়ে দাও, সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কানা–তোমার কি?

অর্চনার বাধা অনুমান করে নিখিলেশ দিদিকে বলেছে, তোমার এখানে আসার রুটিনটা আমি না-হয় রাত্রিতেই করে নেব এবার থেকে–ভদ্রমহিলাটিকে বলে দিও।

কল্যাণীদি সত্যিই বলেছেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন। অর্চনা শুনে মনে মনে দুঃখিত হয়েছে, কিন্তু কিছু বলতে পারেননি।

এর পর নিখিলেশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমই হয়েছে তার। ইস্কুলের গত বার্ষিক উৎসবে নিখিলেশ অবশ্য ওর বাড়িতেই এসেছিল আর নিজেদের বাড়িতে ধরেও নিয়ে গেছে। প্রতি বছর ওই একটা দিন ইস্কুলে আড়ম্বর করে উৎসব হয়, আর রাত্রিতে সব শিক্ষায়ত্রীদের সেক্রেটারির বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে। অর্চনা ইস্কুলের উৎসবে উপস্থিত ছিল কিন্তু বাড়িতে যায়নি। নিখিলেশ গাড়ি নিয়ে একেবারে বাড়িতে হাজির।–আপনার না যাওয়াটা সকলে এত বেশি লক্ষ্য করেছেন যে না এসে পারা গেল না। চলুন–

অর্চনা আপত্তি করতে পারেনি। আপত্তি করতে গেলে পাঁচ কথা বলতে হয়, পাঁচটা, অনুরোধ উপরোধ শুনতে হয়–তাতেই সঙ্কোচ বেশি। তাকে আসতে দেখে বিজ্ঞানের

টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর প্রতিভা গাঙ্গুলীর কানে কানে ফিসফিস করেছেন, এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল...।

একটানা দিনযাপনে এই কানাকানি ফিসফিস আর কৌতূহল অনেকটাই থিতিয়ে এসেছিল। ইস্কুলের সেই বার্ষিকী রাত্রির পর কল্যাণীদিও বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়েছে, দু-চার দিনের অনুযোগের পর কল্যাণীদিও বলা ছেড়েছেন। মেয়েদের বাড়িতে ও ভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটাও সকলেই একরকম সয়ে গেছে– দেড় বছরের ভাই কোলে মালার আগমন প্রায় নৈমিত্তিক। শুধু মালীর ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বেশি বেশি করতে দেখলই নিজেদের মধ্যে যে দু-চার কথা বলাবলি করতেন সহ-শিক্ষয়িত্রীরা, টাকাটিপ্পনী হয়তো।

এমন একটানা কেটে যেতে পাবত কানে।

কিন্তু কাটল না।

ছোট্ট একটা মর্মন্তুদ ঘটনা থেকে অর্চনা বসুর এই একটানা বিচ্ছিন্নতার বাঁধ ভেঙে সহসা অকরুণ কৌতূহলের এক বন্যা এলো যেন।

আলেয়ার আলো দু-হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল, মায়ার প্রলোভনে নিজেকে উদঘাটিত করে বসেছে। করে ধরা পড়েছে...।

উপলক্ষ, মালীর ওই কচি ছেলেটার জলে ডোবা। সেই থেকেই সূচনা।

কয়েকটা দিন মূক বেদনায় অর্চনা দিনরাত ছটফট করেছে শুধু। দিনের সেই ছটফটানি ইস্কুলের মেয়েরা কিছুটা টের পেয়েছে। দশ বছরের মালা ক্লাসের ক্লাস-মনিটার। অর্চনাদির ক্লাসে সে পর্যন্ত সহপাঠিনীদের টুঁ-শব্দটি বরদাস্ত করতে পারেনি। নোটবই হাতে নিয়ে মেয়েদের ধমকেছে, এই, একেবারে চুপ সব, নাম টুকবো কিন্তু! অর্চনাদির ক্লাস না এখন? জানিস সেই দিন থেকেই কেমন হয়ে আছেন–

অনুশাসন শেষ হওয়ার আগেই অর্চনা ক্লাসে ঢুকেছে।

কিন্তু রাতের খবর শুধু একজন রাখে। দাশু। দাশুর বয়স হয়েছে, মেজাজটা সব সময় বশে থাকে না। এর দ্বিগুণ ধকল সামলাতেও আপত্তি নেই তার, কিন্তু এই গুমোট আর এত অনিয়ম বরদাস্ত হয় না। গত রাতেও বেশ পষ্টপষ্টি একপশলা হয়ে গেছে এই নিয়ে।

ট্রেতে এক পেয়ালা চা নিয়ে নিঃশব্দ রাগে ঘরে ঢুকে দেখে বই হাতে দিদিমণি খাটে ঠেস দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে। সে চা নিয়ে ঢুকেছে তাও টের পেল না। ছোট টেবিলের দেয়াল-তাকের কাছে ট্রে টেবিলে রাখতেই তাকের ওপর সারি সারি ট্যাবলেটের শিশিগুলোর ওপর চোখ গেল দাশুর। কম করে পাঁচটা, চার-পাঁচ রকমের। এই তিন চার দিনে কোন শিশি থেকে ক'টা ট্যাবলেট কমেছে একবার চোখ বুলিয়ে তাও বলে দিতে পারে। ক্ষুব্ধ রাগে দাশু একে একে সব ক'টা শিশিই চায়ের ট্রেতে নামিয়ে এনেছিল। তার পর সেই ছোট টেবিল সুদ্ধ তুলে এনে বিছানার পাশে ঠিক করে রেখেছিল।

অর্চনার হুঁশ ফিরেছে। চায়ের সঙ্গে ট্রেতে ওষুধের শিশিগুলো দেখে জিজ্ঞাসু নেত্রে দাশুর দিকে তাকাতে সে বলেছে ঘুমোবার ওষুধ খাবে কি জেগে থাকবার ওষুধ খাবে কে জানে–সব ক'টাই এনে দিলাম।

ঈষৎ বিরক্ত মুখে অর্চনা চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়েছিল। পরের অভিযোগটা দাশু ঘরের দেয়ালকেই শুনিয়েছে যেন।–সন্ধ্যে থেকে চার পেয়ালা হল, বলো তো চাল ক'টাও চায়েতেই সেদ্ধ করে দিতে পারি।

অর্চনা অন্যদিন হলে হাসত, একটু তোশামোদও করত হয়তো। তার বদলে শুধু বিরক্তই হয়েছে। কিন্তু মেজাজ দাশুরও তেমনি চড়া তখন। তাক থেকে টাইমপীস ঘড়িটা এনে সশব্দে সেটাও টিপয়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। রাত তখন দশটার কাছাকাছি।

তুমি যাবে এখান থেকে?

যাব–। বলেই অদূরের টুলটা একেবারে খাটের কাছে টেনে এনে গ্যাঁট হয়ে বসে জবাব দিয়েছে, একেবারেই যাব। কিন্তু এখন তুমি কি করবে জেনে যাই।

ছেলেবেলায় অনেক শাসন করেছে, হম্বি-তম্বি করেছে, এখন আর অতটা সম্ভব নয় বলেই আপসোস যেন।

আঃ, দাশুদা!

দাশুর গলা একটু নেমেছে বটে, কিন্তু ক্ষোভ যায়নি। বলেছে, জীবনভোর তো মেজাজের ওপরেই কাটালে, তার ফলে তো ওই–! ওষুধের শিশিগুলো একসঙ্গে সাপটে হাতে তুলে নিয়েছিল সে।–কালই আমি এগুলো গঙ্গায় দিয়ে আসব।

গঙ্গার বদলে আপাতত সেগুলি তাকের ওপরে রেখেই গজগজ করতে করতে প্রস্থান করেছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সত্রাসে অর্চনা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েছে। চাঁদের আলোয় রাতের গঙ্গা চকচক করছিল।

পরদিন।

অর্চনাকে ইস্কুল থেকে ফিরতে দেখেই দাশু ময়দা মাখতে বসেছিল। খাবে না বলার অবকাশ দিতে রাজী নয় সে। তার দু-হাত জোড়া। বাইরের দরজায় ঠকঠক শব্দ।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই দাশু উঠে এসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দরজার হুড়কো খুলে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে মালা, কোলে তার দেড় বছরের ফুটফুটে ভাইটা। দেখেই দাশু বেজায় খুশী। এদের দেখে এমন খুশী শিগগির হয়নি বোধহয়।– তোমরা।

আনন্দাতিশয্যে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে আদর করতে গিয়ে খেয়াল হল, হাতে ময়দা মাখা। উৎফুল্লমুখে অভ্যর্থনা জানাল, এসো এসো–। যেন বহুপ্রতীক্ষিত অথচ অপ্রত্যাশিত কেউ এসেছে। হঠাৎ বাচ্চা ছেলেটার একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, এই ক'টা দিন কি কচ্ছিলে চাঁদ। ওদিকে যে–

থেমে গিয়ে মালার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলল, যাও যাও, ভিতরে যাও—

ভাইকে নিয়ে মালা ভিতরে ঢুকল। দাশুর মুখে প্রসন্ন হাসি।

ইস্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে অর্চনা চায়ের প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু শুধু চা চাইলে আবার দু-কথা শুনতে হবে বলেই কিছু বলে নি। টেবিলের ওপর বিলিতি মাসিকপত্র উল্টে আছে একটা। মলাটের বিজ্ঞাপনে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত এক শিশুর ছবি। অন্যমনস্কর মত অর্চনা চুপচাপ সেটাই দেখছিল। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল।

মালার কোলে ছেলেটাকে দেখে হঠাৎ যেন ভারি খুশী হয়ে উঠল সেও। ক-দিন ধরে অনড় বোঝার মত যে অনুভূতিটা বুকে চেপে আছে, সেটা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল। এক ঝলক জীবন্ত আলো দেখে যেন ক'টা দিনের এক দুঃসহ আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার তাড়নাই অনুভব করল হঠাৎ।

একগাল হেসে এগিয়ে এসে ছেলেটাকে মালার কাছ থেকে লুফে নিল প্রায়। একবার মাথার কাছে তুলে, দুবার ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, ওরে দুষ্টু, তুই এসেছিস।

অর্চনার সাদা চশমাটার ওপর ছেলেটার বরাবরই বড় লোভ। প্রথম সুযোগেই খপ করে সে টেনে ধরল সেটা।

এই দস্যি, ছাড় ছাড়!

চশমাটা নিয়ে আছড়ে ভাঙলেও অর্চনা অখুশী হত না বোধহয়। ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুমোট যাতনা হালকা হয়ে হয়ে একেবারে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। চশমাটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল। বেজায় খুশী। প্রায় অস্বাভাবিক রকমের খুশী।

আনন্দে দু-হাতে ছেলেটাকে আবার সামনে তুলে ঝাঁকাতে গিয়ে থমকে গেল। কলরব শুনে ময়দা ফেলে হাস্যবদন দাশু একবার উঁকি দেবার লোভ সামলাতে পারেনি। তারই সঙ্গে চোখোচাখি। অর্চনা গম্ভীর হতে চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে দাশুও গম্ভীর মুখে নিজের কাজে ফিরে গেল।

মালা ছবির খোঁজে টেবিলের সেই বিলিতি মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অর্চনাদির কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হাসছে মুখ টিপে। এখন তার আপসোস হচ্ছে খুব, কেন আর দুটো দিন আগে এলো না। ভরসা পায়নি বলেই আসেনি, আজও খুব ভয়ে ভয়েই এসেছিল।

অর্চনা ছেলেটাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। ঝাঁকাল, আদর করল, তাকের ওপর থেকে বিস্কুট দিল তার হাতে। ভাল বিস্কুট মজুতই থাকে ওর জন্য। তার পর মুখোমুখি ওকে বুকের কাছে এনে বলল, তুই দুষ্টু–

ছেলেটার তাতে আপত্তি, বিস্কুটে কামড় বসিয়ে ভাঙা ভাঙা পাল্টা জবাব দিল, তুমি ডুট্টু–

উঁহু, আমি ভাল।

তুমি মন্ন—

আর তুই?

আমি বা-ব্বু–

ভিতরে ভিতরে অর্চনার কি যেন আলোড়ন একটা। সুখের মত আবার ব্যথার মতও। ছেলেটার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আর আমি?

ছেলে বিস্কুটে কামড় বসিয়ে জবাব দেবার ফুরসত পেল না।

কিন্তু হঠাৎ হল কি অর্চনার? কি যে হল নিজেও জানে না। স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। মুখের ভাব বদলাতে লাগল। একটা অব্যক্ত আকুতি বুক ঠেলে ওপরে উঠছে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক অগ্রহ কিসের। দশ বছরের মেয়েটা ছবি ফেলে হাঁ করে চেয়ে আছে খেয়াল নেই!

আবারও ছেলেটার গালের কাছে, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল অর্চনা, আমি মা। মা–

বিস্কুট ভুলে শিশুটি এবার ঘাড় ফিরিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকাল তার দিকে। আর তিমির তৃষ্ণায় তাকে যেন একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল অর্চনা। ছেলেটা ধড়ফড় করছে হুঁশ নেই। কণ্ঠস্বরে অস্ফুট আকুতি।–মা বল। মা বল! মা বল–

বিভ্রান্ত উত্তেজনার মুখেই সম্বিৎ ফিরল।

সূচিপত্র

লজ্জায় বেদনায় সঙ্কোচে অর্চনা নিস্পন্দ, বিবর্ণ একেবারে। নিভৃতচারী বাসনার এমন মূর্তি এমন করে নিজেও বোধকরি আর দেখেনি কখনো। সেই লজ্জার ব্যথা নিজের কাছেই দুর্বহ, তার ওপর ওই মেয়েটা বিস্ফারিত বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। দশ বছরের মেয়ে মালা–শুধু দেখছে না, কেমন ভয়ও পেয়েছে।

ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি বুকের থেকে নামিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল। থালায় খাবার নিয়ে দাশু ঘরে ঢুকেছে। ব্যস্তসমস্তভাবে অর্চনা থালাটা তার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েই মালার সামনে রাখল।–নাও, খেয়ে নাও! আমি আসছি–

দাশুর পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাশু অবাক। মেয়েটার খাবার তো সে এনেছিলই!

খেয়েদেয়ে ভাই কোলে করে মালা হৃষ্ট চিত্তেই ঘরে ফিরেছে। কিন্তু অর্চনাদির এমন নতুন কাণ্ডটা মাকে না বলে পারেনি সে। কাণ্ড বলে কাণ্ড, একেবারে তাজ্জব কাণ্ড!

দুই এক কথাতেই তার মা তাজ্জব কাণ্ডের মূলসুদ্ধ বুঝে নিলেন। তারপর খপ করে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে কয়েক প্রস্থ ঝাঁকানি দিলেন বেশ করে। পাজী মেয়ে, রোজ নাচতে নাচতে তোর ওখানে যাওয়া চাই কেন? ফের যদি ওকে নিয়ে আবার ও-মুখো হতে দেখি মেরে একেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে মেয়েটা দ্বিগুণ হতভম্ব।

রবিবার সমিতির মধ্যাহ্নে-আসরে মালার মা চুপি-চুপি শিক্ষয়িত্রী প্রভা নন্দীর কানে তুললেন কথাটা। ঘটনাটা জানিয়ে অনুযোগ করলেন, কেমন টিচার ভাই আপনাদের, চেহারা-পত্র তো ভাল, টাকাও রোজগার করে–বিয়ে-থা করলেই তো পারে।

প্রভা নন্দী সেই বিকেলেই ছুটেছেন মীরা সান্যালের বাড়ি। এতবড় বিস্ময়ের বোঝা একা বহন করবার নয়, বাসি করতেও মন চায় না। পরদিন টিচার্স-রুমের কানাকানিতে কান পাতলেন সকলেই। এমন কি সহকারী হেডমিসট্রেস স্মৃতি করও। শেষে কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে হেডমিসট্রেস মালতী রায়ের ঘরে ঢুকলেন তিনি।

শিক্ষয়িত্রীদের হাবভাবে স্পষ্ট ব্যতিক্রমটা অর্চনার চোখে পড়তে সময় লাগেনি। অর্চনা যেন এতকাল ঠকিয়ে এসেছে তাঁদের। দূরে সরে থেকে একটা আলগা মর্যাদা আদায় করেছে। নতুন করে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা ওকে। অনাবৃত কৌতূহলে রহস্যের কিনারা খুঁজেছেন।

শুধু কল্যাণীদি ছাড়া। কিন্তু তাঁর মমতাভরা দুই চোখেও কি এক নির্বাক জিজ্ঞাসা।

অর্চনা হঠাৎ বুঝে ওঠেনি।

কিন্তু বুঝতে সময়ও লাগেনি।

অস্বস্তির বোঝা একটা অনড় হয়ে বুকে চেপেই ছিল। সেই দিনই বিকেলের দিকে হেডমিসট্রেস ওকে নিজের ঘরে ডেকে দুই একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রয়োজনের কথা বলে নিয়ে শেষে খুব মিষ্টি করে বলে দিলেন মেয়েদের একটু বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে–অতটা

করা ঠিক ভাল নয়, অর্চনাকে তিনি স্কুলের গৌরব মনে করেন বলেই কথাটা বললেন– ইত্যাদি।

অর্চনা বুঝেছিল, তার পরের ক্লাসে মালার চোখে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে। অন্য মেয়েগুলোর চোখে-মুখেও দুর্বোধ্য বিস্ময় আর কাঁচা কৌতূহল।

অর্চনা না বসু কি নিজের মৃত্যু কামনা করেছে সেদিন?

কিছুই করেনি, কিছুই করতে পারেনি। ক্লাস ছিল আরও একটা, তাও শেষ না করে আসেনি। বাড়ি ফেরার পর দাশু খাবার এনে সামনে ধরেছে তাতেও আপত্তি জানায়নি।

রাত গড়িয়েছে। দাশুও বিদায় নিয়ে গেছে।

ছাই নতুন করে জ্বলবে কত। অর্চনা এক সময় উঠেছে। চুপচাপ চাকরির ইস্তফা-পত্র লেখা শেষ করে টেবিলে চাপা দিয়েছে। তার পরেও বিনিদ্র কাটেনি।

কুঁজোতে জল ছিল, তাকে ওষুধের ট্যাবলেট মজুত ছিল।

সকালে সহজে মাথা তুলতে পারেনি। দাশু ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়েছে। চা খেতে খেতে অর্চনা ভাবতে চেষ্টা করল, রাতে ক'টা ট্যাবলেট খেয়েছিল। টেবিলের ওপর ইস্তফা পত্রটা চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তার পর খুব শান্তমুখে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল।

দুটো দিন কোনরকমে চুপ করে ছিলেন কল্যাণীদি। তার পর ভরসা করে থাকতে পারেননি। কেমন করে যেন বুঝেছিলেন, আর দেরি করলে একেবারে দেরি হয়ে যাবে। হাসি-তামাসায় অতিবড় স্তব্ধতার ধর্মও ভাঙতে পারেন তিনি, কিন্তু এখানে সেই চেষ্টাটাই যেন বিড়ম্বনা বিশেষ। সেদিন ছুটির পর স্কুল-ফটক পেরিয়ে অর্চনার হাত ধরলেন।– ওদিকে নয়, আজ আমার বাড়ি।

আজ থাক—

কাল তো তুমি আরো একটু দূরে সরবে। আজই এসো, কথা ছিল—

তার দিকে চেয়ে অর্চনা অপেক্ষা করল একটু। তার পর চুপচাপ সঙ্গে চলল।

যদি আবারও আপত্তি করত বা দু-কথা জিজ্ঞাসা করত কল্যাণীদি কিছুটা স্বস্তি বোধ করতেন। জোর-জুলুম ঝগড়া ঝাঁটি পর্যন্ত করা চলত। কথা কিছু সত্যিই ছিল কি না তিনিই জানেন। বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না। হৈ চৈ করে জলযোগের ব্যবস্থা করলেন, অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে পশু-পাখির তদারক করলেন একপ্রস্থ। কোন্ পাখির জন্য নতুন খাঁচা তৈরি করতে হবে, কোন্ খরগোশটার বজ্জাতি বাড়ছে দিনকে দিন, ময়নাটার খাওয়া কমেছে, ডাকও ছেড়েছে–অসুখ-বিসুখ করবে কিনা কে জানে, কাকাতুয়াটার একটা জোড় খুঁজছেন, পাচ্ছেন না–ফলে বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে আছে, ইত্যাদি সমাচার শেষ করে শেষে ঘরে এসে বসলেন।

এর পরেও কল্যাণীদি অর্চনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে একটা কথাও তুললেন না। স্কুলে যা নিয়ে এমন কানাকানি সেই বিসদৃশ ব্যাপারেও তাঁর যেন কৌতূহল নেই। দু-পাঁচ কথার

পর হঠাৎ নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। খুব হালকা করে বললেন, আচ্ছা এই যে স্কুলে আঁকিযুকি আর বাড়িতে এই সব নিয়ে দিব্বি কাটিয়ে দিচ্ছি—কেমন আছি বলো তো আমি?

জবাবে অর্চনা তাঁর দিকে চেয়ে শুধু হাসল একটু। কল্যাণীদি এ-কথাটাই বলতে চান, না আর কিছু বলতে চান–হয়তো বলবেনও। তবু কল্যাণীদিকে বরাবরই যেমন ভাল লাগে আজও তেমনি লাগছে–বড় মিষ্টি লাগছে। ক্ষত যদি খোঁজেনও, জ্বালা-জুড়ানো প্রলেপ লাগানোর জন্যেই খোঁজেন।

বেশ আছি, না?...হাসিমুখে নিজেই জবাবটা দিয়ে নিলেন।–সকলেই বলে দিব্বি আছি। ব্যাপার কিছু আছে সকলেই জানে, জেনেও ভাবে বেশ কাব্যের মত কাটিয়ে দিচ্ছি। অথচ আমার দশা ভাবো একবার, সময় পার করে দিয়ে এখন কাকাতুয়ার জোড়া খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ছোট মেয়ের মতই খিলখিল করে হেসে উঠলেন কল্যাণীদি, যেন খুব মজার কথা কিছু। তার পর বলে গেলেন, অথচ কত কাণ্ড করে শেষে এই দশা ভাবো–বর্ণে অমিল বলে কাকা আর মা একজনকে বাতিল করে দিলেন, আর অমন বর্ণের মিলটা তাঁদের চোখে পড়ল না সেই রাগে আমি কাকার গার্জেন-গিরিই নাকচ করে দিলাম, আর মা যে নিজের মা নয় সৎ-মা সেটাও তাঁকে বুঝিয়ে আসতে ছাড়লাম না। তার পর ওই এক বর্ণে অন্ধ হয়ে বসে রইলাম, অথচ চোখের ওপর দিয়েই কত বর্ণ চলে গেল তাকিয়ে দেখলামও না একবার। কি লাভ হল বলো তো? কেউ কি বসে থাকল, দিন কি থেমে রইল–নিজেই শুধু নিজেকে নিয়ে বসে রইলাম। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি–

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

অর্চনার আর ভাল লাগছে না, ফাঁপর ফাঁপর লাগছে। চিকিৎসকের আন্তরিকতা সত্ত্বেও ক্ষতের ওপর ভুল ওষুধ পড়লে যেমন লাগে। কিন্তু কল্যাণীদি নিজের ঝোঁকেই বলে যেতে লাগলেন, অথচ যা হয়েছে সেটা মেনে নিলেই এক রকম না এক রকম করে ঘা শুকাতো–তা না, উজানেই সাঁতার কেটে গেলাম। কেউ পারে?

অর্চনা বলল, এসব কথা থাক কল্যাণীদি—

থাকলে চলবে কেন, কল্যাণীদি মাথা নাড়লেন, দুঃখ যেমনই হোক, জীবন ছাড়া জীবনের ফাঁক ঘোচে না রে ভাই–মেয়েদের তো নয়ই। এই বুড়ো বয়সেও আমার সংসার করতে সাধ যায়, আমার বাপু পষ্ট কথা। আমাকে নিয়ে ওরা তোমার মত অমন হাসাহাসি কানাকানি করলে মুখের ওপর বলে দিতাম। আমি আর পাচ্ছি কাকে বলো–কিন্তু তোমার সামনে কেউ আছে কিনা একবার চোখ তাকিয়ে দেখবে না?

অর্চনা এতক্ষণে আভাস পেলো কি বলতে চান কল্যাণীদি। ইস্কুলে ওই সদ্য রটনার ফলে নানা সংশয়ে এদিক থেকে আপনজনের বরং পিছপা হবার কথা। ঈষৎ বিস্ময়ে অর্চনা চুপচাপ চেয়েই রইল তার দিকে।

আসল বক্তব্যে পৌঁছে কল্যাণীদির আর রাখাঢাকা নেই। বললেন জল-ঝড়ের দিনে সেই যেদিন প্রথম দেখলাম, সেই দিনই তোমাকে ভাল লেগেছিল। ... আমারই ভাই তো, ভাল দেখলে ছেলেটারও ভাল লাগার চোখ– তার দোষ কি বলো?

অর্চনা চেয়েই আছে। আরো শান্ত, আরো একটু নিষ্প্রাণ।

কল্যাণীদিও লক্ষ্য করছেন আর ভিতরে ভিতরে দমে যাচ্ছেন একটু। তবু, মুখের কথা বার করেছেন যখন শেষ না দেখেই ছাড়বেন না। হাসলেন আবারও, চুপ করে গেলে কেন, কথা তো তোমার আমার মধ্যে হচ্ছে!...একটু থেমে বললেন, নিজের ভাই–কত আর বলা যায়, তোমার দুঃখ ও কোনদিন ছোট করে দেখবে না–ঠিক আমার বাবার স্বভাবটি পেয়েছে। তোমার কথা ভেবে ছোঁড়াটা নিজের অনেক কাজকর্মে ঢিলে দিয়েছে জেনেও এতদিন কিছু বলিনি, আজ আর না বলে পারছি না। নেড়েচেড়ে দেখই না দু-দিন–ভাল লাগতেও তো পারে।

নিজের ভাষাপ্রয়োগের বহরেই হয়তো হেসে উঠলেন। তার পর উৎসুক দুই চোখ ওর মুখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো পাঠিয়ে দিই তোমার কাছে–পাঠাবো?

নীরব দৃষ্টি-বিনিময়। তার পর হঠাৎই অর্চনা হাসল একটু। বড় নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে কি ভেবে নিল খানিক। তখনো হাসছে একটু একটু। শেষে খুব সহজভাবেই বলল, আচ্ছা পাঠাবেন।

আনন্দে কল্যাণীদি বুঝি জড়িয়েই ধরবেন তাকে। কিন্তু আনন্দের মুখেও থমকেই গেলেন, ভরসা করে ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না– সত্যি বলছ?

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে অর্চনা বলল, হ্যাঁ–। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আসি–

সেই রাতেই নিখিলেশ এসেছে! আসবে অর্চনা জানত। দাশুর হাত জোড়া, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ও নিজেই শান্ত মুখে দরজা খুলে দিল। আসুন।

যেন প্রতীক্ষাই করছিল। তবু নিখিলেশ বিব্রত বোধ করেছে একটু। দিদি কেন যে তাকে এক রকম ঠেলেই পাঠালো খুব স্পষ্ট নয়। বলল, অসময়ে বিরক্ত করলাম না তো?

না, বিরক্তি কিসের, আসুন।

ধরে নিয়ে এলো তাকে। নিখিলেশ আবারও বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে দিদি এমন তাড়া লাগালো যে–

জানি। বসুন–। অর্চনারই কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই। এমন দ্বিধাহীন সহজ তাকে কোনদিন দেখা যায়নি। বরং যে এলো তার সঙ্কোচ লক্ষ্য করেই যেন হাসিমুখে বলল, দিদি তাড়া না দিলেও আসতে কোন বাধা নেই, কল্যাণীদির ভাই আপনি, আপনাকেও আপনজন ভাবতে ইচ্ছা করে।

নিখিলেশ অবাক হবে কি খুশী হবে ভেবে পাচ্ছে না।

অর্চনা খাটের একধারে বসল।–চা খাবেন একটু?

অসুবিধে না হয় তো আপত্তি নেই।

অসুবিধে কিসের–। উঠে দাশুকে দু পেয়ালা চায়ের কথা বলে আবার এসে বসল।–দাশুর চায়ের জল আর মেজাজ দুই-ই সবসময়ে চড়ানো থাকে। এখন আপনি আছেন, মেজাজ দেখাতে পারবে না।

নিখিলেশ হেসে বলল, অনেক কাল আছে শুনেছি।

অনেক কাল। তাকে ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা আমাকে জব্দ করেছেন।

আলাপের আর একটা সুতো পেল নিখিলেশ–আপনার বাবাকে খুব দেখার ইচ্ছে, দু-বছরেও হল না।

বেশ তো, একদিন চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি, একেবারে সাদা মানুষ–

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে অর্চনার সাদা বেশবাসের দিকে চোখ গেল নিখিলেশের। ইতিমধ্যে দাশু চা নিয়ে হাজির। অর্চনা উঠে এক পেয়ালা তার হাতে দিয়ে অন্য পেয়ালাটা নিজে নিয়ে বসল। দাশু চলে গেল।

চুপচাপ পেয়ালায় দু-চারটে চুমুক দিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল, আজ দিদির ওখানে গেছলেন নাকি?

হ্যাঁ... আপনার কথাও শুনলাম—

আমার কথা?

দিদি বললেন, আপনি কাজের মানুষ অথচ আজকাল কাজকর্ম কিছু করেন না, আমিই নাকি উপলক্ষ।

নিখিলেশ যেমন বিব্রত, তেমনি অবাক। এই অর্চনা বসুকেই কি সে এত দিন দেখে আসছে!–দিদি বলেছে এ কথা?

বলেছেন। আপনাকে ভালবাসেন বলেই বলেছেন। কত বড় ভবিষ্যৎ আপনার সামনে, যে-কোন দিদিই বলবেন।–আপনার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিলেশ পেয়ালা তুলে নিল। হঠাৎ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে একটু হকচকিয়েই গেছে সে।

অর্চনা তার পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে খুব সহজ অথচ শান্ত মুখে বলল, আপনাদের এই ইস্কুলে কাজ করছি এটা আমার কাছে কতবড় পাওয়া আমিই জানি। এ আমি হারাতে চাইনে।

নিখিলেশ বিস্মিত।–এ কথা কেন?

জবাবে দুই এক মুহূর্ত চুপ করে রইল অর্চনা, তার পর একটু হেসেই ফিরে বলল, কিছু যদি না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

নিখিলেশ নির্বাক জিজ্ঞাসু।

আপনার বয়েস কত?

নিখিলেশ প্রায় বিমূঢ়। অস্ফুট জবাব দিল, বছর ঊনতিরিশ-তিরিশ... ।

অর্চনা মাথা নাড়ল।–আমিও সেই রকমই ভেবেছিলাম। হাসল একটু, আমার ছত্তিরিশ। এম. এ. পড়তে পড়তে মাঝখানে কয়েক বছর পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।

হতভম্বের মত নিখিলেশ চেয়েই আছে। জীবনে এমন একটা বিস্ময়ের মুহূর্ত আর আসেনি বোধ হয়।

অর্চনা একটু থেমে খুব সাদাসিধে ভাবেই বলে গেল, কল্যাণীদি ঠিক বুঝতে পারেননি, আমি কোন হতাশা নিয়ে বসে নেই– বরং নিজেরই ভুলের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করছি।...হাসতে চেষ্টা করল আবারও, আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান, আপনাকে আর বেশি কি বলব।

.

রাত বাড়ছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। খুব দূরে মাঝপ্রহরের শিয়াল ডেকে উঠল কোথায়। অর্চনা খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃশব্দে একটা যাতনার নিষ্পেষণ ভোগ করছে।

উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। সামনে আবছা নিস্তরঙ্গ গঙ্গা। ভিতরের যাতনাটা বাড়ছেই। মালীর ছেলেটা ডুবতে ডুবতেও ডাঙা খুঁজেছে অর্চনার সেই খোঁজার আকুতিও গেছে! সরে দেয়ালের তাকের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘুমের ওষুধ। না থাক–।

ওষুধের শিশি রেখে দিয়ে ঘরের ঈজিচেয়ারটা অর্ধেকটা বাইরের বারান্দায় টেনে এনে বসল। বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। আকাশে নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারাদের মূক উৎসব।

অর্চনা ভাবছে কিছু। ভাবছে না, কিছু যেন মনে পড়ছে। নতুন করে জন্ম হল ব্যথার, তার অব্যক্ত আর্তস্বর ছড়িয়ে পড়ছে ফেলে আসা জীবনের আনাচে-কানাচে। তারাই ভিড় করে আছে। বেদনার্ত আলোড়ন একটা। চোখের সামনে আবছা ভেসে উঠছে কিছু। দূরে, অনেক দূরে...।

...সারি সারি বিশাল সিঁড়ি আর সিঁড়ি। প্রায় আকাশ-ছোঁয়া।

...তার শেষে ইতিহাসকালের বিরাট এক প্রাসাদের আভাস।

...সেখানে এক অতিবৃদ্ধ মুসলমানের মূর্তি। শণের মত ধপধপে পাকা চুল পাকা দাড়ি বাতাসে উড়ছে...মুখ নেড়ে কিছু বলছে সে।

...সামনে একটা জালি দোলায়...হিজিবিজি কি-সব জড়ানো তাতে...শত সহস্র, হাজার হাজার!

...সেই জালিদেয়ালের সামনে থেকে, সেই অবাক-চোখ মুসলমান বুড়োর কাজ থেকে, সেই প্রাসাদসৌধের ওপর দিয়ে সেই সিঁড়ি ধরে যে মেয়েটা তরতরিয়ে নেমে আসছে–সে ও নিজেই। সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি–সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। কলকাতা কতদূর?

ঈজিচেয়ারেই ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসল অর্চনা।

...ওটা শেষের অঙ্ক। শুরু ছিল। তারও অনেক আগে...

অস্পষ্টতার আবরণ ভেদ করে জনাকীর্ণ কলকাতা শহরের সদর রাস্তায় একটা দোতলা বাস স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ।

শুরু সেইখানে।

৩. বাসে করেই য়ুনিভার্সিটি

ফাঁক পেয়ে অর্চনা সেদিন বাসে করেই য়ুনিভার্সিটি যাচ্ছিল।

মা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁর সামাজিক কর্তব্য পালনে। সময়মতই ফিরবেন বলে গিয়েছিলেন। অর্চনা ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, তার পরেই বেরিয়ে পড়েছে। বাসে করে যেতে তার একটুও খারাপ লাগে না। মারের কচকচির জন্য কলের পুতুলের মত গাড়িতেই যেতে হয় বেশির ভাগ। কিন্তু ফাঁক পেলে ছাড়েও না। দশজনের ব্যস্তসমস্ততার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে এ-ভাবে যেতে শুধু ভাল লাগে না, বেশ আত্মনির্ভরশীলতার বোধটুকুও জাগে।

অথচ অবস্থা তাদের এমন কিছু ভাল নয়। যেটুকু দেখায় সে শুধু মায়ের কেরামতিতে। ঠাট বজায় রাখার জন্য বাবা বেচারীকে এ-বয়সেও কম খাটতে হয় না। পেনসানের পর শুধু বড় বই ক'টার আয়েও চলছে না-স্বনামে বে নামে আরো এটা সেটা লিখতে হয়ই। বাবা বলেন, এই সব আজে-বাজে শর্টকাট আর নোট লিখে ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে। বাবা চেষ্টা করলেও আজে-বাজে লিখতে পারেন এটা অবশ্য অর্চনা বিশ্বাস করে না। কিন্তু খুশী মনে যে লেখেন না সেটা বোঝা যায়। না লিখে উপায় কি, প্রিন্সিপালের আর কতই বা পেনসান–তাছাড়া মায়ের যা তাগিদ! একটা গাড়িতে আর চলে না, মেয়েদের অসুবিধে নিজের অসুবিধের ফিরিস্তি দেন ফাঁক পেলেই। বাবার সঙ্গে একটু আধটু লেগেও যায় এই নিয়ে। অর্চনাকেও মা খুব রেহাই দেন না, এই আদরিণী মেয়ে যদি বাপকে গিয়ে ধরে আর একটা গাড়ির জন্যে, তাহলে হয়তো কিছুটা এগোয়। গাড়ির

জন্যে একটা কিছু নতুন বই লেখা খুব অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। অর্চনা মাকে খুশী করার জন্যেই বাবাকে আচ্ছা করে বলবে বলে আশ্বাস দেয়। আর বাবাকে বলে, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি কোরো না, যা বলে বলুক না, একটা গাড়ি আছে এই বেশি-আমরা অনায়াসে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে পারি। বাবাকে আবার সাবধানও করে দেয়, আমি বলেছি বোলো না যেন মাকে, তাহলে দেবে শেষ করে–।

যে-বাসে যাওয়া নিয়ে মায়ের এই আপত্তি, সেই বাসেই আজ এক মন্দ মজা হল না।

অফিস টাইম। দোতলা বাসেও ঠাসাঠাসি ভিড়। বাইরে লোক ঝুলছে, ভিতরেও বহু লোক দাঁড়িয়ে। একটা লেডিস সীটে অর্চনা একা বসে, পাশের জায়গাটুকু খালি। ঠিক তার পরেই এক হাতে মাথার বড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, অন্য হাতে বুকের সঙ্গে ঠেকানো এক গাদা বই। লম্বা-চওড়া চেহারা, সাদাসিধে বেশভূষা। পিছনের চাপে ভদ্রলোকের দাঁড়াতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়, এক-একবার টাল সামলানো দায় হচ্ছে।

অর্চনা এক একবার ভাবছে বসতে বলবে, আবার বলছে থাকগে বাবা দরকার নেই, সে-দিনের মত হয় যদি–।

আগে সীট খালি থাকলে এবং কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে বসতেই বলত। আর যাকে বসতে বলা, তার কৃতার্থ ভাবটাও দিব্বি উপভোগ করত। কিন্তু সে দিন কি কাণ্ড, মাগো! ভয়ানক মোটা এক ভদ্রলোকের দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল দেখে বসতে বলেছিল। ভদ্রলোক ইচ্ছে করেই হোক বা সত্যি বেশি মোট বলেই হোক-অর্চনার প্রাণান্ত অবস্থা।

জানালার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েও শান্তি নেই। আর কোন দিকে না তাকিয়েও অর্চনা বুঝতে পারছিল বাসসুদ্ধ লোক মজা দেখছে। এমনিতেই তো যেদিকে তাকায় জোড়া-জোড়া চোখ গায়ে বিঁধে আছে দেখে!

সেই দিনই অর্চনা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কক্ষনো কাউকে পাশে বসতে বলবে না...তাছাড়া এই ভদ্রলোকও তেমন মোটা না হোক, হৃষ্টপুষ্ট কম নয়–আর হাবভাবও কেমন রুক্ষ-রুক্ষ। এক-একবার বেশ রাগ-রাগ ভাবেই তাকাচ্ছে খালি জায়গাটুকুর দিকে।

কিন্তু অতগুলো বই নিয়ে লোকটির দাঁড়ানো মুশকিল হচ্ছিল ঠিকই। বাস যত এগোচ্ছে, অফিসযাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে, আর সেই অনুযায়ী ভারসাম্য রক্ষার ধকলও বাড়ছে। শেষে একটা জোরে ধাক্কা খেয়ে অর্চনার পাশে ধুপ করে বসেই পড়ল সে। অর্চনা ফিরে তাকাল।

কিছু মনে করবেন না, দাঁড়ানো যাচ্ছিল না–।

অর্চনা কিছু না বলে আর একটু ব্যবধান রচনার চেষ্টা করল।

কিন্তু বাসের লোকগুলোর ধরনই আলাদা। ট্রামে উঠলে অন্যরকম। থাকেও কত রকমের লোক! ভিড়ে চ্যাপটা, কিন্তু রসিকতাটুকু আছে। পিছন থেকে একটা ছোকরা টিপ্পনী কেটে উঠল, দাদা, ওটা লেডিস সীট—

কিছু না বলে লোকটি শুধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। অর্থাৎ সেটা জেনেই বসা হয়েছে।

বাসে ফাজিল লোকের অভাব নেই। রসিকতার লোভে ঝগড়াটা যেন আর একজন সেধে নিল। দাঁড়ানো যাচ্ছিল না দেখে দাদা বসেছেন, তাতে আপনার মাথাব্যথা কেন মশাই, লেডিস সীট লেড়ি বুঝবেন

সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের পাঁজা নিয়েই লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং টাল সামলাবার জন্য অন্য হাতে রডটা ধরে বক্তার খোঁজে ফিরে তাকাল। রড ধরা হাতের ঢোলা পাঞ্জাবিটা নেমে আসতে তার পেশীবহুল পুষ্ট বাহুখানা অনাবৃত হল। অর্চনা বেশ ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে।

দ্বিতীয়বার আর টিকা টিপ্পনী শোনা গেল না। লোকটি পিছনের দিকে একবার সরোষে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেন চ্যালেঞ্জের মাথাতেই অর্চনার পাশে বসে পড়ল আবার। এইভাবে পঁড়ানো তাকানো আর আবার বসার অর্থ খুব স্পষ্ট। অর্থাৎ অমন ইতর উক্তি আর কানে এলে ফলটা খুব ভাল হবে না।

অর্চনা সবিস্ময়ে এক-একবার আড়ে আড়ে দেখছে লোকটাকে, তার এই জিদ করে বসাটাও খুব অপছন্দ হয়নি যেন।

বাড়ি এসে বরুণাকে বলেছিল কাণ্ডটা। ভাইবোনের মধ্যে বরুণাই ছোট সব থেকে। আই. এ পড়ে, কিন্তু ইয়ারকিতে টইটুম্বুর। অর্চনা অবশ্য খুব নীরস করে বলেনি বাসের গুণ্ডাগোছের ভদ্রলোকের কাণ্ডটা।

বরুণা আকাশ থেকে পড়েছে, গুণ্ডাগোছের ভদ্রলোক কি রে! তারপর গম্ভীব মুখে জেরা করেছে বেছে বেছে সে তোর সীটের গায়ে গিয়েই দাঁড়িয়েছিল কেন-বাসে আর লেডিস সীট ছিল না?

তিলকে তাল করতে বরুণার জুড়ি নেই। প্রথম সুযোগেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমাচারটা শোনাল ননিদাকে। দাদার বন্ধু এবং সাইকেল রিকশর ব্যবসায় পাটনার ননিমাধব। দাদার থেকে বয়সে কিন্তু ছোট হলেও দাদার অসম্ভব একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু আসল ভক্ত কার, এবং দাদা বাড়ি থাক বা না যখন তখন বাড়ি এসে বসে থাকে কোন প্রত্যাশায়, সেটা অর্চনাও যেমন জানে ননিদাও তেমনি জানে। অর্চনাকে দেখলেই তার ফর্সা মুখ লাল হয়। আর পকেট থেকে রুমাল বেরোয়। আর তার সামনা-সামনি কোন লজ্জার কারণ ঘটলে (দিদির সামনে লজ্জার কারণটা বেশির ভাগ বরুণাই ঘটিয়ে থাকে। রুমালের ঘষায় ঘষায় ননিমাধবের ফল। মুখ রক্তবর্ণ হয়। দাদার সাময়িক অনুপস্থিতির ফাঁকে তার কাছেই করুণা প্রথম দু-চোখ কপালে তুলে বাসের মধ্যে দিদিকে গুণ্ডায় ধরার ব্যাপারটা নিবেদন করেছে।

কিন্তু বরাতক্রমে সেখানে যে মা এসে পড়বেন সে কি বরুণা জানত। এসে যখন পড়েছেন তাকেও সানন্দে ঘটনাটা না বলে পারল না, আর এখানে গুণ্ডা গোছের ভদ্রলোক না বলে শুধু গুণ্ডাই বলল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা যেমন উত্তেজিত তেননি ক্রুদ্ধ। প্রথমে অর্চনার উদ্দেশেই হাঁকডাক করলেন এক প্রস্থ। অর্চনা তখন নিজের ঘরে বসে বরুণার উদ্দেশ্যে কিল জমাচ্ছে। ওদিকে ননিমাধব ইন্ধন যোগালো আরো। মন্তব্য করল, ট্রামে-বাসে আজকাল ভদ্রলোকের মেয়েদের চড়াই উচিত নয়।

হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে মিসেস বাসু তাকেই দিলেন এক ধা। –তোমরা তো ব্যবসাই করছ দেখি বছরের পর বছর, একটা গাড়ি পর্যন্ত কিনে উঠতে পারলে না–ট্রামে বাসে না চড়ে কিসে চড়বে?

ননিমাধব আর ভরসা করে বলতে পারল না যে গাড়ি একটা আছেই।

গাড়ির জন্য স্বামীকে নতুন করে এক প্রস্থ ঝালিয়ে নেবার সুযোগ ছাড়লেন না মিসেস বাসু। অর্চনাকে ছেড়ে আপাতত তার উদ্দেশেই চললেন।

দোতলার কোণের দিকে একটা ঘরে থাকেন ডক্টর বাসু। তার ডক্টরেক্টর বিষয়বস্তু দর্শনশাস্ত্র। অবশ্য ইংরেজিতেও এম এ, ভদ্রলোক, কিন্তু দর্শনেরই যে প্রভাব বেশি সেটা তার অবিরাম চুরুট-খাওয়া মূর্তি আর ঘরের আগোছালো অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। একদিকে অবিন্যস্ত শয্যা, তারই ওপর স্তূপীকৃত বই–র্যাকের বইগুলো উলট-পালট-টেবিলেও বইয়ের গাদা আর বইপত্র ছড়ানো। তারই মধ্যে কখনো বিছানায়, কখনো বা টেবিলে-চেয়ারে বসে দিব্বি নিবিষ্ট মনে কাজ করে যান ভদ্রলোক। শুধু অর্চনা ছাড়া কেউ আর এই সব বইপত্র ছুঁতেও সাহস করে না। সপ্তাহের মধ্যে কম করে তিনদিন বাবার ঘর গোছায় অর্চনা আর অনুযোগ করে, কবে হয়তো দেখব তুমি বই চাপা পড়ে আছ

বইপত্রের মধ্যেই আধশোয়া হয়ে আত্ম-তত্ত্বের একটা ইংরেজী প্রবন্ধ পড়ছিলেন তিনি। আর মনে মনে ভাবছিলেন, অর্চনা যদি এসে থাকে তাকে পড়ে শোনাবেন। বাবার কাছে বসে এই শোনার ধকলটা অর্চনাকে মুখ বুজে সইতে হয়। সয়ও, কারণ রিটায়ার করার

পর আর সময় কাটে না, বেচারা বাবা করবেনই বা কি সারাক্ষণ। কিন্তু ওর বদলে যিনি এলেন, ভদ্রলোকের আত্মতত্ত্বোপলব্ধির মেজাজটা রসাতলে গেল।

মিসেস বাসু ঘরের বাইরে থেকেই কণ্ঠস্বরে আগমন ঘোষণা করতে করতে এলেন।–কতদিন বলেছি একটা গাড়িতে চলে না, চলে না–আর একটা গাড়ি কেনো! একটা বিপদ না বাধলে আমার কথা কি কানে যাবে।

ডক্টর বাসু আত্মতত্ত্ব থেকে মুখ তুলে বুঝতে চেষ্টা করলেন কি ব্যাপার, তারপর নিস্পৃহ মুখে জবাব দিলেন, কথা কানে গেলেই তো আর গাড়ি কেনা যায় না, টাকা লাগে

টাকা লাগে, টাকা লাগবে। এই এক অজুহাত আর যেন বরদাস্ত করতে রাজী নন মিসেস বাসু। মেয়েটা ধেই-ধেই করে ট্রামে-বাসে যাক আর যতসব পাজী গুণ্ডার খপ্পরে পড়ুক, কেমন?

ডক্টর বাসু অবাক, ট্রামে-বাসে গুণ্ডা!

মাকে গজগজিয়ে বাবার ঘরের দিকে যেতে দেখেই তাল সামলাবার জন্যে অর্চনাকেও মায়ের অগোচরে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। পিছন থেকে তার গা ঘেষে বরুণাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মা সামনের দিকে মুখ করে আছেন, কিন্তু বাবা দেখতে পাচ্ছেন তাদের। অর্চনা ইশারায় হাত নেড়ে বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কিছুই নয়।

স্বামীর অজ্ঞতায় মিসেস বাসু প্রায় হতাশ। জবাব দিলেন কোথায় কি সে জ্ঞান যদি তোমার থাকত তাহলে আমার আর ভাবনা ছিল কি। মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কি হয়েছে আজ

বলতে বলতে স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে দেখেন দরজার ওধারে অর্চনা আর বরুণা দাঁড়িয়ে। মায়ের চোখে চোখ পড়তে পড়তে বরুণা কেটে পড়ল, অর্চনা সামলে নিয়ে নিরীহ হতে চেষ্টা করল। মেয়েকে ডাকার কাজটা মিসেস বাই করলেন।–এই যে, এসে বল কি হয়েছে আজ–

অর্চনা দরজার কাছ থেকেই ঢোঁক গিলে বলল, তুমিই বলো না আমি কি আর তোমার মত করে বলতে পারব–।

ব্যাপার কিছু নয় বুঝে ডক্টর বাসু আত্মতত্ত্বে ডুব দিতে চেষ্টা করলেন আবার। কিন্তু সেই চেষ্টার আগেই স্ত্রীটি কাগজটা নিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল।–মেয়েরা আর একদিনও ওভাবে ট্রামে-বাসে যাবে না আমি বলে দিচ্ছি।

ডক্টর বাসু বিরক্ত হলেন, গাড়ি কি নেই নাকি! তাছাড়া হাজার হাজার মেয়ে দিনের পর দিন ট্রামে বাসেই যাচ্ছে।

যে যাচ্ছে যাক, আমি জানতে চাই তুমি আর একখানা গাড়ি কিনবে কি না!

স্ত্রীর এই অবুঝপনাই ডক্টর বাসু বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না সব সময়। উঠে বসে অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বলে উঠলেন, কিনব কি দিয়ে, টাকার জন্যে তো দিনরাত নোট লিখে

লিখে ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছি–তাতেও রেহাই নেই। তোমার বাড়ি, তোমার গাড়ি, তোমার শাড়ি, তোমার পার্টি–

অর্চনা পালিয়ে বাঁচল। আর বরুণাকে হাতের কাছে পেয়ে সত্যিই গোটাকতক কিল বসিয়ে দিল গুমগুম করে।–পাজী মেয়ে, তোর জন্যেই তো

কিলগুলো খুব আস্তে পড়েনি, তবু সেগুলি হজম করে বরুণা হেসে গড়াগড়ি।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবার কথা, কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে ওপরওয়ালা যে যোগাযোগ ঘটান, সেটা সুদূরপ্রসারীও হয়।

বাড়ির গাড়িতে যুনিভার্সিটি যাবার পথে অর্চনা বাস-স্টপে সেই একরোখা লোকটাকে বাসের অপেক্ষায় একগাদা বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে পর পর আরো দুদিন। এক পথেই যায়, আর লোকটা এক জায়গা থেকেই ওঠে যখন, দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অর্চনা একদিন ভেবেছে, এই বয়সেও কলেজে পড়ে নাকি! আর একদিন ভেবেছে, মোটরে তুলে নিলে কি হয়? কিন্তু একা সাহস হয় না, বরুণা থাকলে ঠিক মজা করা যেত। বরুণার কলেজ বাড়ির কাছেই, সে অনেক আগেই নেমে পড়ে। তা বলে সত্যিই লোকটার সম্বন্ধে তেমন কোন কৌতূহলই ছিল না–ওই দেখার মুহূর্তটুকু যা।

কিন্তু কৌতূহলের কারণ ঘটল একদিন।

বাবার ঘরে বসে সেদিন সন্ধ্যায় অর্চনা তার কি একটা লেখা নকল করে দিচ্ছিল। মা-ও ছিলেন ঘরে। বাবার ট্রাক খুলে ব্যাঙ্কের পাস-বইয়ের জমা খরচ দেখছিলেন। টেলিফোন বেজে উঠতে বাবা টেলিফোন ধরলেন। কথাবার্তায় মনে হল বাবা কারো স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার খবর শুনে খুণী হয়েছেন। অর্চনার মনে পড়ল, ইলা-মাসীর ছেলে মিন্টু, এবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে বটে। ইলা-মাসী বাবার ব্যারিস্টার বন্ধুর জী, মারে অন্তরঙ্গ বান্ধবী। অর্চনা-বরুণারও যাতায়াত আছে সেখানে।

টেলিফোনে কিছু শুনেই বাবা যেন থমকে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠ কানে এলো, অ্যাঁ? পা-পার্টি-হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়, কবে?

মায়ের কানে কিছুই যায়নি বোধ হয় এতক্ষণ, পাটি শুনে ঘাড় ফেরালেন। তারপর ইশারায় জানতে চাইলেন, কে?

বাবার মুখভাব বদলেছে, কিন্তু মুখে খুশীর ভাবই প্রকাশ করেছেন। মায়ের ইশারার জবাব না দিয়ে ফোনের জবাবটাই শেষ করলেন, খুব ভাল কথা, তা আপনি বরং আমার স্ত্রীর সঙ্গেই পরামর্শ করুন–(হাসি) হা–আমি তো তার ওপরেই সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, ধরুন একটু

মিসেস বাসু ততক্ষণে কাছে উঠে এসেছেন। টেলিফোনের মুখটা চেপে তার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে ডক্টর বাসু সংক্ষিপ্ত উক্তি করলেন পার্টি

অর্চনার মজা লাগছিল, পাছে বাবার চোখে চোখ পড়ে যায় সেই জন্য তাড়াতাড়ি মুখ নামালো। টেলিফোনে মায়ের আনন্দটুকু আরো উপভোগ্য। মিন্টু, স্কুল ফাইন্যালে

একেবারে প্রথম হয়েছে শুনে একটু একটু আনন্দ প্রকাশ করলে চলে! আর সকলে মিলে আনন্দের ব্যবস্থা একটু? তা তো করতেই হবে, ওকে এনকারেজ করতে হবে না! সে-জন্যে ভাবনা কি, কিছু ভাবনা নেই–সব ঠিক হয়ে যাবে। উনি?

এবারে বাবার কথা বোধহয়। বাবা বইয়ে মন দিয়েছেন। অর্চনা ঘরে আছে তাও মায়ের খেয়াল নেই বোধ হয়। বাবার হয়ে একেবারে নিশ্চিন্তে কথা দিয়ে দিচ্ছেন, আর বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবেন, নিজে কতবড় স্কলার। জানো তো, এসব ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ! মেয়েরা একবার একটু খারাপ রেজাল্ট করলে ওঁর ভয়ে আমি সুদ্ধ চুপ–।

অর্চনার হাসি সামলানো দায়। চেয়ে দেখে বাবাও ওর দিকে চেয়ে হাসছেন। মা টেলিফোন রেখে বিছানায় বসলেন। দরজার ওধারে চোখ পড়তেই ডাকলেন এই দাশু, শোন–

দাশু ঘরে এসে দাঁড়াল।

দাদাবাবু কি করছে?

দাশু নির্বিকার জবাব দিল, ব্যবসা কচ্ছেন—

কি–? মায়ের বিরক্তি।

দাশু ব্যাখ্যা করে বোঝালো, নিচে দাদাবাবু আর ননিবাবুতে বসে কাগজে ব্যবসা লিখছেন।

মায়ের মাথায় অনেক ভাবনা। হুকুম করলেন, গিয়ে বল, আমি ডাকছি–

দাও চলে গেল, মা ঘুরে বসলেন বাবার দিকে।– শুধু হাতে তো আর যাওয়া যায় না, ছেলেটাকে একটা ঘড়িই দেওয়া যাক। বিজন গিয়ে দেখেশুনে আজই নিয়ে আসুক। কি বলো?

বই রেখে বাবা চুরুটের বাক্সর দিকে হাত বাড়ালেন। বইয়ের সাইজের সুন্দর একটা কাশ্মীরী কাজ-করা কাঠের বাক্সে চুরুট থাকে। ভয়ে ভয়ে অর্চনা বাক্সটা বাবার দিকে এগিয়ে দিল। মুখ বন্ধ করার জন্যই যেন তিনি আস্ত একটা চুরুট নিজের মুখগহ্বরে ঠেলে দিলেন।

ইলা-মাসির বাড়ির এই পার্টিতে অর্চনা এসেছিল। স্বেচ্ছায় আসেনি, আসতে হয়েছিল। মায়ের এই সব আভিজাত্য রক্ষার ব্যাপারে বরুণা তবু পার পায় কিন্তু ও বড় পায় না। অবশ্য এবারে বরুণাও রেহাই পায়নি। বাবা আসেননি। আসবেন না অর্চনা জানতই। ইলা-মাসি খোঁজ করেছিলেন। মা জবাবদিহি করেছেন, আর বলো কেন ভাই, আসতে পারলেন না বলে তার নিজেরই কি কম দুঃখ-হঠাৎ শরীরটাই খারাপ হয়ে পড়ল।...্যাই হোক, মায়ের সঙ্গে অর্চনা আজ পর্যন্ত যত জায়গায় গেছে, তার মধ্যে এবারে এই ইলা মাসির বাড়ি থেকেই মনে মনে একটু খুশী হয়ে ফিরেছে।

ছেলের পরীক্ষার কৃতিত্ব উপলক্ষে ঘরোয়া পার্টি হলেও অভ্যাগত একেবারে কম জোটাননি ইলা-মাসি। এখানে যাদের দেখল, তাঁদের সকলকেই কারো না কারো জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও দেখেছে, সাংস্কৃতিক জলসা বা নাচের আসরেও দেখেছে, আবার রিলিফ চ্যারিটি শোতেও দেখেছে। নতুনের মধ্যে শুধু মিণ্টুর দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব। কাজেই এ অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব কিছু ছিল না, আর অর্চনা ভাবছিল কতক্ষণে শেষ হবে, কতক্ষণে বাড়ি যাবে।

বৈচিত্র্যের কারণ ঘটল খাবার টেবিলে।

হল-ঘরে মস্ত একটা ডিম্বাকৃতি ডাইনিং টেবিল। চারদিকে গোল হয়ে বসেছেন সব। একটা ধার নিয়ে বসেছিল অর্চনা আর বরুণা। মায়ের হয়তো টেবিলের মাঝামাঝি বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মেয়েরা বসে পড়েছে দেখে বরুণার পাশে এসেই বসলেন তিনি। টেবিল ঘুরে তাদের উল্টো দিকে কয়েকটা আসন খালি, কেউ তখনো আসেননি হয়তো।

খাবার টেবিলের প্রধান আলোচনা, ছেলে মিণ্টু, ভবিষ্যতে কোন্ লাইনে যাবে আর কি পড়বে। ছেলে আর ছেলের বন্ধুরাও হাঁ করে সেই আলোচনা শুনছে। বরুণার ভাল লাগছিল না, অর্চনা অন্যদিকে তাকাতেই সে টুক করে তার প্লেটের কাটলেটটা নিজের প্লেটে তুলে নিল। অর্চনা দেখে ফেলে হাসি চেপে ভ্রুকুটি করে তাকাল তার দিকে। বরুণা চাপা গলায় বলল, তুই আর একটা চেয়ে নে না।

দুই বোনে এমনই চলত বোধহয়। ঠিক সেই সময়ে নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব। আর তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অর্চনা প্রায় হাঁ!...বাসের সেই লোকটা। বাসের মতই তেমনি সাদাসিধে বেশ-বাস। এ-রকম পরিবেশে একেবারে বেমানান।

মিন্টুর বাবা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন মিঃ মিত্র, আপনি কিন্তু লেট, বসে যান–।

লেট হওয়ার দরুন মিঃ মিত্রের কিছুমাত্র কুণ্ঠা দেখা গেল না। হাসিমুখে সে মিন্টুর দিকে এগিয়ে গেল। অর্চনা বরুণার কানে কানে যোগাযোগের বৈচিত্র্যটা জ্ঞাপন করতেই সে যুগপৎ আনন্দ আর বিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে দুই চোখের বিশ্লেষণের কাজটা সেরে নিল। লোকটা তখন মিন্টুর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে।

আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনায় বরুণা মাকে ফিসফিস করে বলল, মা-দিদির বাসের সেই গুণ্ডা।

মিসেস বাসু আগে লোকটাকে এক নজর দেখেছেন কি দেখেননি। এবারে ভাল করে দেখায় মন দিলেন। মিন্টুর কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে লোকটি তখন খালি আসনের একটাতে বসল। অর্চনা-বরুণার ঠিক উল্টো দিকে নয়–কিছুটা আড়াআড়ি। মিসেস বাসুর দৃষ্টিও সেখানেই এসে থামল। এ-রকম বেশভূষার একটা লোক এখানে কেন, সেটাও বোধ করি তার কাছে বিস্ময় একটু।

এদিকে অর্চনা আর বরুণাও চেয়ে আছে।

সকলের অগোচরেই ছোট্ট প্রহসনের সূচনা একটু। খাবারের প্লেট কাছে টানতে গিয়ে ওধারে অর্চনার চোখে লোকটির চোখে পড়ল। অর্চনা খাবারের প্লেটে দৃষ্টি নামাল। কিন্তু বরুণার সে কাণ্ডজ্ঞান নেই। হাঁ করে সে আর একটি দুর্লভ খাদ্যবস্তুই দেখছে যেন।

খেতে খেতে লোকটি আরো দুই একবার দেখল তাদের। কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে বোঝা যায়। অর্চনার সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি হতেই সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

ওখান থেকে ওভাবে প্রশ্ন নিক্ষেপ করা সুশোভন নয়। দুই একজন প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়া হাসি গোপন করে গেল। না দেখে থাকলেও দেখার লোভটা যেন স্বাভাবিক সেটা তারাও অস্বীকার করেন না। এটা তারা প্রাথমিক আলাপের চেষ্টা বলেই ধরে নিলেন। অর্চনা অতদূর থেকে হঠাৎ এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, মনে পড়ছে না।

মিসেস বাসু ভুরু কোচকালেন। বরুণা চাপা পুলকে দিদিকে বেশ করে চিমটি কাটল একটা।

ওদিকে টেবিলের আলোচনাটা মিন্টুর ভবিষ্যতের দিকেই ঘুরেছে আবার। এক ভদ্রলোক মিন্টুর বাবাকে পরামর্শ দিলেন, আপনি এক কাজ করুন মিঃ খাস্তগীর, বি. এ. পাস করিয়ে ওকে সোজা আই. এ. এস্-এ বসিয়ে দিন

তাঁর পাশের মহিলাটির তাতে আপত্তি। তিনি মত প্রকাশ করলেন, ও চাকরিতে আছে কি–আই, এসি, পাস করিয়ে ওকে বরং ডাক্তারি পড়তে দিন।

এ ধার থেকে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, ডাক্তারি থেকে আজকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভাল–পাস করে একবার বাইরে ঘুরে এলেই ব্রাইট ফিউচার।

বরুণা দেখল তার দর্শনীয় লোকটা খাওয়া ফেলে হাঁ করে মতামত শুনছে। পাশ থেকেই এবারে তারই মা বলে উঠলেন, আমি বলি ইলা, আই, এসি, পাস করিয়ে মিন্টুকে তুমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংএ দিয়ে দাও। আমার সেই বোনপোকে তো জানো, ওই তো বয়েস-এরই মধ্যে কত বড় অফিসার।

নতুন কিছুই বলেছেন। মিসেস বাসু অন্তরতুষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। আর শুধু বরুণা নয়, অর্চনাও দেখল, এবারে ঐ লোকটার নীরব বিস্ময় আর কৌতুকের কেন্দ্র তাদের মা।

এতজনের পরামর্শের মধ্যে পড়ে মিন্টুর বাবাকেও একটু চিন্তিত দেখা গেল। তিনি বললেন, তাই তো, এ এক সমস্যা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য একটি লোক উপস্থিত এখানে, সেটা যেন এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতে ঘাড় ফেরালেন, মিঃ মিত্র অমন চুপচাপ কেন আপনিই তো বলবেন–

সকলের চোখ এদিকে আকৃষ্ট হতে মিন্টুর বাবা আবার বললেন, ও...একে আপনারা চেনেনা বোধহয়-প্রফেসর সুখেন্দু মিত্র-মিন্টু, যে প্রথম হতে পেয়েছে সে তো ওঁরই হাতষশ।

প্রশংসা শুনেও হাত-যশস্বী লোকটা তেমন প্রীত হয়েছে মনে হল না অর্চনার। বরুণা ফিস ফিস করে মাকে আবার বলল, গুণ্ডা নয় মা, প্রফেসর

মিসেস বাসু প্রায় আত্মগত মন্তব্য করলেন, মাস্টারের চেয়ে গুণ্ডা ভাল

সকলেরই খাওয়া শেষ প্রায়। সুখেন্দু মিত্র ঝুঁকে দেখল, মিন্টুরাও হাত গুটিয়ে বসে আছে। বাপের কথার জবাব না দিয়ে ছেলের উদ্দেশ্যেই আগে বলল, তোমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি মিন্টুবাবু...ভাল ভাল দুটো বই এনেছি তোমার জন্য, পড়ার টেবিলে আছে–দেখগে যাও। বন্ধুদেরও নিয়ে যাও–

এই রকম একটা অবতরণিকা অপ্রত্যাশিত। মিল্টর বেরিয়ে গেল। অভ্যাগতরা একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এইবার ছেলের বাপের দিকে ঘুরল সুখেন্দু মিত্র, হেসেই বলল, পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটা যে বিশেষ কিছু সেটা ও এভাবে না জানলেই ভাল হত।...মিণ্ট, আই. এসি পড়বে আপাতত এর বেশী ভাবার দরকার আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

সকলেরই একটু-আধটু অপ্রতিভ অভিব্যক্তি। কালচারের সংজ্ঞায় প্রতিবাদ সৌজন্যবিরোধী, কাজেই এ-রকম শুনতে তেমন অভ্যস্তও নয় কেউ। বরুণ প্রথমে হাঁ, তার এবারের চিমটি খেয়ে অর্চনা অস্ফুট শব্দ করে উঠল একটু। অসহিষ্ণু মিসেস বাসুর ঠোঁটদুটো একবার নড়ল শুধু। অশ্রুত উক্তি, কাজেই শোনা গেল না।

.

নিচের ঘরে টেবিলের একদিকে বসে কাগজ কলম নিয়ে নিবিষ্ট একাগ্রতায় সাইকেল-রিকশর ব্যবসা বাড়ানোর স্কীম ছকে যাচ্ছে অর্চনা-বরুণার দাদা বিজন। ব্যবসা অনেকদিনই করেছে, স্কীমও নতুন নয়। তবে এতদিনে সেটা কিছুটা পরিণতির মুখে এসেছে। টাকার আশ্বাস কিছুটা পেয়েছে। তাই স্কীম করার একাগ্রতাও বেড়েছে। তার সামনের চেয়ারে বসে তেমনি মন দিয়ে ঘরের কড়িকাঠ দেখছে ননিমাধব। বিজনের অগোচরে এক-আধবার ঘড়িও দেখছে। য়ুনিভার্সিটি চারটেয় ছুটি হলেও মোটরে বড়জোর আসতে লাগে আধ ঘণ্টা...তার মানে এখনো আধ ঘণ্টার ধাক্কা। গতকাল ছুটির দিনটা মাটি হয়েছে। ফ্যাক্টরি থেকে টেলিফোনে বরুণার অনুমতি চেয়েছিল, থিয়েটারের টিকিট কাটবে কিনা। অনুমতিটা আসলে কার দরকার সেটা বরুণাও ভালই জানে। তবু দিদিকে জিজ্ঞাসা না করেই সাফ জবাব দিয়েছে, কোন আশা নেই, কাল ইলা-মাসির বাড়িতে পার্টি।

আবার ছুটির দিন আসতে তো ছ'টা দিন...!

ঘরের কোণে ঈজিচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে একটা নতুন উপন্যাসে ডুবে আছে বিজনের স্ত্রী ইন্দ্রাণী দেবী, সংক্ষেপে রাণু বউদি। কি একটা কাজে বিজন ফ্যাক্টরি থেকে আগেই বেরিয়েছিল। ননিমাধককে বলে গিয়েছিল সে যেন সাড়ে তিনটেয় বাড়ি আসে–জরুরী আলোচনাটা সেখানে বসেই হবে। ননিমাধব সাড়ে তিনটেয় না এসে তিনটেয় এসেছিল। য়ুনিভার্সিটি তে কত কারণেই ছুটি থাকে, বরাত ভাল থাকলে আজও ছুটি থাকতে বাধা কি। বিজুদ আসব আগে আধ ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু বরাত ভাল নয়। এসে শুনল য়ুনিভার্সিটি খোলাই। বাড়িতে আর কেউ না থাকায় দাশু রাণু বউদিকে খবর দিয়েছে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রানু দেবীকে বই হাতে করেই উঠে

আসতে হয়েছে। গল্পের বই হাতে পেলে আহার-নিদ্রা ঘুচে যায় মহিলার। তার ওপর তেমনই বই এটা। আগুন, আগুন- ডবল আগুনের তাপ বোধহয় অনেকদূর পৌঁছেছে। বিজনের সাড়া পেয়ে শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতিথি-আপ্যায়নের দায় শেষ করে ঈজিচেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেই নিরাপদ, ওপরের ঘরে ঘরে এক্ষুণি শাশুড়ী ঠাকরুণ টহল দেবেন–তার হাতে বই দেখলে সকলেরই চোখ টাটায়। অবশ্য, আবার আগুন-আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে দাশুকে খাবার আর চায়ের নির্দেশ দিয়ে এসেছে, নইলে পাঠে বিঘ্ন ঘটবে জানা কথাই।

খানিকক্ষণ হল দুজনের সামনেই খাবার রেখে গেছে দাও। এবারে ট্রেতে চা এনে দেখে খাবারের প্লেট ছোঁয়াও হয়নি। সকলের অগোচরে একটা নীরব অভিব্যক্তি সম্পন্ন করে ব্যবসায়ী দুটিকে সচেতন করাবে আশায় দাশু যার দিকে ফিরে তাকাল–সে আরো অনেক দূরে। মলাটের গায়ে ভবল আগুন থেকে এতে দাশু এদিকেই ফিল আবার তার পর গলা দিয়ে একটা ফ্যাসফেসে শব্দ বার করে নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটাল।

বিরক্তমুখে বিজন মুখ তুলে তাকাল।–রেখে যা।

চা রেখে দাশুর প্রস্থান। এই সুযোগে ননিমাধব নড়েচড়ে বসে খাবারের প্লেটটা কাছে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু হল না। বিজনের লেখার কাজ শেষ হয়েছে। ব্যবসায়ের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিত্রটা এঁকে ফেলে টাকার অঙ্কটা মোটামুটি হিসেব করে ফেলেছে। বলল, আচ্ছা শোনো–

ননিমাধব শোনার জন্য হাত গুটিয়ে নিল।

এখন আমাদের সাইকেল-রিকশর প্রোডাকশন ডেলি ধরে। তিনটে—

নিনিমাধব চিন্তা করল একটু।–সাড়ে তিনটেও ধরতে পারে।

ও সাড়ে-টাড়ে ছাড়ো–তিনটেই। আমাদের করতে হবে ডেলি কম করে দশখানা–তাহলে লোক বাড়াতে হবে অন্তত তিনগুণ, ফ্যাক্টরির স্পেস চাই দ্বিগুণ। এই মেসিনপত্রের লিস্ট–এগুলো তো আনাতেই হবে।...সব খরচা ফেলেছি দেখ, আপাতত তিরিশ হাজার টাকার নিচে হবে না। স্কীমটা নিয়ে গিয়ে তোমার বাবাকে বেশ বুঝিয়ে টাকার কথা বলো–

টাকার অঙ্কটা শুনে ননিমাধব ঢেক গিলে বলল, বলেই ফেলি, অ্যাঁ?

নিশ্চয়। এরপর আর যত দেরি হবে তত ক্ষতি–

ক্ষতিপূরণের মত করেই খাবারের ডিশটা হাতের কাছে টেনে নিল সে। কিন্তু এবারে তার সেই চেষ্টায়ও ব্যাঘাত ঘটল। ননিমাধব আমতা আমতা করে বলল, আচ্ছা বিজুদা টার্গেটটা একেবারেই দশটা না করে আমরা যদি এখন ছ'টা করি।

ছটা! পার্টনারের প্রস্তাব শুনে বিজন আহত-দশটাই তো কিছু নয়। নতুন প্ল্যানে হাজার হাজার মাইল রাস্তা হচ্ছে এখন–সর্বত্র তো সাইকেল-রিকশই চলবে! যে-রেটে ডিম্যাণ্ড বাড়ছে, দাঁড়াও, দেখাই–

স্ত্রীর উদ্দেশে বলল–রাণু, আমার সেই চার্ট আর–

থেমে গেল। স্ত্রী এ রাজ্যে নেই। বিরক্তমুখে নিজেই চেয়ার ঠেলে উঠে চার্ট আর প্ল্যান আনতে বেরিয়ে গেল সে।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে এবারে নানাবিধ খাবারের ডিশটা সামনে টেনে আনল। চা তো জুড়িয়ে জল। কিন্তু খাওয়া আজ কপালে লেখা নেই বোধহয়। বাইরের বারান্দা ধরে টকটক জুতোর শব্দ শোনা গেল। বলা বাহুল্য সে শব্দ কোন পুরুষ-চরণের নয়। ননিমাধবের মুখের রঙ বদলায় সঙ্গে সঙ্গে। খাবার ছেড়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করল সে। কিন্তু সেটা মুখ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই দোরগোড়ায় যে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বরুণ।

বরুণা জানান দিল, দিদি নয়, আমি।

হাসতে চেষ্টা করে ননিমাধব বলল, হ্যাঁ— রুমালটা পকেটে।

বরুণা ঘরে ঢুকে সরাসরি দাদার চেয়ারেই বসে পড়ল। ঝুঁকে বউদির হাতের বইখানার নাম পড়ে ছোটখাটো মুখভঙ্গি করল একটা। তারপর ননিমাধবের দিকে তাকাল।

ননিমাধব জিজ্ঞাসা করল, কাল পার্টিতে গেছলে?

তাকে দেখে এই রসটা পরিবেশন করার আগ্রহেই বরুণার ঘরে ঢোকা। সোৎসাহে জবাব দিল, হা-আর, কি কাণ্ড জানেন?

ননিমাধবের চোখে কাণ্ড শোনার আগ্রহ।

বরুণা বলল, পার্টিতে সেই বাসের গুণ্ডা–সেই যে সেই–

ননিমাধব এস্তে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বুঝেছে। গলা নামিয়ে বরুণা হতাশ ভঙ্গিতে যোগ করল, গুণ্ডা নয়, প্রফেসার! মা অবশ্য বলে, প্রফেসারের থেকে গুণ্ডা ভাল। চেয়ারে ঠেস দিয়ে আর একটুও জুড়ে দিল, সাইকেল-রিকশঅলাও বোধহয় ভাল।

ঠাট্টায় কান না দিয়ে নমিমাধব জিজ্ঞাসা করল-মানে, সে সেখানে ছিল?

শুধু ছিল। জাঁকিয়ে ছিল।– তারপর নির্লিপ্তমুখে খবরই দিল যেন, আমাদের সঙ্গে কত খাতির হয়ে গেল, আর দিদি তো সারাক্ষণ তার সঙ্গেই গল্প-সল্প করল।

বাইরে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ। বিজুদা হয়তো হাতের কাছে কাগজপত্র খুঁজে পায়নি। ননিমাধব মনে মনে প্রার্থনা করল, চট করে যেন না পায়, কারণ এবারের শব্দটা আর ভুল হবার নয়। বরুণাও সেই শব্দের উদ্দেশে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ, ওই আসছে

ননিমাধবের হাতটা আপনা থেকেই পকেটে গিয়ে ঢুকল আবার।

অর্চনাই। দরজার কাছ থেকে এক পলক সকলকে দেখে নিয়ে হাসিমুখেই বউদির পিছনে এসে দাঁড়াল। বইখানা দেখল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে এগিয়ে এসে ঈজিচেয়ারের হাতলের ওপরেই বসল। রানু দেবীর হুশ ফিরল এতক্ষণে।

আহা, আগুন নিভিয়ে ফেললাম?

বিব্রত হলেও রানু দেবীর চোখের সামনেই জবাব মজুত। ননিমাধবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি মশাই, আগুন নিভেছে?

ননিমাধব বিগলিত, এর পরেই হাতের রুমাল মুখে না উঠে থাকে কি করে। দেখাদেখি বরুণাও গম্ভীর মুখে তার রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগল। হাসি চেপে অর্চনা কুটি করে তাকাল তার দিকে, এই–তুই ওখানে কি কচ্ছিস রে?

রুমাল নামিয়ে বরুণা ধীরে-সুস্থে জবাব দিল, কালকের পার্টিতে সেই গুণ্ডা প্রফেসারের সঙ্গে তোর কেমন ভাব হয়ে গেছে ননিদাকে সেই কথা বলছিলাম। রাগতে গিয়েও অর্চনা হেসেই ফেলল। ননিমাধব এতক্ষণে কথা বলার ফুরসত পেল।–আজ এত দেরিতে ছুটি যে?

রাণু দেবী যোগ করল, ভারি অন্যায়–।

অর্চনা হাসিমুখে ফিরে ননিমাধবকেই জিজ্ঞাসা করল, আপনার এত সকাল সকাল ছুটি যে, ফ্যাক্টরি তো পাঁচটা পর্যন্ত?

ননিমাধব জবাব হাতড়ে পাওয়ার আগেই রসভঙ্গের জবাবটি এসে হাজির। বিজন। হাতের কাছে সত্যিই কাগজপত্রগুলো না পেয়ে বিলক্ষণ বিরক্ত। তার ওপর এরা। বরুণা অবশ্য জিভ কামড়ে তৎক্ষণাৎই উঠে পড়েছে, তবু রেহাই পেল না। বিজন বলল, কাজের সময় সব এখানে কেন, বাড়িতে আর জায়গা নেই। যা পালা–

অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে দাদার বিরক্তি আর ব্যস্ততা নিরীক্ষণ করল একটু। তারপর টিপ্পনী কাটল, বা-ব্বা! সাইকেল-রিকশতেই এই–এরোপ্লেন হলে না-জানি কি হত!

.

বরুণা ননিমাধবের কাছে যেমন ঠাট্টাই করুক, ফাঁক পেলে এবারে সেই লোকটার সঙ্গে একটু যোগাযোগের বাসনা হয়তো মনে মনে অর্চনারও ছিল। লোকটার আচরণে মা স্পষ্টই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে দোষ কাটানোর জন্যে সেদিনই ইলা-মাসি তার ঢল। প্রশংসা করেছেন মায়ের কাছে। বলেছেন, আজকালকার দিনে ছেলেটি রত্ন-বিশেষ, একাড়ি টাকা খরচ করলেও এ-রকম লোক মেলে না। এর পর ইলা-মাসি যখন অনুযোগ করবেন এই নিয়ে তখন সে নাকি ভয়ানক অপ্রস্তুতও হবে। অর্চনার একটু-আধটু কৌতূহল ইলা-মাসির প্রশংসা শুনেই নয় বোধহয়... ঘরে-বাইরে-য়ুনিভার্সিটিতে ওর সামনে পুরুষের সলজ্জ বা বিব্রত মূর্তি অনেক দেখেছে। আর তাদের চোরা কটাক্ষ তো এখন আর বেঁধেও না। কিন্তু এই লোকটার রূঢ় সরলতার একটু ভিন্ন আবেদন। যে কারণে এরা সব প্রায় করুণার পাত্র, তার বিপরীত কারণেই এই লোকটির প্রতি একটুখানি বিপরীত কৌতূহল বাসে রেষারেষি করে ওর পাশে বসার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে কোথায় দেখেছে স্মরণ করতে না পারার নিরাসক্ততাও রমণীমনের নিভৃতে একটু লেগেছিল কি না বলা যায় না। জার্চনা অন্যরকম দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার অবচেতন মনেই প্রচ্ছন্ন ছিল। য়ুনিভার্সিটির পথে পরিচিত বাস-স্টপের সামনে এসে এক-আধবার শুধু লক্ষ্য করেছে মানুষটাকে দেখা যায় কি না। দেখা গেলে কি করবে অর্চনা নিজেও জানে না। পর পর দুদিনের এক দিনও দেখেনি। আগে বা

পরে ক্লাস থাকতে পারে, তাছাড়া মিনিটে মিনিটে বাস, দেখা না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় দিনে দেখল।

দেখল এক হাতে বুকের সঙ্গে ঠেকানো একগাদা বই, অন্য হাতে বড়সড় পোর্টফোলিও ব্যাগ একটা–দুই হাতই জোড়া, বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িটা আচমকা পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যেতে প্রায় আঁতকে উঠেছিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপের আগেই অর্চনা দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, আসুন–

মায়ের পাল্লায় পড়ে বছরে একটা করে পাড়ার অভিজাত ক্লাবের সাংস্কৃতিক অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। আসরে একবার নেমে পড়লে অর্চনা আলগা সংকোচের বড় ধার ধারে না। কিন্তু যাকে ডাকল তার অবস্থা নয়নাভিরাম।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, আসুন–

যে-মেজাজের মানুষই হোক, সেই মুহূর্তে সুখেন্দু মিত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। কি করবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত মুখে আহ্বানকারিণীর দিকেই তাকাল সে।

পিছনে একটি বাস আটকে পড়ে হর্ন বাজিয়ে বিরক্তি ঘোষণা করল। অর্চনা বলল, তাড়াতাড়ি উঠুন, এটা বাস-স্টপ!

বেগতিক দেখে সুখেন্দু মিত্র উঠেই পড়ল। গাড়ি চলল।

অর্চনা ধারে সরে গেছে। সেদিকে চেয়ে সুখেন্দু মিত্র আরো একটু বিব্রত, এভাবে টেনে তোলার পর পার্শ্ববর্তিনীর সাধারণ আলাপের ইচ্ছেটুকুও নেই যেন। এ-রকম একটা বিড়ম্বনার মধ্যে সে কখনো পড়েনি।

একটু বাদে অর্চনা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। কিছু যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

নিরুপায় সুখেন্দু মিত্র হাসতে লাগল।

অর্চনা হাসিমুখেই ঘুরে বসল একটু। এই কাণ্ড করে বসারস্পরে সহজতাই স্বাভাবিক। বলল, গাড়িতে উঠতে চাইছিলেন না কেন, বাসের ভিড় ঠেলতেই ভাল লাগে বুঝি?...তাই বা পারতেন কি করে, দু-হাতই তো জোড়া।

সেদিনের বাসের ব্যাপারটা মনে পড়তে সুখেন্দু মিত্র জোরেই হেসে উঠল। তার পর আলাপটা অন্যদিকে যোরাবার জন্য তার হাতের বইগুলোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি পড়েন?

ভদ্রলোক কলেজের প্রফেসার তাই বোধহয় আলাপের এই বিষয়বস্তু তেমন পছন্দ হল না অর্চনার। বইগুলোর কোলের ওপর থেকে পাশে আড়াল করে জবাব দিল, না ... আমার বোন পড়ে।

বোনটিকেও সেদিনের পার্টিতে এর পাশে দেখেছিল মনে পড়ছে! কি ভেবে আবারও জিজ্ঞাসা করল, আপনার বোন কি পড়েন?

আই এ।

সুখেন্দু কৌতুক অনুভব করছে বেশ। টয়েনবী আজকাল তাহলে আই এ তে পড়ানো হয়, আমাদের সময় ওটা এম, এ-তে পড়ানো হত।

ধরা পড়ে অর্চনা আবারও হেসে ফেলল।

একটু বাদে সুখেন্দু মিত্র নিজে থেকেই বলল, সেদিন মিন্টুদের বাড়িতে শুনলাম ডক্টর জি, এন, বাসু আপনার বাবা–

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনার মনে দুই একটা নীরব প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি...। শুনেছে যখন খুব সম্ভব ইলা-মাসির কাছেই শুনেছে। কিন্তু ও কার মেয়ে সেটা শোনার কারণ ঘটল কি করে? শোনার আগ্রহ না থাকলে ইলা-মসি শোনাতেই বা যাবে কেন? মনে মনে তুই একটু।- হ্যাঁ, বাবাকে চেনেন নাকি আপনি?

ছেলে পড়াই আর তার নাম জানব না। তবে তার ছাত্র না হলেও তাকে চেনার আমার একটা বিশেষ কারণ ঘটেছিল। অনেক কালের কথা, এখন বোধহয় তাঁর মনেও নেই।

অর্চনা ঈষৎ আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল বলুন তো?

না, তেমন কিছু নয়। প্রসঙ্গটা চাপাই দিল সে, আপনি তো য়ুনিভার্সিটিতে যাবেন, আমি একটু এদিকেই নামব। সেজন্য প্রকাশ করল, আজ ভালই আসা গেল...। আপনার বাবাকে প্রণাম দেবেন, চিনলে চিনতেও পারেন, খুবই চিনতেন—

এর পরেও একটা আমন্ত্রণ না জানানো বিসদৃশ।-একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি, বাবার সঙ্গে দেখা হবে~-আসবেন?

আসবে বলেই মনে হল, কারণ বাড়ির ঠিকানা নিয়ে রাখল সে।

কিন্তু আসেনি। আসেনি বলেই অর্চনাও আর বাস-স্টপের মোড়ে গাড়ি থামায়নি। পাছে দেখা হয় তাই রাস্তার উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বাস-স্টপটা পেরিয়ে গেছে। অবশ্য সেই দিনই সে কলেজ থেকে ফিরে বাবাকে সুখেন্দু মিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আর তার ফলে মায়ের হাতে ধরা পড়ে নাজেহাল।

বাবা কিছু একটা লিখছিলেন। অন্যমনস্কও ছিলেন। অর্চনা তার লেখার টেবিলেই পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা বাবা, তুমি সুখেন্দু মিত্র বলে কাউকে চিনতে?

বাবা মনে করতে পারেননি তাকে খুব চেনে শুনেই অর্চনা ভদ্রলোককে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছে। এখন বাবা তাকে আদৌ না চিনলে মেয়ের নিজেরও একটু সংকোচের ব্যাপার। অচন। তাই চেনাতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, একজন প্রফেসার, তোমাকে খুব চেনেন বললেন–তোমার ছাত্র না হলেও অনেকদিন আগে কি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল বললেন

এর পরেও ডক্টর বাসুর মনে পড়েনি।

কিন্তু এ নিয়ে যে আবার আর এক ঝামেলায় পড়তে হবে অর্চনা জানবে কি করে। মা ওদিকে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। এক বান্ধবীর বাড়ি যাবেন, মেয়েকেও নিয়ে যাবেন কথা দিয়েছেন। নিজে সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। মেয়েকে বাপের ঘরে ঢুকতে দেখে প্রস্তুত হবার জন্যে তাড়া দিতে এসে তার জিজ্ঞাসাবাদ শুনলেন। বলা বাহুল্য, শুনে খুব প্রীত হলেন না।

তার সঙ্গে তোর আলাপটা হল কখন?

অর্চনা প্রায় চমকই ফিরে তাকিয়েছিল, তার পর বিব্রতমুখে জবাব দিয়েছে, না, আলাপ না...য়ুনিভার্সিটি যাবার মুখে দেখা হয়ে গেল!

তুই তো গাড়িতে গেছলি?

অর্চনার কাহিল অবস্থা, তবু চেষ্টা করেছে সামলাতে।-হ্যাঁ, রাস্তায় খুব ভিড় ছিল ভদ্রলোক একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, এদিক থেকেই বাসে ওঠেন কিনা–

অকূলে কূল পেয়েছে, মায়ের সাজসজ্জার দিকে চোখ গেছে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে মা বেরুচ্ছ নাকি?

মুশকিল আসান। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে তাড়া দেওয়ার কথাটাই মনে পড়েছে তাঁর। আর প্রীতও একটু হয়েছেন।–থাক, তাড়াতাড়ি নিজে একটু সুন্দর হয়ে নে–মিতার ওখানে পাঁচটায় যাব কথা দিয়েছি, পাঁচটা তো এখানেই বাজল!

তক্ষুণি রেডি হবার উৎসাহে অর্চনা পালিয়ে বেঁচেছিল। কেন মরতে চেনাতে গিয়েছিল বাবাকে ভেবে সেই লোকটার ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার।

ডক্টর বাসু সেদিন অর্চনার মুখে শুনে স্মরণ করতে না পারলেও লোকটিকে চিনতেন যে খুবই সেটা এমন করে প্রকাশ হবে অর্চনা ভাবেনি।

এমন মজার ব্যাপার আর হয় না যেন।

কলকাতা শহরে জল হয়, জল হলে অনেক রাস্তা জলমগ্ন হয়, আর তখন অনেক রাস্তার মাঝখানেই যানবাহন অচল হয়। সেই অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মেজাজ বিগড়োয়। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বিধাতার চক্রান্ত সম্বন্ধে অথবা রাস্তাঘাটের দুরাবস্থার সম্বন্ধে তিক্ত অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু লজ্জায় কারো মাথা কাটা যায় না বোধহয়।

মিসেস বার সেদিন লজ্জায় মাথা কাটাই গিয়েছিল। তাঁদের গাড়িটা যে নতুন নয় সেই দুর্বলতা আর ক্ষোভ ছিল বলেই তার মনে হয়েছে, পথচারীরা পুরনো গাড়ির অচল অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছে। তার ধারণা, শুধু ড্রাইভারের কাণ্ড জ্ঞানহীনতার ফলেই এই দুর্ভোগ। তাই প্রথম অসহিষ্ণুতার ঝড়টা সেই বেচারার ওপর দিয়েই গেল।

গাড়ির দু-ধারে বসে অর্চনা আর তার মা। মাঝখানে বাবা। সামনে বিজন আর ননিমাধব। ছুটির দিনে মার্কেট থেকে ফেরার পথে এই বিড়ম্বনা।

রাস্তা জলে থৈ থৈ। দূরে দূরে আরো দুই একটা মোটর আটকেছে। এই গাড়ির চাকা এখনো অর্ধেকের বেশি জলের নিচে। জল এখনো টিপটিপ করে পড়ছে, কিন্তু গাড়ি নড়ে না। ড্রাইভার বিরস বদনে বনেট খুলে টুকটাক তদারক করে এসেও গাড়ি নড়াতে পারল না। অর্চনা ভয়ে ভয়ে এক-একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে, ড্রাইভারের কপালে আজ আরো কিছু আছে।

মিসেস বাসু ঝাঁজিয়ে উঠলেন, গাড়ি চলবে না? এভাবেই তাহলে বসে থাকি সমস্ত দিন? এ রাস্তেমে তুমকো কোন্ আনে বোল?

সুপারিশের আশায় ভিজে চুপসানো অবস্থায় বেচারা ড্রাইভার বিজনের দিকে তাকাল। কিন্তু তারও মুখে রাজ্যের বিরক্তি। শুধু ননিমাধবেরই বোধহয় খারাপ লাগছে না খুব, কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করার নয়।

স্ত্রীর কোপ থেকে ড্রাইভারকে আগলাতে চেষ্টা করলেন ডক্টর বাসু। বললেন, ওকে বকছ কেন সেই থেকে, ও কি করে জানবে এরই মধ্যে এখানে এতটা জল জমে গেছে।

তুমি থামো।...উল্টে মেজাজ আরো চড়ানো হল তার ড্রাইভারি করছে আর ও জানবে না জল হলে কতটা জল জমে এখানে! তুমি আর তোমার ওই ড্রাইভারই জান না, আর সকলেই জানে। ড্রাইভারের উদ্দেশে ধমকে উঠলেন, দেখতা কেয়া? আদমী বোলাও!

অসীম বিরক্তিতে নিজেই ফুটপাথের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন, কুলি, কুলি

মহিলাটি যেখানে উপস্থিত, গাড়িতে আর সকলেরই সেখানে প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা। দাদা আর তার পাশের মূর্তিটির ওপরেই বেশি রাগ হচ্ছে অর্চনার। একটা ব্যবস্থা কিছু করলেও তো পারে। মায়ের উগ্র কণ্ঠস্বরে রাস্তার লোকগুলোও যে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

শুধু রাস্তার লোকগুলোই নয়, আর একজনও ফিরে তাকিয়েছে। আধ ভেজা অবস্থায় ওদিকের গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। অর্চনা হঠাৎ খুশীও, আবার অপ্রস্তুতও।

সুখেন্দু মিত্র তাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলো। অর্চনা হাসতে গিয়েও মায়ের মূর্তি স্মরণ করে থমকে গেল। তাড়াতাড়ি বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

বাবা–

আঙুল দিয়ে বাইরের আগন্তুকটিকে দেখিয়ে দিল। জলের ওপর দিয়েই। জুতোসুদ্ধ পা চালিয়ে গাড়ির দিকে আসছে সে। মিসেস বাসু অপ্রসন্ন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, লজ্জায় মাথা কাটা গেল!

গাড়ির কাছে এসে সুখেন্দু মিত্র সকলের উদ্দেশেই দু-হাত জুড়ে নমস্কার জানাল। প্রতিনমস্কারের জন্য হাত তুলতে গিয়েও ডক্টর বাসু বিস্মিত নেত্রে তাকালেন তার দিকে। চিনতে চেষ্টা করলেন।–আপনি, তুমি, তুমি সুখেন্দু না?

হ্যাঁ স্যর।

খুশির আতিশয্যে ডক্টর বাসু মেয়েকে বললেন, সেদিন তুই সুখেন্দুর কথা বলছিলি? ওকে চিনব না, কি কাণ্ড ...।

যেন অর্চনাই দোষী।

কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে ভিজছ যে!

সুখেন্দু বলল, আমি আগেই ভিজেছি–।

সামনের সীটের দুজনও ঘাড় ফিরিয়েছে। পরম উৎসাহে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ডক্টর বাসু।–তোমার মনে নেই, সে যে একবার ছেলেগুলো স্ট্রাইক করেছিল জোট বেঁধে, আমি চাকরি রিজাইন করতে যাচ্ছিলাম–এই সুখেই তো সব দিক সামলালে। ভুলে গেছ? কি বিপদেই পড়েছিলাম...

মিসেস বাসুর বিগত বিপদ স্মরণ করার কোন বাসনা নেই। চাপা রাগে বললেন, এখন জলে পড়ে আছ-তোমার এই ড্রাইভার দিয়ে আর চলবে না।

দোষটা যে গাড়ির নয়, ড্রাইভারের, সেটাই শোনালেন কিনা তিনিই জানেন।

ডক্টর বাসু বস্তুজগতে ফিরলেন। বিব্রতমুখে হাসতেই চেষ্টা করলেন, ও হ্যাঁ, কি মুশকিল দেখ, ড্রাইভার আবার . ইনি আমার স্ত্রী।

সুখেন্দু জানাল, সেদিন ছাত্রের বাড়িতে তাকে দেখেছিল। কিন্তু মিসেস বাসু শুনলেন না বোধ হয়, ড্রাইভারের খোঁজেই তার উষ্ণ দৃষ্টি অন্যত্র প্রসারিত।

ডক্টর বাসু হৃষ্টচিত্তে সামনের দুজনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন! জলে পড়ার লজ্জা বা দুর্ভাবনা তার তেমন নেই। আমার ছেলে বিজন, আর ও ননিমাধব, আমাদের আত্মীয়ের মতই–দুজনে জয়েন্টলি সাইকেল-রিকশর ব্যবসা করছে।

বিজনের মনে হল, বাবা যেভাবে বললেন কথাটা যেন হাস্যকর কিছুই করছে 'তারা। প্রতিনমস্কারের হাত তুলল কি তুলল না। সামনের দিকে ফিরে এতক্ষণে সেও বিষম বিরক্তি সহকারে মন্তব্য করল, ড্রাইভারটা একটা আস্ত ইডিয়ট।

ননিমাধব অবশ্য হাত তুলেছে, নমস্কার করেছে, আর ডক্টর বাসুর হাস্যোক্তির সঙ্গে সঙ্গে হেসেছেও। তার পর ভাল করে লোকটাকে নিরীক্ষণ করেছে।

ডক্টর বাসু একদা-স্নেহভাজন লোকটির খোঁজখবর নিতে ব্যস্ত।–হ্যাঁ, কি করছ সুখেন্দু তুমি আজকাল?

এবার অর্চনাই স্মরণ করিয়ে দিল, বাঃ, সেদিন বললাম না তোমাকে!

মনে পড়ল।–ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলি। তুমিও মাস্টারি করছ। কোন্ কলেজে?–বেশ বেশ, তুমিও এই রাস্তাই নিলে শেষ পর্যন্ত–ভাল করোনি, মাস্টাররা আজকাল নো-বডির দলে।

আনন্দ দেখে অর্চনাই শুধু বুঝল, মাস্টারি করছে শুনেই বাবা সব থেকে খুশী। আর মাস্টার ছাড়া অন্য সকলকেই যে নিজে তিনি নো-বডি মনে করেন সেটাও ভালই জানে। কিন্তু মায়ের জন্যই অর্চনা স্বস্তিবোধ করছে না, কথাবার্তা না বলে প্রায় চুপ করেই

আছে। লোকটি হাসিমুখে বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে দেখেও, এতদিনে একবার বাড়ি না আসার অনুযোগটা করে ওঠা গেল না।

একে দেখে বাবা এতটা খুশী হবেন তা ও ভাবেনি। তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন তখনো– এদিকেই থাকো বুঝি? এই কাছে? কোথায়? কত নম্বর বাড়ি বলো তো?

যেন নিজেই তিনি যাবেন একবার দেখা করতে। ননিমাধব তখনো ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে। অর্চনার চোখেও চোখ পড়ছে, অর্চনা নিরীহ মুখে চেষ্টা করছে যাতে না পড়ে।

মা আর দাদার নীরব ধৈর্যচ্যুতির শেষ অবস্থায় দেখা গেল ড্রাইভার গাড়ি ঠেলার জন্য দুটো লোক এনে হাজির করেছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিংএ বসল, লোকদুটো পিছনে ঠেলতে গেল। ডক্টর বাসু সুখেন্দুকে বললেন, বড় খুশী হলাম, একদিন এসো কিন্তু আমাদের বাড়ি, ঠিক এসো–

কিন্তু এই জল-লীলার শেষ দৃশ্যটি বাকি তখনো।

গাড়ির দু-হাতও নড়ার ইচ্ছে দেখা গেল না। একে গাড়িটা নেহাত ছোট নয়, তার ওপর ড্রাইভার নিয়ে ভিতরে ছ-জন লোক বসে। বার দুই চেষ্টা করেই পিছনের লোকদুটো হাল ছাড়ল। সুখেন্দু দাঁড়িয়ে দেখছিল, হাত গোটাতে গোটাতে বিজন আর ননিমাধবের উদ্দেশে বলল, দুজনে হবে কেন, আসুন আমরাও একটু ঠেলে দিই–

প্রস্তাব শুনে গাড়ির সকলেই হকচকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শুধু ডক্টর বাসু ছাড়া। তিনি সানন্দে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তুমি–তোমরা! হা-হা করে হেসে উঠলেন

তার পরেই, ছেলেকে বললেন, যা না-ব্যবসা তো খুব করিস, গায়ে কেমন জোর আছে দেখি–

অর্চনার মজা লাগছে। কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় শঙ্কিত। নিরুপায় বিরক্তিতে বিজন গাড়ি থেকে জলে নামল। ননিমাধব নড়েচড়ে পিছনের দিকে তাকাতে অর্চনা মাকে বাবার আড়াল করে ইশারায় বলতে চাইল, আর বসে কেন, নামুন।

ননিমাধব বীরের মতই নেমে পড়ল।

তারা দুজন গাড়ির ও-পাশ থেকে ঠেলছে। অর্থাৎ মিসেস বাসুর দিক থেকে। পিছনে কুলি দুজন–এ-পাশে সুখেন্দ। অর্চনা মহা আনন্দে একবার তাকে আর একবার স-পার্টনার দাদাকে দেখছে। ডক্টর বাসু উৎফুল্ল হাতে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাতেই মিসেস বাসু সরোষে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে একটা চলন্ত লরী একেবারে চান করিয়ে দিয়ে গেল বিজন আর ননিমাধবকে। জলের ঝাপটা বাঁচাতে গিয়ে মিসেস বাসু স্বামীর গায়ের ওপর এসে পড়লেন।

ওদিকে কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা বিজন আর ননিমাধবের।

.

সারাপথ মিসেস বাসু রাগে গজগজ করতে করতে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তাই ফলল।

সেই থেকে বিজনের হাঁচি, কাসি আর অরভাব। একবার গার্গলের জন্য তিনবার করে গরম জল করতে করতে দাও মহাবিরক্ত। গা-হাত-পা টেপা আর নভেল পড়া দুটোই একসঙ্গে করতে গিয়ে রাণু দেবীও অনেকবার ধমক খেয়েছে। তার হাঁচির দমকে দাশুর হাতের গ্লাস থেকে ক-বার গরম জল চলকে পড়েছে ঠিক নেই। হাঁচির ভয়ে অতঃপর সন্তর্পণেই ঘরে, ঢুকেছে সে।

বিজন তিক্তবিরক্ত।–কি ওটা?

গরম জল।

ফেলে দে।

নভেলের আশা বিসর্জন দিয়ে রাণু দেবী ভয়ে ভয়ে দু-হাত লাগিয়েছেন। ফেলে দেবে কেন, গরম জল খাবে যে বললে?

তুমি উপন্যাস পড়ো!... দাশুর ওপরেই মেজাজ ফলিয়েছে, এই–ওটা রেখে টেপ এসে। গা হাত-পা গেল, কোথাকার কে একটা থার্ডক্লাস লোক, সে বলল আর একগলা জলে নেমে গাড়ি ঠেলো!

যার কথায় একগলা জলে নেমে গাড়ি ঠেলা তাকেও খুব রেহাই দেননি তার গৃহিণীটি। নিরুপায় মুখে ডক্টর বাসু বসে বসে চুরুট টেনেছেন আর স্ত্রীর তর্জন এনেছেন। এর ওপর ননিমাধবেরও জ্বর হয়েছে শুনে নতুন করে আর এক দফা শোনাতে বসলেন তিনি। তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে, বুঝলে? তিনদিন ধরে বিছানায় পড়ে

কাতরাচ্ছে ছেলেটা, ওদিকে ননিমাধবও জ্বরে পড়েছে–কে না কে বলল আর অমনি হুট করে ছেলে দুটোকে তুমি জলে নামিয়ে দিলে! ওরা কি করেছে এসব কোনদিন?

ডক্টর বাসুও শেষে বিরক্ত হয়েই পাল্টা জবাব দিয়েছেন, জ্বর হয়েছে সেরে যাবে। আমি ভাবছি আমাদের জন্য ওই পরের ছেলেটির আবার অসুখ-বিসুখ করল কিনা। কি ঠিকানাটা বলেছিল, ড্রাইভারকে একবার পাঠিয়ে দাও না খবর নিয়ে আসুক।

জবাবে মিসেস বাসু একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রস্থান করেছেন।

ডক্টর বাসু জানতেন না, ড্রাইভারকে পাঠিয়ে নয়, সকলের অগোচরে ড্রাই ভারকে নিয়ে একজন খবর করতেই গেছে। একজন নয়, দুজন। বরুণাও গেছে। শুধু তাই নয়, বরুণাই ইন্ধন যুগিয়ে নিয়ে গেছে তার দিদিকে। সব শুনে আসল ফুতিটা তারই হয়েছিল। এমন কাণ্ডটা নিজের চোখে দেখা হল না বলে আপসোসেরও শেষ নেই। এর আগে বাস-স্টপ থেকে দিদির সেই লোকটাকে গাড়িতে তলে নেওয়ার সমাচার শুনেও বোধ হয় এত আনন্দ আর নিজের অনুপস্থিতির দরুন এত দুঃখ হয়নি। আগের সেই খবর শুনে সেও লোকটার জন্য উৎসুকভাবে দিনকতক প্রতীক্ষা করেছিল। আসেনি দেখে দিদিকে জ্বালাতেও ছাড়েনি। বলেছে, এমন রসকষশূন্য লোকের বাসে পাশে বসা কেন? আর তুই বা কোন্ মুখে তাকে সেধে গাড়িতে এনে তুললি আর বাড়ি আসার জন্যে সাধলি? বেশ হয়েছে, খুব জব্দ।

কিন্তু এবারে আর ঔৎসুক্য চাপতে পারেনি। বার বার পরামর্শ দিয়েছে, নিশ্চয় বিছানায় পড়েছে, চল না একবারটি দেখে আসি, কাছেই তো–

অর্চনা ভ্রূকুটি করেছে, বিছানায় পড়ে থাকলে কি করবি, সেবা করবি?

সেবা করতে হবে না, তোক দেখলেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠবে। চল না, খেয়ে ফেলবে না!

বাড়ি কাছে হলেও একেবারে কাছে না। তবে মোটরে সামান্য সময়ই লাগল। লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে বরুণাই আবার নিরুদ্যম একটু। একটা বিষয় মনে ছিল না, এখন মনে পড়েছে। তাই চুপ করেও থাকতে পারেনি। ভদ্রলোক আবার প্রফেসর যে রে...আমি আই. এ. পড়ি জানে?

বেরিয়ে পড়ে অর্চনার সঙ্কোচ গেছে। জবাব দিল, খুব জানে, মোটরে বসে সেদিন সারাক্ষণ তোর কথাই তো জিজ্ঞাসা করছিল–তোদের কলেজেই আবার মাস্টারির চেষ্টা করছে এখন।

রাস্তার ওপর ছোট বাড়িটা খুঁজতে হল না। দরজার গায়ে লেটার বক্স-এ নাম আর নম্বর লেখা। অর্চনার নির্দেশে ড্রাইভার নেমে গিয়ে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যে বাইরে এল, সে স্বয়ং সুখেন্দু মিত্রই। খুব সম্ভব বেরুচ্ছিল।

গাড়িতে আরোহিণী দুজনকে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

অর্চনা নেমে দাঁড়াল। লোকটা সুস্থ শরীরে নিজেই হাজির দেখে তারও বিসদৃশ লাগছে একটু।

আপনি...

অর্চনা হাসিমুখে বলল, দেখতে এলাম, বাড়িতে তো তিনদিন ধরে হ্যাঁচ্চো ম্যাচ্চো চলছে–আপনি কেমন আছেন?

কেন!...প্রথমে হঠাৎ বুঝে ওঠেনি। তার পরেই মনে পড়তে হেসে উঠল।... ও, সেদিনের সেই জলে ওঁদের শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?

রীতিমত। আপনি ভাল আছেন তো একবারও গেলেন না কেন? বাবা ওদিকে ভেবে অস্থির, ভাবছেন, আপনারও ভাল রকম কিছু হয়েছে

সুখেন্দু হাসতে লাগল। –না, আমি ভাল আছি। ভিতরে ডেকে বসতে বলবে কি না ভাবছে। এ-রকম অতিথি আপ্যায়নের বৈচিত্র্যে পড়তে হয়নি। কখনো। পিসিমার পর্যন্ত গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার নাম নেই। আর সে যাচ্ছিল চা ফুরিয়েছে চা কিনতে–অতএব একটু চা-ও দেওয়া যাবে না। কিংবা এদের বসিয়ে আবার চা আনতে যেতে হবে। কিন্তু না-ডাকাটা নিতান্ত অভদ্রতা। বরুণ এবং অর্চনা দুজনের উদ্দেশে বলল, ভিতরে এসে বসুন, পিসিমা অবশ্য বাড়ি নেই, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

বোঝা গেল বাড়ির কর্ত্রী পিসিমা এবং তিনি ছাড়া ওদের সঙ্গে কইতে পারে এমন আর কেউ নেই। পিসিমা থাকুন আর নাই থাকুন অর্চনা সরাসরি বাড়ি গিয়ে ঢুকতে রাজী নয়। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, না আমরা এমনি একবার দেখতে এলাম, বাড়িতে হয়তো এতক্ষণ খুঁজছে আমাদের। থামল একটু, আপনি বেরুচ্ছেন কোথাও? ফাঁক পেয়ে হাসিমুখে সত্যি কথাটাই বলে দিল সুখেন্দু মিত্র, আমার চা শেষ, চা আনতে যাচ্ছিলাম।

তাহলে আপনিই চলুন না আমাদের বাড়ি, বাবা খুব খুশী হবেন–

আপত্তি নেই সেটা মুখ দেখেই বোঝা গেল। ভিতরের কারো উদ্দেশে দরজা বন্ধ করতে বলে গাড়ির সামনের আসনে বসতে গেল সে।

অর্চনা বাধা দিল, আপনি পিছনে বসুন, আমি সামনে বসছি—

ঠিক আছে। দরজা খুলে সুখেন্দু ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল।

গাড়ি বাড়ির পথ ধরতে হাসি চেপে অর্চনা বরুণার দিকে তাকাল। বরুণ যতটা সম্ভব নির্বিকার মুখে রাস্তা দেখছে। আর দিদিটা যে ওর থেকেও অনেক বেশি মানুষ হয়ে গেছে, গম্ভীর পুলকে মনে মনে তাই ভাবছে। সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, একে চেনেন?

সুখেন্দু মিত্র ঘুরে বসল একটু। তার পর বরুণাকে দেখে নিয়ে বলল, আপনার বোন?

হ্যাঁ, বরুণা। আপনি কলেজের প্রফেসর আর ও মোটে আই. এ. পড়ে, বড় লজ্জায় পড়ে গেছে।

সুখেন্দু হেসে উঠল। সে সামনের দিকে চোখ ফেরাতেই বরুণার রামচিমটি। অর্চনা একটা কাতরোক্তি করে ছদ্ম কোপে জোরেই ধমকে উঠল তাকে, এই। লাগে না?

৪. ঘরের ইজিচেয়ারে ননিমাধব

নিচের ঘরের ইজিচেয়ারে ননিমাধব চিৎপাত হয়ে প্রায় শুয়েই আছে আর ভাবছে। ভাবছে, ছুটির দিনের দুপুরগুলি এমন নীরস কাটত না। এই বাড়ির তলায় তলায় বেশ একটা পরিবর্তনের ধারা বইছে। সেটা ঠিক প্রত্যক্ষগম্য না হলেও অনুভব করা যায়। ননিমাধব অনুভব করছে।

আজও আপাতদৃষ্টিতে বিজনের জন্যেই অপেক্ষা করছে সে। আর তার আজকের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ জোরও ছিল একটু। পকেটে বাবার দেওয়া আঠারো হাজার টাকার চেকটা করকর করছে। দু-মাস আগেকার সেই প্ল্যানের রসদ বার করতে এতটা সময় লেগে গেল। তাও বাবা তিরিশ হাজার দেননি, বলেছেন, কাজ এগোক আস্তে আস্তে দেবেন। বিজনের ধারণা, পার্টনার যতটা তৎপর হলে সব সমস্যা সহজে মিটে যেতে পারে, ততটা তৎপর সে নয়। ধারণাটা খুব মিথ্যেও নয়। তাদের বিজনেস এক্সটেনশানের প্ল্যানের এই টাকাটাও বার করে আনতে আরো কতদিন লাগত বলা যায় না। আর আনা যে গেছে সেটা শুধু বিজনের অসহিষ্ণুতার ভয়েই নয়। পায়ের নিচে আজকাল নিরাপদ মাটির অভাব বোধ করছিল ননিমাধব। অলক্ষ্য থেকে আর কেউ যেন সেই মাটিতে পা ফেলে চলেছে। ননিমাধবের উদ্যম আর বাবার সঙ্গে ফয়সালা করে টাকা নিয়ে আসার আগ্রহের পিছনে বড় কারণ সম্ভবত এটাই। বিজুদাকে একটু শান্ত না করতে পারলে আর কোন সমস্যা তার মাথায় ঢোকানো যাবে না। আভাসে ইঙ্গিতে একটু আধটু চেষ্টা করেছিল, বিজন কি বুঝেছে সে-ই জানে, ওর সমস্যার ধার-কাছ দিয়েও

যায়নি। উল্টে বলেছে, দেখ, এই ব্যবসা দাঁড় করানো ছাড়া এখন আর কিছু ভেবো না-মা তো এখনো ভাবে তোমাতে আমাতে ছেলেমানুষিই করছি একটা।

ফলে ভবিষ্যৎ রচনার এই নব-উন্মাদনা ননিমাধবের। বিজনকে কথা দিয়েছে, আজ সে চেক নিয়ে আসছে। অবশ্য বাকি টাকাটা কিছুদিন বাদে সংগ্রহ হবে তাও জানিয়েছে। হাতে যা এসেছে তাও কম নয়, বিজন খুশী। টাকা ননিমাধব চেষ্টা করলে সংগ্রহ করতে পারে সেটা তার জানাই আছে। তার ফুরসৎ নেই একটুও, ঘোরাঘুরি করে সব বিধিব্যবস্থা তাকেই করতে হয়।

বাবার কাছ থেকে চেক পেয়েই ননিমাধব সোজা এ-বাড়ি চলে এসেছে। ছুটির দিন, ফ্যাক্টরি বন্ধ। বিজন বাড়ি নেই জেনেও দুঃখিত হয়নি, কিন্তু বাড়িতে যেন আর কেউ নেই। একা বসে বসে বিরক্তি ধরে গেছে। দাশু অবশ্য রাণু বউদিকে খবর দিতে যাচ্ছিল, ননিমাধবই বাধা দিয়েছে, উনি পড়ছেন পড়ুন ডাকাডাকি করে বিরক্ত করা কেন!

কিন্তু ছোট দিদিমণিও নাকি পড়ছে আর বড় দিদিমণি বাবুর ঘরে আটকে আছে। ননিমাধব দাশুকে পাঠিয়েছে এক পাকেট সিগারেট আনতে। সে এলে একবার খবর দিতে বলা যেত। কিন্তু দাশু সিগারেট আনতে গেছে তো গেছেই, দুটো গোটা সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল ননিমাধবের, নবাবের এখনো দেখা নেই।

বাইরে থেকে গুনগুন একটা গানের শব্দ কানে আসতে ননিমাধব সোজা হয়ে বসল। লঘু চরণে যে আসছে সে বরুণা। মেয়েটা যত ফাজিলই হোক, ওর মন বোঝে।

কিন্তু বরুণার তখন মন বোঝার আগ্রহ একটুও ছিল না। অন্য আগ্রহ নিয়েই সে নীচে এসেছিল একবার। তিনটে নাগাদ যার আসার কথা সে ননিমাধব নয় আর একজন! তিনটে বেজে গেছে, বরুণা নিচের ঘরটা একবার দেখে যেতে এসেছিল। তার বদলে সেখানে ননিমাধবকে দেখে দরজার ওপরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর দু হতাশার সুরে বলল, ও আপনি...

ননিমাধব হাসিমুখেই রসিকতা করল, আর কেউ ভেবেছিলে বুঝি?

বরুণা ঘরের মধ্যে দু-পা এগিয়ে এলো। বড় করে নিশ্বাস ফেলল।–হ্যাঁ।

কিন্তু রসিকতার ঠিক মুড নয় ননিমাধবের। কারণ সব ছুটির দিনে আর একজনের আবির্ভাবই তার অনেক আনন্দ পণ্ড করেছে। বলল, ও, ইয়ে–আর কারো আসার কথা আছে বুঝি?

হ্যাঁ।

অগত্যা ননিমাধব হাসতেই চেষ্টা করল।–আমি বিজুদার জন্যে বসে আছি–

বসে থাকুন, এসে যাবে–

বরুণা সরে পড়ার উদ্যোগ করতেই ননিমাধব বাধা দিল, তুমি বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন।

ও বাবা, দাদা এসে দেখলেই–

বরুণা ছলনায় সেয়ানা। মুখের ত্রাসে মনে হল দাদা এসে ওকে সরাসরি খুনই করবে। আশঙ্কাটা শেষ না করেই বলল, আপনি বরং বসে বেশ করে ব্যবসার কথা ভাবুন।

তাড়াতাড়ি প্রস্থান করতে গিয়েও থামল একটু। হাত বাড়িয়ে পাখার। রেগুলেটারটা আরো খানিকটা ঘুরিয়ে তরতরিয়ে চলে গেল।

ঈজিচেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যেই বার দুই চক্কর খেল ননিমাধব। টেবিলের ওপর থেকে শূন্য সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল। হাঁ-করা খালি সেটা। দ্বিগুণ বিরক্তি। ফিরে দেখে দাশু সিগারেট নিয়ে ঘরে এসেছে। তার হাত থেকে সিগারেট আর ফিরতি পয়সা নিয়ে যতটা সম্ভব মেলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি?

দাশু কৈফিয়ত দিল, দুপুরে কাছের দোকান বন্ধ।

ননিমাধব ঈজিচেয়ারে বসল আবার। পয়সা পকেটে রাখতে গিয়ে কি ভেবে মুখ তুলল। দাঁত ফিরে যাচ্ছিল, ডেকে থামাল। পয়সাগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিল–এ ফেরত দিলে কেন, তুমি রাখো-না, রাখো–

দাশুর নিস্পৃহ পর্যবেক্ষণ।– রাখব?

হ্যাঁ, ধরো–।

দাশু পয়সা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজল এবং আরো কিছু জবাব দিতে হবে বুঝেই প্রস্তত হয়ে দাঁড়াল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ননিমাধব অন্তরঙ্গ সুরে বলল, আচ্ছ। এ বাড়িতে তো তুমি বহুকাল আছ, না?

সম্ভব হলে দাশুকে একটা সিগারেটও দিত সে, মনিবের চুরুটের বাক্স থেকে তার চুরুট সরানোর অপবাদ ননিমাধব একাধিকবার শুনেছে। কিন্তু অতটা পেরে উঠল না।

দাশু জবাব দিল, হ্যাঁ–বড় দিদিমণির জন্ম থেকেই বলতে পারেন।

তুমি তো তা হলে একেবারে ঘরের লোক হে!...যেন ঘরের লোক বলে তারও বিশেষ আনন্দের কারণ কিছু আছে। একটু থেমে বক্তব্যের দিকে এগোতে চেষ্টা করল আবার।- আচ্ছা দাশু, এই তোমার গিয়ে মাস দুই হল তোমার দিদিমণির দেখাই নেই প্রায়...লেখাপড়া-টড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত বুঝি?

দাশু নিষ্প্রাণগোছের জবাব দিল, হ্যাঁ...ওই নতুন মাস্টারবাবুর সঙ্গে।

মাস্টারবাবু! ও সেই প্রফেসার?...নিজের অগোচরে গুণ্ডা কথাটাই বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে।

দাশু গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল।

ননিমাধব উঠে গিয়ে সিকি-খাওয়া সিগারেটটাই জানলা দিয়ে ফেলে এলো। ও প্রস্থানোত।

দাশু—

ঘুরে দাঁড়াল।

ইয়ে—তোমার দিদিমণি এখন কি করছেন বলো তো?

ছোড়দিদিমণি?

পারলে ওরই মুণ্ডপাত করে।–না, বড় দিদিমণি।

হাত দিয়ে দোতলায় কোণের ঘর ইঙ্গিত করে দাশু শুদ্ধ ভাষায় জবাব দিল, কর্তাবাবুর বাক্য শুনছেন।

ননিমাধব বিরক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু দাশু খুব মিথ্যে বলেনি।

বাবার ঘরে বসে অর্চনা বাক্যই শুনছিল আর বাবার অগোচরে মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল।

বিছানায় একসঙ্গে তিনটে বালিশে মাথা রেখে আধ-শোয় ভাবে অনর্গল কথায় নিজেকেই যেন স্পষ্ট করে দেখছেন ডক্টর বাসু। আর সামনের মোড়ায় বসে অর্চনাকে শুনতে হচ্ছে সেই আত্মদর্শন তত্ত্ব। অনেক সময়েই শুনতে হয়, ফাঁক খুঁজে না পালানো পর্যন্ত রেহাই নেই। কিন্তু ফাঁক আর পেয়ে উঠছে না বাবার বলার ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়ছে।

ডক্টর বাসু বইখানা বুকের ওপর রেখে ব্যাখ্যায় তন্ময়। তাঁর বক্তব্য, যে-ভাবেই থাকুক আর যে-কাজই করুক মানুষ, ভিতরে ভিতরে সে খুজছে কাউকে। নিজের অজ্ঞাতে তার খোঁজার বিরাম নেই। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন, কিন্তু কাকে খুঁজছে?

অর্চনার দৃষ্টি তখন দরজার দিকে। মনে মনে সেও এক খোঁজেই অন্যমনস্ক। কথাটা কানে যেতে অপ্রতিভ মুখে ঘুরে বসল।–হ্যাঁ বাবা, খুজছে...

তাই তো বললাম, কিন্তু কাকে? একটা যেন ধাঁধার পরদা সরাচ্ছেন তিনি, এমনি আগ্রহ।...কার জন্য তার এই আকূতি?

ভ-ভগবানের জন্য? অর্চনার নিরুপায় মনোযোগ।

মেনেই নিলেন যেন। বললেন, বেশ কথা, ধরা যাক ভগবানকেই খুঁজছে। কিন্তু ভগবান কোথায় থাকে?

বিষয়ের গভীরতায় ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বাসু। ভগবানের কোথায় থাকা সম্ভব সেই উপলব্ধি আগে স্পষ্ট হলে পরের আলোচনা। তাঁর বিশ্লেষণ, মানুষ তো সেই কোন কাল থেকে আছে–প্রথমে ছিল অনার্য, তারা মারামারি করত কাটাকাটি করত, হিংসা ছাড়া আর কিছুই জানত না কিন্তু তাদেরও ভগবান ছিল, তাদের সেই ভগবানের মূতি আরো হিংস্র আরো বীভৎস। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হতে লাগল, দেখা গেল তাদের ভগবানও আরো সভ্য হচ্ছে আরো সুন্দর হচ্ছে। তাহলে কি বলতে হবে ভগবানও মানুষের মতই আগে অনার্য ছিল শেষে আর্য হল? হেসে উঠলেন তিনি–তা নয়... আসলে

আমরা যেমন দেখি। ভগবান বলতে আমরা যাকে ভাবি সে তো তাহলে মানুষেরই প্রতিবিম্বিত মহিমা।

ব্যাখ্যার প্রসন্ন আনন্দে আধ-শোয় অবস্থাতেই একটা চুরুট ধরালেন। অর্চনার ঝিমুনি আসছিল, চুরুটের কড়া গন্ধে চোখ টান করে তাকাল। একমুখ ধোয়া ছেড়ে ডক্টর বাসু চোখ বুজে বিশ্লেষণটুকুই ভাবতে লাগলেন।

দাশু অর্চনার এই বাক্য শোনার কথাই বলেছিল ননিমাধবকে।

বিজন ফিরেছে। আঠারো হাজার টাকার উষ্ণতায় তার উৎসাহ অনেকটাই পুনরুজ্জীবিত। কিন্তু পাছে পার্টনার ঢিলে দেয় সেই আশঙ্কায় টাকা যে কত ব্যাপারে কত কারণে দরকার সেটাই নানাভাবে বেশ করে বোঝাচ্ছে তাকে। ননিমাধব শুনছে। ম্রিয়মাণ। একটু আগে ওই বাইরের বারান্দা দিয়ে হাসি খুশি মুখে বরুণা যে লোকটাকে একেবারে ওপরে নিয়ে গেল–ম্রিয়মাণ তাকে দেখেই।

দেখেছে বিজনও। কিন্তু নিজের আগ্রহে আর উৎসাহে অত খেয়াল করেনি। দেখেছে এই পর্যন্ত। ফ্যাক্টরির ভবিষ্যৎ-চিত্রের সব সমস্যার ফিরিস্তি শেষ করে বলল, এখনই তিরিশ হাজার পেলে ভাল হত হে।

ননিমাধব অন্যমনস্কর মত জবাব দিল, বাকিটাও শিগগিরই পাওয়া যাবে–

ভেরি গুড! চেকটা তুমি বিজনেস একাউন্টে জমা করে দাও, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।

কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল ভাবনা তার একটুও নিরসন হয়নি। আর ভাবনা কিসের তাও যেন বোধগম্য হল এতক্ষণে। বরুণার সঙ্গে একটু আগে যে লোকটা ওপরে উঠে গেছে তার ওপরেই মনে মনে বিরূপ হল একটু। কিছুদিন আগে ননিমাধবের সেই আভাসও মনে পড়ছে। এমন এক সময়ে ওই মেয়ে দুটোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা চক্ষুশূল। ব্যবসায় নেমে কোন আলোচনাতেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। ঝোঁকের মাথায় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিনা ভণিতায় পার্টনারকে কিছুটা আশ্বাসই দিয়ে ফেলল সে। গলা খাটো করে বলল, দেখ, একটা কথা শুনে রাখো-ওসব মাস্টার-টাস্টার মা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, বুঝলে?

কিন্তু বুঝেও খুব যেন স্বস্তি বোধ করল না ননিমাধব। তবে প্রসঙ্গটা সুবাঞ্ছিত বটে। শুকনো মুখে একটু হাসল, আমতা আমতা করে বলল, আমি বলছিলাম কি বিজুদা, কথাটা একবার মাসিমার কাছে পেড়ে রাখলে হত না? মা–মা বলছিলেন আর কি...।

তাকে আশ্বাসটা একেবারে মিথ্যে দেয়নি বিজন, অবস্থা ফেরাতে পারলে মায়ের মত পাওয়াই যাবে এটা তার বিশ্বাসই। আর অবিশ্বাসই বা হবে কেন, ননিমাধব ছেলে তো খারাপ নয়। তাছাড়া মেয়ে দুটোর ইয়ারকি ফাজলামো দেখেও মনে হয়েছে কোনদিকে আটকাবে না! তবু নিজেদের জোরে দাঁড়ানোর জোরটাই আগে অভিপ্রেত মনে হয়েছে বিজনের। জবাব দিল, কথা তো পাড়লেই হয়, কিন্তু ব্যবসাটা জাঁকিয়ে দাঁড়াক একটু। মুশকিল কি জানো, তোমাকে তো সেদিন বললাম–আমরা যে কিছু একটা করছি তা এরা বিশ্বাসই করে না। আর করবেই বা কি দেখে, লাভ তো সবই প্রায় ব্যবসাতেই খেয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনো তো আমাদের কোম্পানির একটা গাড়ি পর্যন্ত হল না।

ননিমাধব তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব দিল, গাড়ি কিনে ফেল।

বিজন অবাক। গাড়ি কিনে ফেলব। এই টাকা থেকে?

না তা কেন, টাকা তো আমি দু-চার দিনের মধ্যেই আনছি–তুমি একটা গাড়ি দেখ।

পার্টনারের এতবড় সহযোগিতায় বিজন যথার্থই বিচলিত এবারে। ওর জন্যে যা বলার মাকে সে বলবে; শুধু বলবে না, রাজীও করাবে। ভারি তো–। একটু চিন্তা করে সম্মতি জ্ঞাপন করল, আচ্ছা...। আর মায়ের সঙ্গেও আমি কথা বলব'খন।

কলেজের মাস্টারের প্রতি মায়ের বিতৃষ্ণা সম্বন্ধে বিজন যথার্থই নিঃসংশয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগে কথা যে আর একপ্রস্থ সেই দিনই ওপরেও হয়ে গেল, সেটা জানলে বোধ করি তারও অস্বস্তির কারণ হত।

সেই কথা বলেছেন ডক্টর বাসু নিজে।

তিনি নিজে থেকে বলেননি, বা বলার কথা হয়তো চট করে তার মনেও হত না। সেই বাস্তা করে দিয়েছেন মিসেস বাসু। স্ত্রীর অসহিষ্ণুতা একদিনের দুদিনের নয়। বড় মেয়েটি তার কোন কথার মুখোমুখি অবাধ্য না হলেও তাকে যে সব সময় ইচ্ছেমত আগলে রাখা সহজ নয় মনে মনে এটুকু তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতেন। বাড়িতে যে-একজনের আদৌ শাসন নেই, তার কথাই বরং মেয়েটা শোনে অনেক বেশি। অথচ সেই-একজনেরই প্রশ্রয়ে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে কোথাকার কে একটা

প্রাইভেট কলেজের মাস্টার, এটা মায়ের পক্ষে বরদাস্ত করাও খুব সহজ নয়। মেয়েটা না হয় নিজের ভাল মন্দ বোঝে না, কিন্তু এই একটা মানুষেরও একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই। এ নিয়ে অনেকদিনই স্বামীকে দু-পাঁচ কথা বলেছেন, কিন্তু যত জ্বালা তারই, মাথায় কিছু ঢোকে কি না সন্দেহ।

তার ওপর সেদিন শূন্য-মোড়ার উদ্দেশে স্বামীকে বক্তৃতা করতে শুনে মেজাজ যথাথই বিগড়ালো। মেয়েটা উঠে পালিয়েছে সে-খেয়াল পর্যন্ত নেই। চোখের ওপর হাত রেখে তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন বিড়বিড় করে। একটা হেস্তনেস্ত করার। জন্যেই যেন মিসেস বাসু মোড়ার ওপর এসে বসলেন। লোকে এর পর পাগল ভাববে না তো কি?

এক ঘায়েই তত্ত্বের সব জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। চোখ থেকে হাত নামিয়ে ডক্টর বায় মোড়ার ওপর কন্যার বদলে স্ত্রীকে দেখে অপ্রস্তুত।–অর্চনা গেল কোথায়...

মিসেস বাসু ঝাঁজিয়ে উঠলেন, কোথাও যায়নি, নিজের ঘরে বসেই তোমার সেই আদরের মাস্টারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে–এখন বোকে মেয়ের মতিগতি।

মেয়ের মতিগতি বোঝার বদলে মানুষটা যেন পিত্তি জ্বালিয়ে দিলেন। হৃষ্টকণ্ঠে বললেন, ও, সুখেন্দু এসেছে বুঝি...ওদের এখানে আসতে বলো না?

মিসেস বাসু গম্ভীর মুখে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে রাগ সামলাতে চেষ্টা করলেন প্রথম খুব আনন্দ, কেমন? চোখ দুটো আছে, না নোট লিখে লিখে তাও গেছে?

ভদ্রলোক এবারে বুঝলেন সমাচার কুশল নয়। তবু হালকা জবাব দিলেন, নোট তো তোমার তাগিদেই লিখি। কি হয়েছে?

এইটুকুরই অপেক্ষা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, কি হয়েছে আর কি হচ্ছে সবই আমি বলব–তোমার চোখ নেই? দু-মাস ধরে দেখছি মেয়ে যখন-তখন হুট হুট করে বেরিয়ে যায়–য়ুনিভার্সিটি থেকে আসতেও এক-একদিন সন্ধ্যে কোথায় যায় কি করে ভেবে দেখেছ? আজকাল শুধু বাইরে নয়, বাড়িতেও ঘন ঘন ডেকে আনা হচ্ছে আর তাই শুনে উনি আনন্দে আটখানা একেবারে! শুধু তোমার জন্যেই মেয়ের এত সাহস, শুধু তোমার জন্যে!

একদমে এতখানি উদগিরণের পর তিনি হাপাতে লাগলেন।

আর ডক্টর বাসু আচমকা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যথার্থই বুড়বু খেলেন খানিকক্ষণ। এই ভাবনার কথাটা ভাবা হয়নি বটে। ভাবতে ভাবতে উঠে বসে চুরুট পরানোর উদ্যোগ করলেন তিনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুরুট আর ধরানো হল না। তার আগেই সমাধান একটা খুঁজে পেলেন। দুই চোখে আবিষ্কারের আনন্দ। চুরুট ভুলে স্ত্রীর দিকে আর একটু ঝুঁকেই বলেন তিনি।–এ তো বেশ ভাল কথা। আমার মনেই হয়নি কথাটা-সুখেন্দু খাসা ছেলে, চমৎকার ছেলে, ওদের যদি বিয়ে হয়... আমি বলব সুখেন্দুকে?

মিসেস বাসু যেন পাগলের প্রস্তাব শুনলেন। প্রথমে হতভম্ব তার পর ক্রুদ্ধ।–মাথা খারাপ নাকি! অ্যাঁ? ওই চারশ টাকা মাইনের কলেজের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে। তার ওপর কালচার বলতে ‘ক’ নেই, ওই রকম গোঁয়ারে হাবভাব

এই সরস প্রস্তাবটা এভাবে নাকচ হতে দেখে ডক্টর বাসু বিরক্ত হয়ে মাঝখানেই বাধা দিলেন। তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, ছেলেটা খারাপ কিসে হল। চার শ টাকা মাইনে কম নাকি! ক'টা ছেলে পায়? অমন উপযুক্ত বিদ্বান ছেলে–পরে আরো হবে।

আমার মাথা হবে আর মুণ্ডু হবে। আর পেরে ওঠেন না মিসেস বাসু।– তার চেয়ে মেয়েটার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে এসো।

আর তুমি তোমার কালচার ধুয়ে জল খাও বসে বসে।...রাগের মাথায় ডক্টর বাসু হাতের চুরুট বিছানায় রেখে বিছানা থেকে দেশলাই তুলে জ্বালতে গেলেন। তার পর মুখে চুরুট নেই খেয়াল হতে দেশলাই ফেলে চুরুট তুলে মুখে দিলেন। শেষে দেশলাইয়ের অভাবে চুরুট হাতে নিলেন।-এই তো, তোমার বোন মস্ত বড়লোক দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ভগ্নীপতির ওদিকে দেনার দায়ে চুল বিক্রি–আমারও সেইরকম অবস্থা হোক, কেমন? কোথা থেকে আনব, কোথা থেকে দেব—

মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। শুধু তাই নয়, এতবড় খোঁচাটা দিয়ে ফেলে তার ফলাফল থেকেও অব্যাহতি পেলেন। সহাস্যে ঘরে আসছে বরুণা, অর্চনা–তাদের সঙ্গে সুখেন্দু। ঢুকে পড়ে সুখেন্দু না বুঝলেও মেয়ে দুটো ঘরের তাপ উপলব্ধি করে একটু থমকেছে।

ডক্টর বাসু সামলে নিয়ে ডাকলেন, এসো সুখেন্দু এসো

স্ত্রীর দিকে চেয়ে অতঃপর কিছু একটা আলোচনারই উপসংহার টানলেন যেন।– ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার বইকি, তুমি যা বলেছ তাও ঠিক, এক কথার ব্যাপার তো নয়।

বলা নেই কওয়া নেই এইভাবে বাইরের লোক নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকার দরুন মিসেস বাসু মেয়ে-দুটোর ওপরেই মনে মনে জ্বললেন একপ্রস্থ। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কষ্টকৃত আপসের সুরে স্বামীর উপসংহারের ওপর মন্তব্য করলেন, তোমার কথাও মিথ্যে নয়, আমার যা মনে হল তাই বললাম, নইলে এসব ব্যাপার তোমরাই ভাল বোঝে–

বাইরের লোকের সামনে অর্চনা-বরুণা বাবা মায়ের এ ধরনের পরোক্ষ অতি-বিনিময় শুনে অভ্যস্ত। তারা যে-যার অন্যদিকে চোখ ফেরাল। ডক্টর বাসু একটু সরে বসে আপ্যায়ন জানালেন, সুখেন্দু দাঁড়িয়ে কেন, বসো–আজ কলেজ নেই? ও আজ ছুটি বুঝি, আমার সবদিনই ছুটি তো, মনেই থাকে না। এতক্ষণের বাক্‌বিতণ্ডার কারণ ভুলে হেসে উঠলেন তিনি।

মায়ের চোখে চোখ পড়তেই অর্চনার সঙ্কট। তার মুখের ওপর এক ঝলক উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি কাজের অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অর্চনা আর বরুণা এবারে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করল। বাবা প্রসন্নমুখে চুরুট ধরাবার উদ্যোগ করছেন।

কটা দিনের মধ্যে ননিমাধবের উদ্যমের বেপরোয়া পরিবর্তন দেখে বিজন পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। স্ত্রী দিনরাত নভেলে ডুবে থাকলেও, বাড়িতে যখন থাকে, অন্দরমহলের সমাচার কিছু কিছু কানে আসেই। তার কাছ থেকে যেটুকু খবর পায় তাতেই অনুগত পার্টনারটির জন্য মনে মনে একটু চিন্তিত। অতটা হত না, যদি না ব্যবসায়ে ননিমাধবকে হঠাৎ অমন উৎসাহের বন্যায় ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখত। এত উৎসাহ আর উদ্যমের উৎস কোথায় সেটা সে ভালই জানে। আর সেখানে কোন প্রতিকূল ছায়া পড়লে সবেতেই যে শুকনো টান ধরে যাবে তাও সহজেই অনুমান করতে পারে।

গত এক মাসের মধ্যে ননিমাধব অসাধ্যসাধনই করেছে প্রায়। তার সমস্ত আশা কেন্দ্রীভূত একখানা মোটর গাড়ি কেনা আর ব্যবসায়ে টাকা ঢালার মধ্যে। নিজের মাকে ধরে বাবার সঙ্গে পাপষ্টি একটা ফয়সালা করে নিয়েছে সে। বাপের টাকা যত, ছেলের প্রতি আস্থা তত নয়। তবে বিশ্বাস কিছু বিজনের ওপরে আছে, তার হাতে টাকাটা একেবারে নষ্ট হবে না। কিন্তু আপাতত নির্দিষ্ট অঙ্কের বাইরেও তাকে চেক কাটতে হয়েছে ছেলের মতিগতির ব্যতিক্রম দেখেই।

গাড়ি হয়তো এতে শিগগির সত্যিই কেনার ইচ্ছে ছিল না বিজনের। কিন্তু গাড়ির খাতে পটনার আলাদা টাকা বার করে এনেছে, গাড়ি না কিনেই বা কর কি! না কেনা পর্যন্ত ননিমাধবের তাগিদেরও বিরাম ছিল না।

অতএব ফ্যাক্টরি বাড়ানোর জন্য আশাপ্রদ মূলধনই শুধু জোটেনি, নতুন গাড়িও একটা হয়েছে।

গাড়ি কেনার পর ননিমাধবের সর্বাগ্রগণ্য ডিউটি মাসিমা অর্থাৎ অর্চনার মাকে সেই গাড়িতে চড়ানো। তাতেও কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, কারণ ছেলেদের যে ব্যবসাটা মহিলা অবহেলার চোখে দেখে এসেছেন এতদিন, গাড়ি কেনার পরেই আর সেটা হেলাফেলার বলে মনে হয়নি। অতএব খুব খুশী হয়েই গাড়িতে চড়েছেন তিনি, আর চড়ার পরে ননিমাধবকেও একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রসন্ন মুখে গাড়ির প্রশংসা করেছেন, চমৎকার গাড়ি হয়েছে, এতটা পথ ঘুরে এলাম একটুও ঝাঁকুনি নেই

ননিমাধব বিগলিত। সাফল্যটা নাগালের কাছাকাছি এসে গেছে যেন। বলেছে, আর কটা দিন অপেক্ষা করুন না মাসিমা, আমি নিজেই ড্রাইভিংটা শিখে নিচ্ছি-ও ব্যাটার থেকে অনেক ভাল চালাব।

অর্থাৎ ড্রাইভারের থেকেও সে অনেক ভাল চালাবে।

এর পর মায়ের কাছে আর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিলম্ব করাটা একটুও সমীচীন বোধ করেনি বিজন। অবশ্য দুপুরে খেতে বসে সেই উত্থাপনের সুযোগ মা-ই দিয়েছেন। অর্চনা-বরুণ। কলেজে, কাজেই আলোচনায় ব্যাঘাতও ঘটেনি। সকালে নতুন গাড়ি চড়ে আসার আনন্দটা মায়ের মনে লেগেছিল। তিনি বলেছেন, হা রে, এরই মধ্যে তোদের গাড়ি হয়ে গেল, ব্যবসা বেশ ভাল চলছে বল?

বিজন জবাব দিয়েছে, সবে তো শুরু, আর একটা বছর সবুর কর না, দেখ কি হয়–

আলোচনার সাক্ষী শুধু দাশু। অদূরে বসে কি একটা নাড়াচাড়া করছিল। দাদাবাবুর পরের কথাগুলো কানে যেতে গম্ভীর কৌতুকে মুখখানা তার আরো গম্ভীর। ওই এক প্রসঙ্গ থেকেই বিজন পার্টনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।-ননিমাধবকে তো আর জান না, ওই রকম থাকে বলে। ওর মত ছেলে ক'টা হয়, ব্যবসায়ও তেমনি মাথা—

যেন সমস্ত ব্যবসাটা ওর মাথার জোরেই চলেছে। পাছে নজরে পড়ে যায় সেই ভয়ে দাশু একেবারে ঘুরে বসে নিঃশব্দ মুখভঙ্গি করেছে একটা। মা ওদিকে ছেলের প্রশংসাটা মেনেই নিয়েছেন, কারণ এরই মধ্যে একখানা গাড়ি করে ফেলা তো কম কথা নয়।

বিজন জানিয়েছে, একখানা কেন, আরো হবে। তার পরেই একেবারে আসল বক্তব্যে এসে পৌঁছেছে।-দেখ মা, ব্যবসা ছাড়া কোনদিন কেউ কিছু করতে পারে না, বুঝলে? একটা কলেজের মাস্টারকে এভাবে মাথায় তুলছ কেন তোমরা–অর্চনার বিয়ের ভাবনা তো? সব ঠিক আছে, সে-ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

মিসেস বাসু অকুলে কুল পেয়েছেন। অতঃপর গৃহকর্তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ফলাও করে বিস্তার করেছেন তিনি। ছেলে গম্ভীর মুখে পরামর্শ দিয়েছে, বাবার কথায় কান দিও না, অর্চনাকেও একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো।

অর্চনাকে বুঝিয়ে বলার আগেই বিকেলে দাশু ছোট দিদিমণির খাবার দিতে গিয়ে তার কাছে বিপদের পূর্বাভাস জ্ঞাপন করে রেখেছে একটু। দাদাবাবুরা তকতকে গাড়ি কিনেছেন, সকালে মাকে চড়ালেন, দাদাবাবু মায়ের কাছে খেতে বসে খুব সুখ্যাতি

করছিল ননিবাবুর, বড় দিদিমণির আর ভাবনা নেই, বিয়ের পর গাড়ি চেপে খুব হাওয়া খাবে, ইত্যাদি।

দাশুর বচন নিয়েই মনের আনন্দে বরুণা দিদির পিছনে লেগেছিল। ভদ্রলোকের আর কোন আশাই নেই, আমি না হয় পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়ে আসি, মশাই গাড়িটাড়ি কিনতে পারেন তো এগোন, নয় তো কেটে পড়ুন! দাশ বলছিল, তোর আর একটুও ভাবনা নেই, ননিদা তোকে দিনরাত হাওয়া খাওয়াবে–

অর্চনার তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে দোরগোড়ায় মায়ের সঙ্গে বরুণার ধাক্কা লাগার উপক্রম। তিনি মেয়েকে বোঝাতে এসেছিলেন। বরুণা পাশ কাটিয়ে পালালো। মিসেস বাসু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, মেয়ের চলাফেরা দেখ না!

মায়ের সাড়া পেয়েই অর্চনা পড়ার টেবিলে বসে বই টেনে গম্ভীর হতে চেষ্টা করল। ঘরে এসে মিসেস বাসু দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তার পর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর শুনেছিস?

অর্চনা খবর শোনার জন্য ঘুরে বসল।

খাটের বিছানায় উপবেশন করে প্রসন্ন মুখে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, বিজু আর ননি চমৎকার নতুন গাড়ি কিনেছে–

তাই নাকি! অর্চনার বিস্ময়ে ভেজাল নেই।

হ্যাঁ, সুন্দর গাড়ি–কাল তোদের চড়াবে'খন। ওদের ব্যবসায়ও দিন-কে দিন উন্নতি হচ্ছে, আর ননিমাধবের কত প্রশংসা করছিল বিজু

ছদ্মত্রাসে অর্চনার চোখ বড় বড়।–তুমি যেন করে বোসো না মা প্রশংসা, তাহলে এক ডজন রুমাল প্রেজেন্ট করতে হবে ভদ্রলোককে!

ঠাট্টাটা আজ মায়ের একটুও ভাল লাগল না। বললেন, তোর সবেতে বাড়াবাড়ি, ঠাস ঠাস কথা বলতে পারলেই ভাবিস কি নাকি–

কিন্তু কথার মাঝে তাঁকেই হঠাৎ থেমে যেতে হল। একটু আগে জলন্ত ধুনুচি হাতে দাশু ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকেছিল। ঘরে ধুনো দেওয়া আর কোণের তাকে বুদ্ধমূর্তির কাছে ধুনুচি রেখে প্রণাম করাটা তার নৈমিত্তিক সান্ধ্য কাজ। আর প্রণামটা বুদ্ধমুর্তি বলে নয়, ঠাকুর-দেবতা বা সেই সদৃশ মূর্তি দেখলেই করে থাকে। তাকে ঢুকতে দেখা গেছে, কিন্তু বেরুলো কি না সেটা মিসেস বাসু লক্ষ্য করেননি। এবারে থেমে গিয়ে লক্ষ্য করলেন। তাকের বুদ্ধমূর্তির সামনে ধুনুচি রেখে জোড় হাতে মাথা রেখে দাশু প্রণাম করেই আছে। অর্চনার হাসি চাপা দায়। এদিকের সাড়াশব্দ না পেয়ে দাশু আস্তে আস্তে মুখ তুলতেই কীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়।

বেরো এখান থেকে, এক ঘণ্টা ধরে প্রণামই করছে!

ধুনুচি হাতে দাশুর শশব্যস্ত প্রস্থান।

মাকে আবার প্রস্তুত হতে দেখে অর্চনা হাসি সামলে গম্ভীর হল কোন প্রকারে।

...হ্যাঁ, যা বলব ভাবছিলাম তোকে, তোর বাবার একেবারে ভীমরতি ধরেছে। একটু আধটু আলাপ-সালাপ কত লোকের সঙ্গেই হয়, তা বলে ওই মাস্টারই নাকি খুব ভাল ছেলে, তার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পড়তে চায়।

রাত বলেই রক্ষা, শোনামাত্র অর্চনার মুখের রঙ বদল হয়েছিল কি না ধরা পড়ল না। আচমকা খুশীর আলোড়ন গোপন করার জন্য তরল বিস্ময়ে নাকমুখ কুঁচকে ফেলল একেবারে, এ-মা, তাই নাকি?

অভিব্যক্তি দেখে মা একটু হয়তো আশ্বস্তই হলেন। আরো ঝুঁকে বসে মেয়েকে সংসার বিষয়ে একটু সচেতন করার উদ্দেশ্যে নিজের সংসার-জীবনের কষ্টক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সমাচার ব্যক্ত করতে ভুললেন না। মাস্টারের সংসার সচল রাখা যে কত কষ্টের সে শুধু উনিই জানেন, এর ওপর শেষজীবনে কি আছে কপালে কে জানে। পেনশনের তো ওই ক'টি টাকা, উনি দিন-রাত ঘাড়ে চেপে এটা ওটা লিখিয়ে কোনরকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছেন–কত যে ভাল সে আর কে বুঝবে। তা ছাড়া বই লেখাও তো সকলের কম্ম নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। উপসংহারে মেয়েকে সতর্ক করে দিলেন, তোর কাছে বলতে এলে খবরদার কান পাসি না।

অর্চনা বলল, তুমি ক্ষেপেছ মা?

টেবিল থেকে পড়ার বই হাতে তুলে নিয়েছে সে। প্রকাশ, তার পড়াশুনার ড়াটাই আপাতত বেশি। মা বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটা টবিলের ওপরেই

আছড়ে ফেলেছে আবার। উঠে সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছে। বরুণাটা এক্ষুনি এসে হাজির হবে ভেবেই তাড়াতাড়ি আবার চেয়ারে এসে বসেছে।

মিসেস বাসু শুধু মেয়েকে সতর্ক করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, সেই রাতেই স্বামীকেও একটু-আধটু সমঝে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। গাড়ি কেনার প্রসঙ্গে ননিমাধবের সম্বন্ধে ছেলের উক্তিটাই স-পল্লবে আগে সমর্থন করে নিয়েছেন। শুধু বাড়ির অবস্থাই ভাল নয়, ছেলেটাও যে কাজের সেটা এতদিন বোঝেননি বলে একটু আক্ষেপও করেছেন। আর শেষে, বিয়েটা যে ছেলেখেলা নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা–সেই প্রসঙ্গে ছোটখাটো ভাষণ দিয়ে বলেছেন, কর্তাটি যা বোঝেন না তাতে যেন মাথা ঘামাতে না আসেন, অথবা কাউকে কোনরকম আবোলতাবোল প্রশ্রয় দিয়ে না বসেন।

ফল উল্টো হল।

এই এক মাসের মধ্যে সমস্যাটা ঠিক স্মরণের মধ্যে ছিল না ভদ্রলোকের। মনে পড়ল। স্ত্রীর সব কথাই শুনতে হয় বলে শোনেন, কিন্তু করণীয় যা সেটা বেশির ভাগই নিজের মত অনুযায়ী করেন। অন্তত গুরুতর কোন ব্যাপারে স্ত্রীর মত। মতের ওপর তার আস্থা কমই। এদিক থেকে স্ত্রী একটা যথার্থ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাকে, বিয়ে তো ছেলেমানুষি ব্যাপার নয়। নয় বলেই ভাবনা। তার ওপর গাড়ি কেনার দরুন হঠাৎ আবার যে ছেলেটার প্রশংসার সূচনা, তাও চিন্তার কারণ একটু।

পরদিন সকালে বই পড়তে পড়তেও এই সমস্যাটাই থেকে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। টেবিলের ওপর চুরুটের সামান্য একটু নেভানো অংশ পড়ে আছে। সেই কখন বাক্স

নিয়ে দাশু দোকানে গেছে চুরুট ভরে আনতে, এখনো দেখা নেই। চুরুটের অভাবে ভাবা বা পড়া কোনটাই সুস্থির মত হচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে শেষে দাশুর উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন তিনি।

তাই শুনে ওদিকের ঘর থেকে অর্চনা উঠে এলো। বইয়ের ওপর চোখ রেখে তিনি হাত বাড়ালেন।

কি বাবা?

ও তুই... দাশুটা গেল কোথায়, আর কেউ কোথাও পাঠিয়েছে?

টেবিলে চুরুটের বাক্স না দেখে অর্চনা বুঝল দাশুর খোঁজে বাবা অত গরম কেন। বলল, আচ্ছা আমি দেখছি–

সে দরজার দিকে এগোতে কি ভেবে তিনি বাধা দিলেন, থাক তোকে দেখতে হবে না, এদিকে আয় কথা আছে

অর্চনা ফিরল।

বোস–

একটু অবাক হয়েই অর্চনা মোড়াটা তাঁর সামনে টেনে বসল।

হাতের মোটা বইটা একদিকে সরিয়ে রেখে তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মা তোকে কিছু বলেছে?

অর্চনা শঙ্কিত একটু, কি বলবে?

তার মানেই বলেনি, বলবে না আমি আগেই জানি, তার তত সব বড় বড় ইয়ে–

আসল প্রসঙ্গটা দুর্বোধ্য রেখেই স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে নিলেন একটু। অর্চনা ভয়ে ভয়ে একবার দরজার দিকটা দেখে নিল, তার পর বাবার দিকে তাকাল।

যাকগে শোন, ওই সুখেন্দু খুব ভাল ছেলে তুই কি বলিস?

লজ্জায় আরক্ত হলেও জিজ্ঞাসার নমুনায় অর্চনা বাবার: দিকে চেয়ে হেসেই ফেলল। মেয়ের কিছু বলা না বলার জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি। নিজের মনের কথাটাই ব্যক্ত করলেন।–তোর মা অবশ্য বলবে ওর মোটর নেই, মাস্টারি করে–মাস্টারি তো আজীবন আমিও করলাম, মোটর হয়নি?

জবাব না দিয়ে অর্চনা ভয়ে ভয়ে দরজার দিকেই তাকাল আবার।

...তা শোন, আমি বলছিলাম ওর সঙ্গেই তোর বিয়ের কথাটা পেড়ে দেখি। তোর কি মত?

বাবার কাছে সর্ব বিষয়ে নিজের মতামতটা স্পষ্ট ব্যক্ত করতেই অভ্যস্ত সে। কিন্তু বাবার কাণ্ডই আলাদা, এও যেন বইয়ের আলোচনা একটা। লজ্জায় অর্চনা ঘেমে ওঠার দাখিল। কিন্তু এবারে জবাব না দিয়েও উপায় নেই, বাবার যা বলার বলা হয়ে গেছে।

অর্চনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, তার পরে মোড়া ছেড়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল।

খুশীতে ভদ্রলোক টুকরো পোড়া চুরুটটা মুখে তুলে নিলেন।

বাইরে এসে হাঁপ ফেলতে গিয়ে অর্চনা থমকে দাঁড়াল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁত। হাতে চুরুটের বাক্স। তার মুখে খুণীর চাপা অভিব্যক্তি, এবং সেই খুশীর কারণে সে চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট সরিয়ে সবে পকেটে পুরছে।

দাশু মুখ তুলেই দেখে সামনে দিদিমণি। চুরি ধরা পড়ে গেল।

অর্চনা ভ্রুকুটি করে তাকাল তার দিকে, দাঁড়াও বাবাকে বলছি—

বিব্রত গোবেচারী মুখ দাশুর।

ছদ্ম রাগে অর্চনা তার পাশ কাটাতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। খোলা চুরুটের বাক্স থেকে আর একটা চুরুট তুলে নিয়ে দাশুর বুকপকেটে গুঁজে দিয়েই হন হন করে এগিয়ে গেল। হাস্যবদন দাশু ঘুরে দাঁড়াল, আর খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকাল অর্চনাও। তার মুখভরা হাসি।

ঘোষণা যা করার সেটা অতঃপর ডক্টর বাই করেছেন। আর সেটা করেছেন সুখেন্দুকে নিজের ঘরে ডেকে কথাবর্তা বলে এবং তার সম্মতি নিয়ে তার পর। শুনে তার গৃহিণী স্তব্ধ পাথর। বিজন বিস্ময়াহত।

মায়ের সামনা-সামনি অর্চনা মুখখানা এমন করেছে যেন অবুঝ বাবা হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলারই ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু তাতেও মাকে তুষ্ট করা সম্ভব হয়নি, বাপের সঙ্গে মেয়ের চক্রান্তটা বুঝেছেন তিনি।

বাড়ির এই হাওয়াটা একটু গোলমেলে ঠেকল ননিমাধবের কাছেও।... বিজুদার হাবভাবে কেমন যেন সঙ্কোচ একটু! কাজের কথা ছাড়া কাছে ঘেষতে চায় না, কাচুমাচু ভাব, বাড়ি গেলে বরুণা রাণু বউদিও কেমন এড়িয়ে চলে। আর, যার প্রত্যাশায় যাওয়া তার তো দেখাই মেলে না। এমন কি, তার মায়েরও না।

ষষ্ঠ চেতনার কারিগরি কি না বলা যায় না, বিকেলের দিকে সেদিন সে এসেও হাজির বড় মর্মান্তিক ক্ষণে। মনে হল নিচের ঘরটা একটু বেশি পরিপাটি সাজানো গোজানো। সেই নিরিবিলিতে বসে একটু পড়ছিল রাণু বউদি, ওকে দেখে চমকেই উঠল যেন। ননিমাধব নিশ্চিন্ত মনে পড়তেই বলেছিল তাকে, তবু কতটিকে খবর দেবার জন্যে প্রায় শশব্যস্তেই পালিয়েছে সে। বরুণাও বউদির উদ্দেশে বকাবকি করতে করতেই একবার ঘরে ঢুকেছিল! বউদির বদলে ওকে দেখেই অস্ত, বিব্রত। দাদাকে খবর দেবার অছিলায় সেও দ্রুত প্রস্থান করেছে। ওদিক থেকে মিসেস বানুর গলা শোনা গেছে। কাজের সময় সকলের অলস নিশ্চিন্ততার কারণে ক্ষোভ তাঁর। এমন কি, ওপর থেকে কর্তার গলাও শোনা গেল, কতক্ষণের মধ্যে কে এসে পড়বে সেই কথা জানাচ্ছেন।

অন্যমনস্কর মত একটা সিগারেট ধরিয়ে খালি প্যাকেটটা জানালা গলিয়ে ফেলতেই ওদিক থেকে যে-মূর্তিটি মুখ তুলল, সে দাশ। জানালার ওপাশে বসে আয়েস করে বিড়ি টানছিল সে। কীর সামনে পড়লেই তো ছোটাছুটির একশেষ, সবে ফুরসৎ পেয়ে আড়ালে সরেছিল।

...ও তুমি–

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখেই দাশু আবার জানালার ধারে বসে পড়েছে। ঘরে কে আছে বাইরে গাড়ি দেখেই বুঝেছিল।

কিন্তু ব্যতিক্রমটা বড় বেশি স্পষ্ট লাগছে। ননিমাধব দাশুকে না ডেকে নিজেই বাইরে এসে দাঁড়াল। বিড়ি ফেলে দাও প্রস্তুত।

আচ্ছা দাশু...এঁরা সবাই একটু ব্যস্ত দেখছি যেন, কি ব্যাপার? কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনলাম

দাশু সাদাসিধে জবাব দিল, হা, দিদিমণির বিয়ের কথাবার্তা–বড় দিদিমণির।

ননিমাধবের সঙিন অবস্থা।–কার সঙ্গে, মানে কে বলছে কথা?

সকলেই। মা, বাবু, দাদাবাবু—

একটু আশ্বস্ত।–দাদাবাবু বলছেন?

দাশু নিস্পৃহ।–দাদাবাবুই তো সব থেকে বেশি রাগারাগি করছিলেন।

ননিমাধব হকচকিয়ে গেল আবারও।– রাগারাগি কেন?

আর বেশি সংকটের মধ্যে রাখতে দাশুরও মায়া হল বোধ হয়। ঘ্যাঁচ করে খাঁড়াটা এবারে বসিয়েই দিল সে। ওই মাস্টারবাবুর সঙ্গেই দিদিমণির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল–তাই আজ আশীর্বাদ।

ননিমাধব পাংশু হতভম্ব বেশ কিছুক্ষণ।

হাতের আস্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এক-পা দু-পা করে গাড়িতে গিয়ে উঠল।... চালকের আসনে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছে।

৫. অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল

অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল।

সংসারে কর্ত্রী পিসিমা। সুখেন্দুর বাবারও বড়। বাবা অনেককাল বিগত। সুখেন্দুর ছাত্রজীবনের শেষ দু বছর এই পিসিমাই দূরে থেকে তার আর তার মায়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন। নইলে বি. এ. পাশ করেই সুখেন্দুকে চাকরির চেষ্টা দেখতে হত, এম এ. পড়া হত না। বাবা মারা যাবার পর পিসিমা মাঝে মাঝে এই সংসারে এসে এক মাস দু-মাস থাকতেন। বি. এ. পাশ করার পর ভাইপোকে পড়া ছেড়ে শুকনো মুখে চাকরির কথা ভাবতে দেখে তিনিই জোর করে ওর আরো পড়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সুখেন্দু পাকাপাকি ভাবে পিসিমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। শেষ জীবনটা পিসিমা হরিদ্বারে কাটাবেন স্থির করেছিলেন। সেখানকার এক আশ্রমে তার বড় জা থাকেন, বহুবার তিনি সেখানে আহ্বান জানিয়েছেন। পিসিমাকে কলকাতায় নিয়ে আসার সময় সুখেন্দুও তার হরিদ্বারে থাকার ইচ্ছেয় আপত্তি করেনি। কথা ছিল, তার মা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি যাবেন।

কিন্তু মা আর সুস্থ হননি। মস্ত একটা খেদ নিয়েই তিনি চোখ বুজেছেন আর পিসিমাকে ভাল হাতে আটকে রেখে গেছেন।

এই সব অর্চনা বেশির ভাগই সুখেন্দুর মুখে শুনেছে। শুধু শাশুড়ীর খেদের কথাটা পিসিমা নিজে বলেছেন। অর্চনা এ বাড়িতে পদার্পণ করার প্রথম সন্ধ্যাতেই পিসিমা তাকে

দোতলায় সুখের ঘরে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিতে তার শাশুড়ীকে দেখিয়েছেন। প্রমাণ-সাইজের অয়েল-পেন্টিং ছবি–ফুলের মালা জড়ানো। পিসিমা বলেছেন, তোমার শাশুড়ী... আজ যেন হাসছে।

ছবিতে শাশুড়ী হাসুন আর না হাসুন, পিসিমা চোখ মুছছিলেন। রাশভারী মহিলাটি সেদিন আনন্দে অনেকবার হেসেছেন অনেকবার কেঁদেছেন। ছবি দেখিয়ে বলেছেন, বড় সাধ ছিল ছেলের বউ দেখবে নাতির মুখ দেখবে। শেষের দিন ক'টা তো এই এক আশা নিয়েই বেঁচে ছিল, কিন্তু গোঁয়ার ছেলে তো তখন–

আর বলেননি। শুভদিনে চোখের জল আটকাবার জন্যেই হয়তো ওকে বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অনা তখন উঠে এসে ছবিটিকে নিরীক্ষণ করে দেখেছে। নিজের অগোচরে যুক্তকরে শাশুড়ীর উদ্দেশে প্রণামও করেছে।

বাড়িতে আর পাকা বাসিন্দা বলতে রাধুনী সাবি। একটা ছোকরা চাকর আছে, হরিয়া-সে ঠিকে কাজ করে, দু-বেলা এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। পিসিমার আপত্তি সত্ত্বেও সুখেন্দুর এই ব্যবস্থা, কোনভাবে যেন তাঁর অসুবিধে না। হয়। তাঁর পূজো-আর্চা আচার-অনুষ্ঠানের বিঘ্ন যত কম ঘটে।

বিয়ের পর সব থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বোধ করি এই পিসিমাই ফেলেছিলেন। ভাইপোর মেজাজ তাঁর থেকে বেশি আর কে জানে! এই একরোখা ছেলে নিয়ে মস্ত দুর্ভাবনা ছিল তাঁর। যতবার বিয়ের কথা বলেছেন, ছেলের সাফ জবাব, অশান্তি বাড়াতে চাও কেন, মা যখন নেই আর দরকারও নেই–

পিসিমা অনুযোগ করেছেন, মা নেই বলে কি আমি নেই, আমি চিরকাল পড়ে থাকব এখানে?

সুখেন্দু বলেছে, পড়ে থাকবে কেন, যখন যেখানে ভাল লাগবে সেখানে থাকবে।

পিসিমার দুর্ভাবনা গেছে। মুখে না বলুক মনে মনে অর্চনার ওপরেও খুশী–এই ছেলের জন্য ও-রকম মেয়েই দরকার ছিল।

পিসিমার উপলব্ধি মিথ্যে নয়, সুখেন্দুর গুরুগম্ভীর ভারী দিকটা অর্চনা যেন দুদিনেই হালকা করে ফেলেছিল। এমন যে, নিজের পরিবর্তনে সুখেন্দু নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হত। সপ্তাহে তিন দিন সকালে প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষার্থিনী এক বিবাহিতা ছাত্রী পড়াতে যায়, দেড়শ' টাকা মাইনে। সেখানে ঘড়ি ধরে হাজিরা দিয়ে এসেছে এতদিন। ওই তিন দিন সকালে বাড়িতে চা খাওয়ার অবকাশ বড় হত না। বিয়ের তৃতীয় দিনেই অর্চনা সেইখানে জুলুম কর, আর সেটা যে এত মিষ্টি লাগতে পারে সুখেন্দু কোনদিন কল্পনাও করেনি।

তখন সাতটাও নয় সকাল, অর্চনা নিচে। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি জামা গায়ে গলিয়ে নিচে নামতে যাবে, দেখে চায়ের পেয়ালা হাতে অর্চনা ওপরে উঠে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সুখেন্দু ব্যস্তভাবে বলল, এখন নয়, এসে খাব'খন দেরি হয়ে গেছে–

অর্চনা কিছু বলেনি, চায়ের পেয়ালা হাতে মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুধু। সুখেন্দু নাগালের মধ্যে আসতেই খপ করে জামার বুকের কাছটা ধরে হিড়হিড় করে আবার তাকে ওপরে টেনে এনেছে। সুখেন্দু অনুনয় করেও রেহাই পায়নি। ওই অবস্থায় ওপরে

উঠতেই বারান্দার অন্য কোণ থেকে পিসিমার সঙ্গে চোখাচোখি। জামা ছেড়ে দিয়ে অর্চনা দৌড়ে ঘরে পালিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝে পিসিমা মনে মনে বলেছেন, এই রকমই দরকার ছিল। এক মিনিট দেরি হলে কতদিন ছেলে সাবির মুখ কালো করে দিয়ে ভাত না খেয়েই কলেজে চলে গেছে ঠিক নেই। কেউ ডাকতে সাহস পর্যন্ত করেনি। এখন চা না খেয়েও বেরুনো বন্ধ।

রাতে খাবার টেবিলে সেদিন এমন গম্ভীর দাদাবাবুর কাণ্ড দেখে আড়ালে গিয়ে সাবি রাঁধুনীও আনন্দে ক'বার জিব কেটেছে ঠিক নেই। ফাঁক বুঝে সুখেন্দু জোরজার করে অর্চনার মুখে কিছু খুঁজে দেবেই। অর্চনা তার হাত থেকে খাবে না, সুখেন্দু নাছোড়। শেষে বাহুবলে সেই চেষ্টা করার উপক্রম দেখে অর্চনা হঠাৎ এস্তে বলে উঠেছিল, এই, পিসিমা!

হকচকিয়ে গিয়ে সুখেন্দু নিজের জায়গায় বসে ফিরে দেখে প্লেটে, আরো ভাত নিয়ে দোরগোড়ায় সাবি লজ্জায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুখেন্দু অপ্রস্তুত, হাসতে হাসতে অর্চনার বিষম খাবার দাখিল।

শোবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটিতে বসে সুখেন্দু পড়াশুনো করে। দুই ঘরের মাঝখান দিয়েও দরজা আছে একটা। রাতের আহারের পর খানিক বই নিয়ে বসাটা বরাবরকার অভ্যাস। বিয়ের কয়েকদিন বাদে সেই অভ্যাসটাই বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল সেদিন। কিন্তু পড়ায় মন বসছে না, তবু অর্চনা ঠাট্টা করবে বলেই জোরজার করে বসে আছে। ওর সঙ্গে ছদ্ম রেষারেষি করেই পড়তে বসেছিল।

বই থেকে মুখ না তুলেই বুঝল পা-টিপে অর্চনা মাঝের দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিচ্ছে। খুব সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে আস্তে আস্তে শিকল তুলে দিয়েই অর্চনা চমকে ফিরে তাকাল। এরই মধ্যে বারান্দার দরজা দিয়ে সুখেন্দু ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছে। জব্দ হয়ে অর্চনা হেসে ফেলে ঝন করে শিকলটা ফেলে দরজা খুলে দিয়েছে আবার।–থাক, আর নাক ডাকাতে হবে না, বিছানায় গা ঠেকালে ও-নাক আপনি ডাকে।

অনুযোগটা মিথ্যে নয়। শুয়ে পড়লে ঘুমুতে তার দু মিনিটও লাগে না। তৎক্ষণাৎ উঠে বসে সুখেন্দু নিরীহ মুখে ঘোষণা করেছে, আজ আর বিছানায় গা ঠেকাবো না ভেবেছি।

ছুটির দিনে অর্চনার বাবা মা বরুণা সকলেরই নিয়মিত প্রত্যাশা, ওরা আসবে। কিন্তু প্রথম কটা দিন সে-সময়ও হয়নি ওদের। মা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন জেনেও অর্চনা নিরুপায়। ছুটির দিন এলেই দেখা যায়, সুখেন্দু আগে থাকতেই কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম করে বসে আছে। সিনেমা থিয়েটার নয়, দশ-বিশ মাইল দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ার প্রোগ্রাম। আর সত্যি কথা, তখনকার সেই আনন্দের মধ্যে অর্চনারও বাড়ির কথা বা মায়ের কথা মনে থাকত না। এমন কি, সেদিন ডায়মন্ড হারবার থেকে ঘুরে আসার পর মনের আনন্দে মায়ের ঘরোয়া চায়ের আমন্ত্রণে যেতে না-পারার খেদও ভুলতে সময় লাগেনি। অর্চনা যাবে কথা দিয়েছিল, আর মিসেস বাসু তো ওর আসতে না পারার কথা ভাবতেও পারেন না। আগেও দুই-একবার আসবে বলে আসেনি। এটা তার থেকে একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার। আরো দু-চারজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার আসার কথা। কিন্তু দেখা গেল ওকে হঠাৎ খুশী করার জন্য সুখেন্দু আগে থাকতেই ডায়মণ্ড হারবার যাবার ব্যবস্থা ঠিক

করে রেখেছে। অর্চনার ভিতরটা খুঁতখুঁত করছিল, মা অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সুখেন্দু আমলই দেয়নি।

সেখানে গিয়ে পড়ার পর অর্চনা নিজেই সব ভুলেছিল। সূর্যাস্তের পর ছোট একটা নৌকো ভাড়া করেছিল দুজনে। মাঝির কাছ থেকে নৌকোর হাল ধরতে গিয়ে সুখেন্দু নৌকো ঘুরপাক খাইয়েছে। অর্চনা ঠাট্টা করেছে, টিপ্পনী কেটেছে। হাল আর বৈঠা নিয়ে খানিক দাপাদাপি করে সুখেন্দু ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে। বিকালের সূর্যাস্তের শেষ রঙে গোটা নদীটাই যেন অদ্ভুত রাঙানো। চলন্ত নৌকোয় সুখেন্দু একটা হাত জলে ডুবিয়ে বসে ছিল, আর জলের বুকে লম্বা একটা দাগ পড়ছে তাই দেখছিল।

সামনে থেকে কৃত্রিম মোটা গলা শোনা গেল, সুখেন্দুবাবু, ও কি হচ্ছে?

হাত আর মুখ দুই-ই তুলে দেখে, অর্চনা তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। সুখেন্দু ভুরু কোঁচকালো।

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনাও–ওখানে হাত কেন, একটা কিছুতে ধরে টান দিলে–?

তা বলে তুমি আমার নাম ধরে টান দেবে। দাঁড়াও পিসিমাকে বলছি–

অর্চনা ঘটা করে নিশ্বাস ফেলেছে একটা।-আহা, কি খাসা নাম। সুখেন্দু ... মুখের সঙ্গে তো কোনকালে কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।

সুখেন্দুর মতলব অন্যরকম, কাছে আসার উদ্যোগ করেছে, হয় না বুঝি...?

ভাল হবে না বলছি। সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়েই অর্চনা তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে আর তার সেই বিব্রত অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসেছে।

স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটছিল যেন।

এই ঘোটা মাঝে মাঝে অর্চনার মা-ই ভেঙেছেন। মেয়ের সাংসারিক ব্যাপারে আর তার কোন দায়িত্ব নেই, এটা তিনি একবারও ভাবতে পারেননি –ভাবতে রাজীও নন। বরং এই অপ্রিয় দায়িত্ব তার আরো বেড়েছে বলেই মনে করেন। মেয়ের বিচার-বুদ্ধি এই বিয়ের থেকেই বুঝে নিয়েছেন। তাই কিছু একটা মনে হলেই তিনি দাশুর হাতে চিঠি দিয়ে মেয়েকে ডেকে পাঠান। অর্চনা না গিয়েও পারে না। না গেলে পরামর্শ দেবার জন্য জন নিজেই এসে হাজির হন। অর্চনা শোনে, শুনতে হয় বলেই শোনে। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি, আর, না কেউ শুনে ফেলে। ফাঁক পেলে জামাইকেও সাংসারিক বিষয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু আধটু উপদেশদানে কার্পণ্য করেন না মহিলা। ফলে জামাই শাশুড়ীটির ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। অর্চনাকে বলে, তোমার মা-টি আমাকে তেমন পছন্দ করেন না।

অর্চনা হেসে উড়িয়ে দেয়। কখনো ছদ্ম সহানুভূতি দেখায়, আহা, এমন পছন্দের মানুষকে পছন্দ করে না...! কখনো বিব্রত বোধ করেও ছদ্মকোপে চোখ রাঙায়, তার মেয়ের পছন্দয় মন ভরছে না?

মায়ের সমস্যাটা কোথায় বা কাকে নিয়ে, অর্চনা মনে মনে সেটা খুব ভাল করেই জানে।

মায়ের সমস্যা পিসিমা।

প্রথমত মেয়ের সংসারের এই সেকেলে পরিবেশটাই মায়ের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। একজন গ্রাম্য বিধবা সেখানে কর্তৃত্ব করবেন আর মেয়ে তার কথায় উঠবে বসবে সেটা সহ্য করা আরো শক্ত। তার ধারণা, মেয়ে যে ডাকা মাত্র আসে না বা আসতে পারে না, তার কারণও ওই পিসিমা। পিসিমার কথা উঠলেই মেয়ে তাড়াতাড়ি সে-প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়, সেটা লক্ষ্য করেও তিনি মনে মনে চিন্তিত এবং ওই মহিলাটির ওপর বিরূপ। এর ওপর গোড়ায় গোড়ায় দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে বরুণা সপুলকে মাকে ঠাট্টা করেছে, দিদিটা যে মা একদম গেঁয়ো হয়ে গেল, বসে ব্রতকথা শোনে, ছাই দিয়ে নিজের হাতে বাসন মাজে।

কখনো এক আধটা রেকাবি-টেকবি মাজতে দেখে থাকবে। কিন্তু এরই থেকে মা মেয়ের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল দেখেননি। তার ওপর অর্চনা আর য়ুনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না শুনে তো রীতিমত ক্রুদ্ধ তিনি। অর্চনা পড়বে না সেটা সুখেন্দুরও আদৌ ইচ্ছে ছিল না, আর সেজন্য তাগিদও কম দেয়নি। তবু মিসেস বাসু সেই বেচারার সঙ্গেই এক-হাত বোঝাপড়া করতে ছাড়েননি। অর্চনা অবশ্য বলেছে, তার ভাল লাগে না। কিন্তু মা সেটা বিশ্বাস করেননি, এও সেই পিসিমারই অনুশাসনের ফল বলে ধরে নিয়েছেন। কোন্ সেকেলে বিধবা চায় ঘরের বউ এম. এ. পড়তে যাক–

অর্চনার পড়া ছাড়াটা ডক্টর বাসুও ঠিক পছন্দ করেননি। বলেছেন, পড়াটা ছাড়লি কেন, ওঁরা আপত্তি করেন?

অর্চনা তাড়াতাড়ি বলেছে, না বাবা, ওঁদের তো পড়ছি নে বলেই রাগ দেখি সামনের বছরে যদি হয়।

গৃহিণী তাকে অন্য কথা শুনিয়েছেন।–পড়বে কি করে, তার থেকে পাঁচালী আর ব্রতকথা শুনলে কাজ হয় না!

কেমন ঘরে মেয়ে পড়েছে স্ত্রীর সেই অভিযোগ বাবাকে ওর বিয়ের পর থেকেই শুনতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি বড় গায়ে মাখেননি বা চিন্তিত হননি। নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টির ওপর ভদ্রলোকের আস্থা আছে। মেয়ের ব্যাপারে স্ত্রী অভিযোগ করতে এলেই একদিনের পরিপূর্ণতার একটা মূর্তি ভাসে তার সামনে। সেটাই তিনি বিশ্বাস করে খুশী আর নিশ্চিন্ত। সুখেন্দুর বন্ধু-বান্ধব ওদের বিয়ে উপলক্ষেই ছোটখাটো একটা আয়োজন করেছিল। সেখান থেকে সুখেন্দুকে নিয়ে অর্চনা এখানে এসেছিল। এ কদিনের মধ্যে ভদ্রলোক নিরিবিলিতে দুটো কথা বলার সুযোগ পাননি। সুখেন্দুকে বরুণা আটকেছে, অর্চনা সোজা বাবার ঘরে চলে এসেছিল। তার গলায় সুখেন্দুর বন্ধুদের দেওয়া মোটা ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা আর রজনীগন্ধার ঝড়।

প্রণাম করে উঠতেই ডক্টর বাসু তার দিকে চেয়ে মহা খুশী।-বাঃ! কোথাও পেছলি বুঝি?

অর্চনা জানাল কোথা থেকে আসছে।

বিয়ের পর ডক্টর বাসু সেই প্রথম যেন ওকে ভাল করে দেখছেন। তৃপ্তিতে দু-চোখ ভরে গেছে তাঁর। ওকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, বেশ, তুই কেমন আছিস বল।

অর্চনা মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ ভাল।

খুব ভাল?

মায়ের কারণে বাবার ভিতরে ভিতরে সংশয় একটু থাকাই স্বাভাবিক। অর্চনা এবারে আরো বেশি মাথা হেলিয়ে হেসে ফেলেছিল।

সেই থেকে ডক্টর বাসু একেবারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মাকেও একটু খুশী করতে গিয়ে অর্চনা মাঝে মাঝে দু-নৌকোয় পা দিতে লাগল। এ বাড়িতে এলে সাজগোজ চালচলন আদব-কায়দা আর একটু বাড়ে। একটু আধটু রঙ-চঙ মেখে মায়ের সঙ্গে কালচারাল অনুষ্ঠানেও যোগ দেয় আগের থেকে বেশি। অর্থাৎ মাকে সে বোঝাতে চায়, তার স্বাধীনতা একটুও খর্ব হয়নি বা নিজেও একটুও বদলায়নি। আর তাই দেখে সুখেন্দুরই খটকা লাগত একটু আধটু। বাড়িতে পিসিমার সামনে যে অর্চনাকে দেখে, নিজের মায়ের সামনে সে ইএকেবারে বিপরীত। এই নিয়ে অনেকদিন ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে। অর্চনা জবাব দিয়েছে, যেখানে যেমন রীতি, তুমি যদি আর এক রকম চাও, আর এক রকমও হতে পারে।

ক'টা মাসের এই একটানা ছন্দে ছোটখাটো একটা তালভঙ্গ হয়ে গেল সেদিন।

দিনের শুরুটা কিন্তু অন্যরকম হয়েছিল। অবসর সময়ে শেভ করার পর নাকের নিচের একটুখানি গুম্ফরেখা তদারকের অভ্যাস সুখেন্দুর অনেক দিনের। আর সেই নিবিষ্টতায় সময়ও একেবারে কম কাটত না। অর্চনা পিছনে লেগে লেগে সেই তোয়াজের গুম্ফরেখা

নির্মূল করিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন দিদির কড়া শাসন প্রসঙ্গে এই নিয়ে বরুণার ঠাট্টার জবাবে দুজনকেই জব্দ করার জন্য সুখেন্দু ক'টা দিন নাকের নিচে ব্লেড ছোঁয়ায়নি। অর্চনাকে বলেছে, ফুসকুড়ির মত কি একটা উঠেছে, কাটতে গেলে লাগবে। কটা দিন ছুটির পর আজ কলেজ। একটু তাড়াতাড়িই চান খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে ধীরেসুস্থে সে আগের মতই গুম্ফ-বিন্যাস সম্পন্ন করে নিল। অর্চনা এ-সময়টা পিসিমার কাছে। কলেজের সময় হলে তার ডাক পড়বে জানে। সুখেন্দুর সংকল্প, কলেজ থেকে ফোনে বরুণাকে কোন একটা কারণ দেখিয়ে বিকেলে বাড়ি আসতে বলবে।

কিন্তু সেই দিনই শাশুড়ীর যে একটা জোর তলব এসে আছে সেটা তখনো জানত না। সে তখন চানের ঘরে ছিল, ড্রাইভার অর্চনার হাতে মায়ের চিঠি দিয়ে গেছে। মর্ম, গত সন্ধ্যায় ভাগলপুর থেকে তার মাসিমা আর মেসোমশাই এসেছেন, আগামী কালই আবার চলে যাবেন–মেয়ে-জামাইকে দেখতে চান। অবশ্য যেন বিকেলে তারা আসে, তার ওখানেই বিকেলে চায়ের ব্যবস্থা।

জামাইয়ের ডাক পড়লেই অর্চনা বিব্রত বোধ করে একটু। কারণ খুব স্বেচ্ছায় সে ওখানে যেতে চায় না। তার জন্য বেশ সাধ্য-সাধনা করতে হয়। তাছাড়া, মা-ও অনেক সময় আভাসে ইঙ্গিতে এমন কিছুই বলে বসে যা আরো বিসদৃশ। যাই হোক, মাসিমা মেসোমশাই এসেছেন, না গেলেও নয়। বছর খানেক আগে এই মাসিরই ঘটা করে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তার মেয়ে-জামাই এখন আমেরিকায় না কোথায়। কথায় কথায় মাসিমার জামাইয়ের গর্ব দেখে অর্চনা বরুণা একসময় অনেক হাসাহাসি করেছে।

চিঠিটা ড্রেসিং টেবিলে চাপা দিয়ে বারান্দার কোণে বসে অর্চনা থালায় ছড়ানো চালের কাঁকর বাছছিল আর পিসিমার কথা শুনছিল। কুলোয় চালের কুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে পিসিমা সুখেন্দুর ছেলেবেলার দাপটের কথা শেষ করে এই চা বাছার প্রসঙ্গে এসে থামলেন।–ছেলের রাগ তো জান না, দুটোর বেশি তিনটে কাঁকর দাতে পড়ল কি উঠে চলল ভাত ফেলে–আমি এক এক সময় না বলে পারি নে, এত রাগ তোর, তুই ছেলে পড়াস কি করে?

অর্চনা শুনছিল আর মুখ টিপে হাসছিল।

সাবি রাঁধুনী একগোছা চাবি ঝন করে সামনে ফেলে দিয়ে গেল, ভাঁড়ারের চাবি নিচে ফেলে এসেছিলে

আর আমার মনেও থাকে না বাপু অত, চাবিটা তোলো তো বউমা, যেভাবে ফেলে গেল যেন গায়েই লাগে না–

থেমে দুই এক মুহূর্ত কি-একটু ভেবে নিলেন তিনি। তার পর বললেন, আচ্ছা, ওটা এখন থেকে তোমার কাছেই রাখো বউমা–খুব যত্ন করে রাখবে।

আমার কাছে!

থাক, তোমার কাছেই থাক–তোমার শাশুড়ীর চাবি। এই এক চাবি দিয়ে হতভাগী এতকাল আমাকে এখানে আটকে রেখেছে–আর কতকাল টানব।

বিগত শ্বশুর বা শাশুড়ীর কথা উঠলেই পিসিমার চোখ ছলছল করে। আজও ব্যতিক্রম হল না। অর্চনা তার আঁচল টেনে নিয়ে চাবির গোছা বেঁধে দিতে দিতে বলল, আপনি কোনকালে ছাড়া পাবেনও না পিসিমা।

পিসিমা খুশী হয়েই হাল ছাড়লেন।

ছোকরা চাকর হবিয়া এসে খবর দিল, দাদাবাবু কাপড় মাঙছেন। পিসিমা তাড়া দিলেন, যাও, কি চাই দেখে এসো।

ঘরে ঢুকে অর্চনা আলমারি খুলে জামা-কাপড় বার করতে গেল। সুখে ইচ্ছে করেই অন্যদিকে ফিরে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করল, পিসিমা কি বলছিলেন?

একটা জামা টেনে বার করতে করতে অর্চনা আলতো জবাব দিল, বলছিলেন, তুমি এক নম্বরের গোঁয়ার।

কেন?

আরো আগে বিয়ে করোনি কেন?

সুখেন্দু ফিরে ওকেই দোষী করল, আরো আগে তুমি আসনি কেন?

কেন, আমি ছাড়া কি আর–

হাসিমুখে কথাটা শেষ করবার আগেই জামাটার ওপর ভাল করে চোখ পড়তে থেমে গিয়ে ভুরু কোচকালো। মোটা জামা কালচে দেখাচ্ছে কাপড়টাও সেই রকমই। আরো দুই একটা নাড়াচাড়া করে দেখল একই অবস্থা। বিরক্ত হয়ে, যা বার করেছিল তাই নিয়ে সুখের সামনে রাখল সে।–আচ্ছা প্যান্ট কোট পরে কলেজ না করতে পার নাই করলে, তা বলে জামা কাপড়ের এই ছিরি!

কি হল...? সুখেন্দু তার দিকে ফিরল এবার।

আজই বিকেলে বেরিয়ে–ও কি!...অর্চনা বিষম অবাক।

সুখেন্দু নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি?

কি! নাকের নিচে কালির মত এক পোঁচ, এই জন্যেই ক'দিন– আবার হাসছে? কি টেস্ট গো তোমার! পিসিমা ঠিক বলেন, তুমি গোঁয়ার গোবিন্দ!

কাপড়টা টেনে নিয়ে সুখেন্দু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।–ওই জন্যেই তো তোমার এত পছন্দ।

অর্চনা আর পারে না যেন।–না সত্যি, তুমি আমার কোন কথা শোন না।

কাপড় পরা শেষ করে সুখেন্দু জামাটা টেনে নিল।–সব কথা শুনি, বলে দেখো।

রাগ ভুলে অর্চনার দরকারী কথাটাই মনে পড়েছে, মায়ের চিঠির কথাই বলা হয়নি এখনো। সুযোগ পেল।–সত্যি?

জামা গায়ে গলিয়ে সুখেন্দু মাথা নাড়ল।

অর্চনা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে আবারও বলল, ঠিক?

এবার একটু ভয়ে ভয়েই মাথা নাড়ল সুখেন্দু।

কলেজ থেকে ফিরছ ক'টায়?

সাতটায়–

ভাল হবে না বলছি, ক'টা পর্যন্ত ক্লাস?

কেন?

জবাব না দিয়ে অর্চনা ড্রেসিং টেবিল থেকে মায়ের চিঠিটা এনে তার হাতে দিল। চিঠি পড়ে সুখেন্দু বড় নিশ্বাস ছাড়ল একটা।–তাই হবে।

কিন্তু তাই হলেও ঠিক সময়ে হয়নি। সুখেন্দুর গড়িমসিতে এমনি দেরি হয়েছিল একটু, তার পর তৈরি হবার আগেই বাড়িতে সস্ত্রীক তার এক বন্ধু এসে হাজির। তাদের আদর-অভ্যর্থনায় কম করে ঘণ্টাখানেক গেছে আরো। ওরা যখন বেরুলো, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। ট্যাক্সিতে উঠে অর্চনা শুধু বলল, মা দেবে'খন চলো–

সুখেন্দুর ছদ্ম ত্রাস, তাহলে এখানেই নেমে পড়ি আমি।

অর্চনা মুখে যাই বলুক, সত্যিই উতলা হয়নি। কিন্তু ওদিকে মা-টি তার যথার্থই রাগে জ্বলছিলেন। বোনের আড়ালে এরই মধ্যে বরকতক তার স্বামীকে ঠেস দেওয়া হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইয়ের আসতে দেরি হচ্ছে বলে ভদ্রলোকটিই দায়ী যেন। শেষে সন্ধ্যাও পেরুতে দেখে হাল ছাড়লেন। ফলে মেজাজ আরো চড়ল। ঘরে এসে শেষদা ফেটে পড়লেন তিনি-আমি বলছি 'ও-মেয়ের কপালে সুখ নেই। অত করে লিখলাম, তোর মাসিমা মেসোমশাই দুদিনের জন্যে এসেছে, জামাইকে নিয়ে একবার দেখা করে যা– আসতে পারল? আসবে কি করে মেয়ের কি কোন স্বাধীনতা আছে, সেখানে তো পিসিই সব।

ডক্টর বাসু স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন, হয়তো কোন কাজে আটকে গেছে, আজ না আসুক কাল সকালেই আসবে।

গৃহিণীর রাগ এতে বাড়ল বই কমল না!–তুমি তো সবই বোঝে–এই পিসিই ওকে আসতে দেয়নি, নইলে আমি ডাকলেও আসে না। মেয়েটাকে তুমি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলেছ

ক্রুদ্ধমুখে গজগজ করতে করতে নিচে নেমে মুখের ভাব বদলে বোন আর ভগ্নীপতি সন্নিধানে এলেন। বোনটি পান চিবুচ্ছেন আর বরুণা এবং রাণুদেবীর সঙ্গে গল্পসল্প করছেন। ভগ্নীপতি ঈজিচেয়ারে লম্বা হয়ে একের পর এক সিগারেট টানছে। মিসেস বাসু ঘরোয়া খোঁজখবর নিতে বললেন, ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে-জামাই তাহলে কিছুকাল এখন আমেরিকাতেই থাকবে।

হ্যাঁ...তা আরো বছর খানেক তো বটেই।

জামাইয়ের কথা উঠতে বোন দিদির দিকে ফিরলেন। ওদিকে ওপর থেকে ডক্টর বাসুও নেমে এসে বসলেন একটু। তাকে দেশে একে একে মেয়ে বউ দুজনেই উঠে গেল। দিদির আশায় এতক্ষণ ধরে বসে বসে আর মাসিমার তত্ত্বকথা শুনে শুনে বরুণার হাঁপ ধরে গেছে। রাণুদেবীর আশা, নিরিবিলিতে সদ্য-আন। উপন্যাসখানা এবারে একটু উল্টেপাল্টে দেখার সুযোগ হবে।

জামাই প্রসঙ্গেই কথা চলল। বোনের দিকে চেয়ে মিসেস বাসু বললেন, তা তুই খরচও যেমন করেছিস, জামাইও তেমনি পেয়েছিস–এ আর ক'জন পারে।

শেষের খোঁচাটুকু স্বামীর উদ্দেশে। কারো কথায় খুশী হলে ফিরে আবার খুশী করারও একটু দায়িত্ব থাকে বোধহয়। বোন ফিরে প্রশংসা করলেন, তুমিই বা খারাপ কি এনেছ দিদি, কতবড় স্কলার হীরের টুকরো ছেলে। বেশ বিয়ে দিয়েছ।

ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলাও চলে না, আবার স্বামীর সামনে বসে এই প্রশংসা ...হজম করাও সহজ নয়। মিসেস বাসু দ্ব্যর্থক উক্তি নিক্ষেপ করলেন।আমি কিছু করিনি রে ভাই, ওঁর সঙ্গে আগে থাকতেই ছেলেটির জানাশোনা ছিল, পাকে চক্রে হয়ে গেল। যা করার তোর ভগ্নীপতিই করেছেন

ডক্টর বাসু স্ত্রীর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে আলাপটা আর একটু রসিয়ে তুলতে ছাড়লেন না। যেন সত্যিই প্রশংসাই করা হয়েছে ঠার, বললেন, জানাশোনা থাক আর নাই থাক, তোমার পছন্দ না হলে কি আর কিছু হত?

শুধু পলকের দৃষ্টিবাণে যতটুকু আহত করা চলে তাই করলেন মিসেস বাসু। কিন্তু ভদ্রলোক আর বসে থাকাটা যুক্তিযুক্ত বোধ করলেন না। কাজের অছিলায় তাঁদের গল্প করতে বলে প্রস্থান করলেন।

ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করলেন, জামাই বাবাজী কতদিন প্রফেসারি করছেন?

বাড়ির কেউ না থাকাতে মিসেস বাসু স্বস্তি বোধ করলেন। এক প্রশ্নের জবাবে অনেক কথা বললেন। খুব বেশিদিন নয়, তবে উপযুক্ত ছেলে তো, চট করেই উন্নতি করেছে– এই শিগগিরই ভাইস-প্রিন্সিপাল হবে শোনা যাচ্ছে, তারপর থিসিস-টিসিস্ লিখছে, বিলেতও যাবে ফিরে এলেই প্রিন্সিপালও হবে আর কি...।

বেশ, বেশ—। ভগ্নীপতির খুশীর অভিব্যক্তি।

মাসি বললেন, খুব ভাল।

একটু বাদেই বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। মিসেস বাসু গম্ভীর হলেন। বোন জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা এলো নাকি?

জবাব নিষ্প্রয়োজন, অর্চনা উৎফুল্ল মুখে দৌড়েই ঘরে ঢুকেছে। পিছনে সুখেন্দু। মাসি সানন্দে বলে উঠলেন, এই তত! আয় আয়, আমরা সেই কাল থেকে তোদর জন্য বসে আছি

অর্চনা হাসিমুখে মাসি আর মেসোকে প্রণাম করল।–বসে না থেকে একবার গিয়ে হাজির হলেও তো পারতে?

মিসেস বাসু সুখেন্দুকে বললেন, তোমার মেসোমশাই আর মাসিম, প্রণাম করো।

যথা-নির্দেশ।

মাসিমা আশীর্বাদ করতে করতে জামাই যাচাই করে নিলেন। মেসোমশাই বললেন, বোসো। বাবা বসে–তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ, বড় খুশী হয়েছি।

খুশীর খবরে সুখেন্দুর বিড়ম্বিত মূর্তিটি দেখে অর্চনা হাসি গোপন করল। মাসি বললেন, আমি ভাবলাম আজ আর এলিই না বুঝি

তোমরা এসেছ শুনেও আমি আসব না। একটু দেরি হয়ে গেল অবশ্য—

একটু ...মায়ের ঠাণ্ডা বিরক্তি, দেরিটা হল কেন?

বাড়িতে লোক এসে গেল।-এক নিশ্বাসে মাসির যাবতীয় খবরাখবর নিয়ে অর্চনা উঠে দাঁড়াল।-বাবা কোথায় মা? ওপরে? মাসিমা, আমি আসছি

.

কিছুটা হেঁটে এসে সুখেন্দু ইশারায় একটা ট্যাক্সি থামাল।

অর্চনা অবাক। বাবা বাড়ির গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, নেয়নি। বাবার সঙ্গে গল্প করে, বরুণা আর বউদির সঙ্গে হৈ-চৈ করে, ঘণ্টাখানেক বাদে নিচে নেমে মানুষটার মুখের দিকে চেয়েই অর্চনা বুঝেছিল গোযোগর ব্যাপার কিছু ঘটেছে। কিন্তু মাসি-মেসোর সামনে কি আবার হতে পারে। জামাই শরীর ভাল নেই বলে চাটুকুও মুখে দিল না, তাই তারা চিন্তিত। অর্চনাকে দেখে মাসি বলেছেন, একজন ডাক্তার-টাক্তার দেখা–এই বয়সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হলে চলবে কেন?

অর্চনা আরো খানিক বসে মাসির সঙ্গে গল্প করত হয়তো, কিন্তু তাকে দেখেই সুখেন্দু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাবা গাড়ি নিয়ে যেতে বলায় মাথা নেড়েছে, গাড়ির দরকার নেই, হাঁটবে একটু

ও-পাশে ধার ঘেঁষে বসে আছে। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে অর্চনা বারকতক জিজ্ঞাসা করেও কি হয়েছে জবাব পায়নি। এখনো চুপচাপ রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে। খানিক অপেক্ষা করে আবারও সেই এক কথাই জিজ্ঞাসা করল, এরই মধ্যে কি হল? অ্যাঁ?

গম্ভীর মুখে সুখেন্দু একবার তার দিকে ফিরে তাকাল শুধু!

কথা বলছ না কেন? বলবে তো কি হয়েছে?

কিছু না।

কাছে সরে এসে অর্চনা হাত ধরে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করল তাকে। –বা রে! কিছু না বললে আমি বুঝব কি করে? সেই থেকে ভাবছ কি?

সুখেন্দু ঘুরেই বসল। বলল, ভাবছি আমার মত এমন একজন গরীব মাস্টারের হাতে তোমার মা তোমাকে কেন দিলেন?

ঠাট্টার সময় হলে অর্চনা ফিরে বলত, মা দিতে যাবে কেন–। কিন্তু এখন হতভম্ব। –তার মানে...মা কিছু বলেছে?

যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায়। রাগ আর ক্ষোভে গলার চাপা স্বর ব্যঙ্গের মত শোনাল।–আমি শিগগিরই ভাইস-প্রিন্সিপাল হব, থিসিস লিখছি, বিলেত যাব, ফিরে এসে প্রিন্সিপালও হব–তোমার মায়ের মুখে এসব শুনে তোমার মাসিমা মেসোমশাই অবশ্য খুশী হয়েছেন।

এবারে গোটা ব্যাপারটা অনুমান করা গেল। খানিক চুপ করে থেকে অর্চনা বিব্রত মুখে হাসতেই চেষ্টা করল একটু।-তুমি এভাবে নিচ্ছ কেন, আপনজনের আশাও তো করে...
এ-রকম আশা তুমিও করো বোধ হয়?
হঠাৎ উষ্ণ হয়ে সুখেন্দু ঘুরে বসল আরো একটু, আশা করে কি না তাই যেন দেখল। অর্চনা নিরুত্তর।

এর নাম আশা নয়। আমি গরীব মাস্টার, এটা তোমার মায়ের সেই লজ্জা ঢাকার চেষ্টা।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে সশব্দে দরজা খুলে নেমে এসে ভাড়া মেটাল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।
অর্চনার নিরুপায় অস্বস্তি আবারও হাসির মত দেখাচ্ছে।

৬. বড় ক্ষতও আপনি শুকোয়

০৬.

অনুকুল অবকাশে অনেক বড় ক্ষতও আপনি শুকোয়। এই ছোট ব্যাপারটা দুদিনেই মিটে যাবার কথা। যেতও হয়তো। সুখেন্দুব রাগ আর জেদ বেশি, দুদিনের জায়গায় না-হয় দশদিন লাগত। কিন্তু কাঁচা ক্ষতর ওপর বার বার ঘষা পড়লে ছোট ব্যাপারও দুষিয়ে বিষিয়ে বিষম হয়ে ওঠে। মেয়ের সংসারটিকে যুগের আলো-বাতাসে টেনে ভোলার শুভ তাড়নায় মিসেস বাসু প্রায় নির্মম। মেয়ে একটা ভুল করে ফেলেছে বলেই তার সংসারযাত্রা সুনির্বিঘ্ন করে দেওয়ার দায়িত্ব যেন আরো বেশি। এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টাটা আর একদিকে কেমন লাগছে সেটা তিনি বুঝলেন না বা বুঝতে চেষ্টাও করলেন না।

মেয়ের বাড়িতে একটা টেলিফোন আনার তোড়জোড় অনেকদিন ধরেই করছিলেন তিনি। টেলিফোনের অভাবে অর্চনার কতটা অসুবিধে হচ্ছে সেটা ভাবেননি। নিজের অসুবিধে দিয়েই মেয়ের অসুবিধেটা বড় করে দেখেছেন। অযাচিত ভাবে হুটহুট করে মেয়ের বাড়িতে কত আর আসা যায়, একটা টেলিফোন থাকলে অনেক ঝামেলা বাঁচে।

কিন্তু টেলিফোন চাই বললেই টেলিফোন মেলে না আজকাল। এর জন্যে তদবির তদারক যা করা দরকার তিনিই করেছেন। খরচাপও সব তারই। টেলিফোনের স্যাংশান পাওয়া গেল সেই রাত্রে বোনকে জামাই দেখানোর কয়েকদিনের মধ্যেই। সেইদিন জামাই কি

মন বা কি মেজাজ নিয়ে গেছে সেটা তাঁর পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব না। আপাতত টেলিফোন এনে ফেলতে পারার কৃতিত্বে বিভোর তিনি।

সুখেন্দু খবরটা জানল, টেলিফোন অফিসের লোক এসে যখন বাড়ি দেখেশুনে গেল তখন।

জনাকতক লোক বাড়ির সামনেটা অনেকটা খুঁড়ে ফেলেছে। গর্তের ভিতর দিয়ে টেলিফোনের তার বাড়ির দিকে গেছে। অর্চনা পাশের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। টেলিফোন একটা এলে মন্দ অবশ্য হয় না, কিন্তু সুখের নিস্পৃহতায় খুব স্বস্তিবোধ করছে না। এই কটা দিনের মধ্যে আগের মত হাসিমুখে কথাও বলেনি তার সঙ্গে। তারপর মায়ের এই টেলিফোন আনার ব্যবস্থাপত্র দেখে একেবারে চুপ।

পিসিমাও রাস্তা খোঁড়ার ব্যাপারটা আজই নতুন দেখলেন। গঙ্গাস্নান পুজো-আর্চা নিয়ে থাকলেও তার চোখে বড় এড়ায় না কিছু। ক'দিন ধরেই ছেলের ভাবগতিক অন্যরকম লক্ষ্য করছেন। সেদিনও সকালে গন্যমান সেরে ওপরে উঠে দেখেন, গম্ভীর মনোযোগে বসে কাগজ পড়ছে সে। কি ভেবে ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে সুখেন, বাড়ির সামনেটা ওরকম খুঁড়ে ফেলেছে কেন?

সুখেন্দু মুখের সামনে থেকে কাগজ সাল।–টেলিফোন আসছে।

টেলিফোন! আমাদের এখানে?

সে রকমই তো শুনছি। মুখের ওপর খবরের কাগজ তুলল আবার।

টেলিফোন আসছে সুখবরই, তা বলে ছেলের মুখ ও-রকম কেন পিসিমা বুঝে উঠলেন না। চুপচাপ একটু নিরীক্ষণ করে ফিরে এলেন তিনি। পাশের ঘরের জানালার কাছে অর্চনাকে দেখেছিলেন, বারান্দার এ-মাথায় এসে কি ভেবে ডাকলেন তাকে।...মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে অর্চনা কাছে এসে দাঁড়াল।

বাড়িতে নাকি টেলিফোন আসছে? খুশী মুখেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

হ্যাঁ পিসিমা, উঠে পড়ে লাগতে হয়ে গেল, এত সহজে হয় না।

পিসিমা হেসে বললেন, খুব ভাল হল, দুই বেয়ানে সারাক্ষণ দুদিক থেকে টেলিফোন কানে দিয়েই বসে থাকব।

অর্চনাও হাসল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু হাসিটা তেমন সহজে আসছে না। বলল, মা হয়তো এসে পড়বেন এক্ষুনি।

তাই নাকি! তোমার মা পারেন, আমাদের মত জবুথবু নন। একটু থেমে হঠাৎ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বউমা, আজ কদিন ধরেই সুখেনকে যেন কেমন কেমন দেখছি–কি হয়েছে? শরীরটরির ভাল তো?

অর্চনা বিব্রতমুখে জবাব দিল, ভালই...।

যাক, আমার ভাবনা হয়েছিল। যে রাগ-চাপা ছেলে। ভাল কথা, বেয়ানকে না খাইয়ে ছেড়ো না কিন্তু, আমি দেখি ওদিকে ওরা কি করছে

তিনি চলে গেলেন। অর্চনা পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে দেখে খবরের কাগজের দু-পাট খুলে সেই একভাবেই মুখ আড়াল করে বসে আছে মানুষটা। খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। এই ভাবগতিক আর বেশি বরদাস্ত করতেও ভাল লাগল না তার। এগিয়ে এসে আলমারির মাথা থেকে আর একটা পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। তারপর অন্য হাতে কোণ থেকে মোড়াটা তুলে পা টিপে সুখেন্দুর ঠিক সামনে রেখে মুখোমুখি বসল।

সুখেন্দুর হাতের কাগজ নড়ল এবার। কাগজ সরিয়ে দেখে, ঠিক তারই অনুকরণে অর্চনা দু-হাতে মুখের সামনে কাগজ মেলে সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে আছে।

ভুরু কুঁচকে দেখল একটু, তারপর আবারও কাগজ পড়ায় মন দিল–

মুখের সামনে থেকে এবারে অর্চনা আস্তে আস্তে কাগজ সরিয়ে তাই দেখে নিজের হাতের কাগজটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর খপ করে সুখেন্দুর কাগজ ধরে এক টান। কাগজটা ছিঁড়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে অর্চনা জিব কাটল। তার পরেই জোর দিয়ে বলে উঠল, বেশ হয়েছে পিসিমা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করছিলেন তোমার কি হয়েছে! মা সেই কবে কি না কি একটা কথা বলেছে, তুমি এখনো তাই ধরে বসে আছ!

সুখেন্দু নিস্পৃহ জবাব দিল, আমি কিছুই ধরে বসে নেই।

তবে? ও, টেলিফোন!

জবাব না দিয়ে সুখেন্দু খবরের কাগজে চোখ রাখল।

তোমার আপত্তি সে কথা তুমি মাকে বলে দাওনি কেন? ক'মাস ধরেই তো শুনছ টেলিফোনের কথা–

সুখেন্দু বলল, তোমার মা টেলিফোন আনছেন তোমার সুবিধের জন্য, আমি আপত্তি করতে যাব কেন?

বিরক্তিতে অর্চনা মোড় ঠেলে উঠে দাঁড়াল একেবারে।– দেখ, এই জন্যেই তোমার উপর আমার রাগ হয়–আমার সুবিধে কি অসুবিধে সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারতে–আমি কি বাইরের কেউ?

বোঝাপড়াটা ঠিকমত করে ওঠার অবকাশ পাওয়া গেল না। নিচে গাড়ি থামার শব্দে মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা। অচন। অনুনয় করল, এভাবে বসে থেকো না, লক্ষ্মীটি, ওঠো–

বাইরের মাটি খোঁড়ার কাজ দেখতে দেখতে হৃষ্টচিত্তে মিসেস বাসু ভিতরে ঢুকলেন। পিসিমা নিচে ছিলেন, টের পেয়ে চাবির গোছা বাঁধতে বাঁধতে হাসিমুখে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন।-নমস্কার বেয়ান, আসুন–আপনি আসছেন বউমা বলেছে।

ওভাবে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধাটাও মিসেস বাসুর চোখে বিরক্তিকর। আর কার চাবি কে আঁচলে বাধে ভিতরে ভিতরে হয়তো সেই খেদও একটু। আপ্যায়নের জবাবে মাথা নাড়ালেন কি নাড়ালেন না।–অর্চনা কোথায়?

দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে অর্চনা নেমে আসছে আর ওপরের রেলিং-এর মাথায় সুখেন্দু দাঁড়িয়ে। পিসিমা হাসিমুখে বললেন, এই তো–আমি একটু আগে বউমাকে বলছিলাম টেলিফোন এলে দু-বেয়ানে দু-দিক থেকে টেলিফোন কানে দিয়ে বসে থাকব।

মিসেস বাসু একবার শুধু তাকালেন তার দিকে, পরে মেয়ের দিকে ফিরলেন। নীরব তাচ্ছিল্যটুকু এমনই স্পষ্ট যে পিসিমা বিব্রত মুখে ওপরের দিকে চোখ তুলে দেখেন সুখেন্দুও তাঁর দিকেই চেয়ে আছে।

মিসেস বাসু মেয়েকে বললেন, কোথা দিয়ে কি হবে না হবে দেখতে এলাম–

অর্চনা বাধা দিল, আচ্ছা সে-সব হবে'খন, তুমি ওপরে চলো।

তুই হড়বড় করিস না, দেখতে শুনতে বুঝতে দে–

দেখতে শুনতে বুঝতে বুঝতে অর্চনার পাশ কাটিয়ে আগে আগেই ওপরে চললেন তিনি। সুখেন্দু সরে গেছে। অর্চনা এবং তার পিছনে পিসিমাও পায়ে পায়ে উপরে উঠতে লাগলেন। একটু আগের উপেক্ষা সত্ত্বেও গৃহকত্রী হিসাবে পিসিমা নিচের থেকেই সরে যেতে পারলেন না।

ওপরে উঠেই সামনের দেয়ালের বারান্দায় টাঙানো চিত্রিকরা কুলো, উবুড় করা ডাল। আর পেরেকে ঝোলানো জপের মালার দিকে চোখ পড়তে মিসেস বাসু থমকে দাঁড়ালেন। টেলিফোন প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন, চোখে যেন হুল ফুটছে তার। এ-সব সামগ্রী কার জেনেও রাজ্যের বিরক্তিতে মেয়ের উদ্দেশেই বলে উঠলেন, ও কি রে! এখনো সেই ডালা কুলো

মালা? সেই কবে না এগুলো এখান থেকে সরাতে বলেছিলাম তোকে–কি যে রুচি তোদের বুঝি না, বাইরের লোক দেখে ভাবে কি?

ত্রস্তে ঘাড় ফেরাল অর্চনা। পিসিমা তার পিছনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় সঙ্কোচে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, আঃ মা–চলো, ঘরে চলো—

তাঁকে একরকম ঠেলে নিয়েই ঘরে ঢুকে গেল সে। হতভম্ব মূর্তির মত পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন আরো কিছুক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দেয়ালের পেরেক থেকে মালাটা তুলে নিলেন। শ্লথ পায়ে বারান্দার মাথায় নিজের ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। অতিথি আপ্যায়নে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই বুঝে নিয়েছেন। এক কোণে হরিয়া বসে পূজোর বাসন মুছে রাখছিল। তাকে বললেন দেয়াল থেকে ওই ভাল কুলো নামিয়ে তার ঘরে রেখে আসতে।

ওগুলো ওখানেই থাকবে।

চকিতে ফিরে তাকালেন পিসিমা। তারই ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সুখেন্দু। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করাও লজ্জার, পিসিমা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে সরে গেলেন।

অর্চনাও মায়ের ওপর যথার্থ ই বিরক্ত হয়েছে। এসেই এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসবে ভাবেনি। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ক্ষুব্ধ অস্বস্তিতে বলে উঠল, ছি ছি ছি, পিসিমা কি ভাবলেন বলো তো?

পিসিম। যাই ভাবুন, মায়ের চোখে মেয়ের এই সঙ্কোচটাই বেশি দুর্ভাবনার কারণ।–তুই চুপ কর, পিসিমার মুখ চেয়ে আমাকে কথা বলতে হবে?

মুখ চেয়ে কথা বললে ক্ষতিটা কোথায় সেটা মাকে বোঝানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা। অর্চনার বিরক্তি বাড়লো আরো।–কি দরকার মা তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর, এমন এক একটা কাণ্ড করে বসো তুমি লজ্জায় মাথা কাটা যায়। হুট করে একটা টেলিফোন এনে বসলে–এই সেদিন মাসিমার কাছে প্রিন্সিপাল হওয়া-টওয়া নিয়ে কিসব বলেছ–

আগের সঞ্চিত ক্ষোভটাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অবোধ মেয়ের কথা শুনে মিসেস বাসু অবাক প্রথমে। মাসিমা অর্থাৎ বোনের কাছে কি বলেছিলেন তাও মনে পড়েছে।-ও... এই নিয়েও তোকে কিছু বলেছে বুঝি? মেয়ের দিকে চেয়ে জামাইয়ের সাহসের পরিমাণটা আঁচ করতে চেষ্টা করলেন তিনি। তার পর চাপা রাগে কিরে ধমকেই উঠলেন প্রায়, মাসিমার কাছে যা বলেছি তাই যাতে হয় সেই চেষ্টা কর–এই চারশ টাকাতেই দিন চলবে ভাবিস?

সুখেন্দু ঘরে ঢুকল। মায়ের কথা কানে গেছে সেটা তার দিকে একবার চেয়েই অর্চনার অনুমান করতে ভুল হল না। আর জামাইকে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই একটু সমঝে দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন মিসেস বাসু। স্পষ্ট অথচ মোলায়েম করে বললেন, এই যে সুখেন্দু, সেদিন তোমার মাসি-শাশুড়ীর কাছে কি বলেছি না বলেছি তাই শুনে নাকি রাগ করেছ শুনলাম।

আঃ, মা-রাগের কথা তোমাকে কে বলল?

বাধা পেয়ে মা বিরক্ত চোখে মেয়ের দিকে শুধু তাকালেন একবার, তার পর জামাইয়ের দিকে ফিরলেন।-যা বলি তোমাদের ভালর জন্যেই বলি। তোমাকেও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, আর ওকেও ওর সংসার বুঝে নিতে হবে–তোমাদের সংসার চিরকাল তো কেউ আগলে বসে থাকবে না।

এ-ধরনের আভাস জামাইকে আগেও দিয়েছেন তিনি। অর্চনার নিরুপায় অবস্থা। মিসেস বানু উঠে জানালার কাছে পানের কুঁচি ফেলতে গিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমস্যার সমাধান চোখে পড়ল যেন।–এই তো রে অর্চনা, এখান দিয়েই তো টেলিফোনের লাইনটা সবাসবি তোদের ঘরে আসতে পারে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সুখেন্দু আলনা থেকে জামা টেনে নিয়ে গায়ে পরছে। আর অস্বস্তি নিয়ে তাই দেখছে অর্চনাও। উনি ফিরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। কর্তব্যবোধে যেটুকু বলা হয়েছে তার জন্য একটুও চিন্তিত নন। বললেন, ভাল কথা, সামনের শুক্রবার তো ছুটি তোমাদের? সেদিন দুপুরে আমাদের ওখানেই খাবে, অর্চনাকে নিয়ে একটু সকাল সকালই যেও, বরুণা বলে দিয়েছে। বিজুই খাওয়াচ্ছে অবশ্য, কন্টাক্ট সাপ্লাই করল একটা

দুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুখেন্দু খুব শান্ত মুখে বলল, আমাদের যেতে হলে পিসিমাকে বলে যান।

মিসেস বাসু কথাটা শুনে যে-ভাবে তাকালেন, যেন মুখের ওপর ঠাস করে অপমান করা হল তাকে। প্রথমে অবাক, পরে ক্রুদ্ধ। সুখেন্দু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বারান্দার সিঁড়ির

দিকে এগিয়ে গেছে। চকিত বিমুঢ় নেত্রে অর্চনা একবার সেদিকে আর একবার মায়ের রক্তিম মুখের দিকে চেয়েই উঠে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো। সুখেন্দু অর্ধেক সিঁড়ি নেমে গেছে।

তুমি বেরুচ্ছ নাকি?

সুখেন্দু ঘুরে দাঁড়াল, তার দিকে শুধু তাকাল একবার, তার পর নিচে নেমে গেল।

অর্চনা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

.

এইটুকু সংসারে খুশীর বাতাস ক্রমশ যেন কমে আসছে। দিনে দিনে অনভিপ্রেত ছায়া পড়ছে একটা।

অর্চনা চেষ্টা করে আগের সেই আনন্দ-ছোঁয়া দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতে। কিন্তু সেটা আর সহজ হয়ে উঠছে না খুব। শাশুড়ীর নির্দেশমত না হোক, সুখেন্দু রোজগার বাড়ানোর ব্যাপারে সচেতন হয়েছে ঠিকই। সকালে সপ্তাহে তিনদিন এম. এ-র ছাত্রী পড়াত, বিকেলেও তিনদিন তিনদিন করে আরো দুটি কলেজের ছাত্রের ভার নিয়েছে। প্রাইভেট কলেজের মাস্টার, সেদিক থেকে কোন বাধা নেই।

ট্যুইশন সেরে ফিরতে তার রাত হয় প্রায়ই। চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া সেরে তার পরেও বই নিয়ে পাশের ঘরে পড়তে বসে যায়। ইদানীং পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। বেশ রাত

করেই শুতে আসে। অচর্না জেগে কি ঘুমিয়ে ভাল করে লক্ষ্যও করে না। শুয়েই ঘুম। অর্চনার এক-একদিন ইচ্ছে করে ঠেলে তুলে দিতে–এই মেজাজ নিয়ে বিছানায় গা ঠেকাতে না ঠেকাতে এমন ঘুম আসে কি করে ভেবে পায় না। ইজিচেয়ারে বই পড়তে পড়তেও ঘুমিয়ে পড়ে এক-একদিন। অর্চনা ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। আর বলেও, সুবিধে যদি হয় তোমার বিছানাটা কাল থেকে এ-ঘরেই করে দেব না হয়।

পিসিমা লক্ষ্য করেন সবই। কোথাও একটা গোযোগ শুরু হয়েছে সেটা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন। ছেলে বেশির ভাগই চুপচাপ, বউয়ের মুখেও আগের সেই হাসি লেগে নেই। তার মায়ের সেদিনের সেই বিসদৃশ ব্যবহার মন থেকে ঝেড়েই ফেলেছিলেন তিনি। কিছুটা সুখেন্দুর হাব ভাব দেখে, কিছুটা বা বউয়ের প্রতি মমতায়। এই ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই গুরুদেবের সঙ্গ ধরে দিনকয়েকের জন্য কাশী যাবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। অর্চনা একটু চুপ করে থেকে শেষে বলেছে, তার থেকে আমাকেই বিদেয় করে দিন পিসিমা!

বালাই-ষাট! পিসিমা হকচকিয়ে দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে শেষে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। শেষে রাগ করে বলেছেন, আর কখনো যেন তোমার মুখে এ-কথা না শুনি বউমা। তুমি যে কি, জানলে আর এমন কথা মুখেও আনতে না। তোমার শাশুড়ীর ওই ছবিটার দিকে চেয়ে দেখো!

তিনিই শুধু মনে কোন ক্ষোভ রাখেননি। এমন কি অর্চনার মায়ের ওপরেও না। ভেবেছেন আধুনিক শিক্ষিত মহিলা, এসব সেকেলে ব্যাপার...চোখেও হয়তো সত্যিই

লাগে-তাই বলে ফেলেছেন। না বলে মনে মনে পুষে রাখলে কি আরো ভাল হত–তাকে উদ্দেশ করে হয়তো কিছুই বলেননি।

মায়ের কাছে জামাইয়ের তিন-তিনটে টুইশনের খবর অর্চনা বলেনি। তবু জানতে বাকি নেই তার। অন্তর্দাহ তাঁরও দিনে দিনে আরো পুষ্ট হচ্ছে বই কমছে না।

কারণও আছে।

এই দেড় বছরে বিজন আর ননিমাধবের ব্যবসা বলতে গেলে তিনগুণ স্ফীতি লাভ করেছে। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যটা মহিলার প্রত্যক্ষভাবে যেমনই আনন্দের কারণ, পরোক্ষভাবে তেমনই অনুশোচনার উৎস-ব্যবসায়ের অর্ধেক মালিক ননিমাধব ছেলেটা একেবারে হাতের মুঠোয় ছিল। কেন জোর করেই বিয়েতে বাধা দেননি, সেই পরিতাপটা তিলে তিলে বাড়ছে এখন। এমন কি, বিজনও তার মনের কথা বুঝেই যেন আপসোস করেছে, বাবার আর দুটো দিন সবুর সইল না, দেখলে তো...

ননিমাধব যত বড় আঘাতই পাক, এ বাড়ির সংস্রব ত্যাগ করেনি। এখনো অর্চনাকে দেখলে মুখে তার রুমাল ওঠে, সন্তর্পণে বড় নিশ্বাস ফেলে। মিসেস বার চোখ এড়ায় না, সখেদে নিশ্বাস ফেলেন তিনিও। মনে মনে ভাবেন, যেমন কপাল– সম্ভব হলে বরুণার সঙ্গেই বিয়ে দিতেন। কিন্তু তা হয় না, বরুণা বি. এ. পড়লেও অর্চনার থেকে চার বছরের ছোট। বয়েসের অনেক তফাত হয়ে যায়। সেটা বিজনই মাকে বলেছে। মন বোকর জন্য বরুণার বিয়ের ভাবনাটা প্রকারান্তরে ননিমাধবকে একদিন শুনিয়েছিল সে।

ননিমাধব বলেছে, বরুণা ছেলেমানুষ, অল্পবয়সী একটি ভাল ছেলে খোঁজ করা দরকার। খোঁজটা সেও করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

ব্যবসায় এমন আচমকা শ্রীবৃদ্ধির ফলেই নিজের জামাইকে আরো বেশি অকর্মণ্য মনে হয়েছে মিসেস বাসুর। তার ওপর এই টুইশনের খবর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত। তার মতে এ-ও নিশ্চেষ্টতার নজির ছাড়া আর কিছু নয়। জ্বালাটা গোপন করা সম্ভব হয় নি তার পক্ষে। কখনো টেলিফোনে কখনো বা সামনাসামনি মেয়েকে বলেন, এভাবে বাড়ি বাড়ি ছেলে পড়িয়েই কাটবে তাহলে, কেমন?

রাগের মাথায় অর্চনা ফিরে মাকেই পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়, আবার যার জন্যে বলা ঘরে এসে এক-একদিন তার সঙ্গেও বোবাপড়া করতে ছাড়ে না। এরই মধ্যে একদিন বাবাও তাকে ডেকে বলেছেন, সুখেন্দুর অত খাটুনির দরকার কি, খরচপত্র খুব বেশি নাকি রে? দরকার হলে আমার কাছ থেকে কিছু কিছু নে না–বিজু তো টাকা-পয়সা দিচ্ছেই এখন, কোন অসুবিধে হবে না।

নিরুপায় ক্ষোভে অর্চনা জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি এসেছিল সেদিনও। রাগ বাবার ওপরে নয়, তিনি সাদা মনেই বলেছেন জানে। রাগ মায়ের ওপর, তার গঞ্জনাতেই বাবা ভুল বুঝে বলেছেন। দাদার সামনে বউদির সামনে বরুণার সামনে অর্চনা অনেক কষ্টে সামলেছে নিজেকে, আর বাড়ি এসেই ফেটে পড়েছে একেবারে তুমি এসব ছেলে-পড়ানো মেয়ে-পড়ানো ছাড়বে কি না?

জবাবে সুখেন্দু উঠে গিয়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট তার সামনে ফেলে দিয়ে বলেছে, তোমার মাকে দিয়ে দিও।

অর্চনা চুপ একেবারে। আগের দিনই মা কি এক চ্যারিটি শো-এর টিকিট পাঠিয়েছেন দুটো।

নতুন কিছু নয়। উঁচু-মহলের পরিচিত জনের রিলিফ-ফাণ্ড চ্যারিটি শো, অথবা অন্য কোন নিয়মিত উৎসবের টিকিট বিক্রি করতে এলে আত্মসম্মানের তাগিদে মা নিজের জন্য তো বটেই, তাদের অনুরোধে মেয়ে-জামাইয়ের জন্যেও টিকিট না কিনে পারেন না। অবশ্য মেয়ে-জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা না নেবার কথা ভেবেই টিকিট কেনেন তিনি। কিন্তু প্রতিবারেই মেয়ের কাছ থেকে হাত পেতে তাকে টাকা নিতে হয়। প্রথম যেবার নিতে চাননি, মেয়ে সেবার টাকা ক'টা একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই চলে গিয়েছিল। কারণটা অবশ্য তিনি জানতেন না। কারণ ছিল। টাকা দেবার দরকার নেই বলায় সুখেন্দু অর্চনার সামনে ঠিক ওভাবেই টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

শুধু এই ব্যাপারে নয়, মা একখানা ভাল শাড়ি কিনে পাঠালে পর্যন্ত সুখেন্দু প্রায় আদেশের সুরেই বলে, দাম জেনে দাম দিয়ে দিও। মাসকাবারে টেলিফোনের খরচটাও সে-ই যুগিয়ে আসছে, মা দেবে অর্চনা এ-কথাটা বলতেও ভরসা পায়নি। এমন কি বাড়ির গাড়ি অর্চনাকে নিতে এলেও অসন্তুষ্ট হয়, বলে, গাড়ি পাঠাতে বারণ করে দিও, ট্যাক্সিতে যাবে।

অর্চনা হাসিমুখেই বলেছে একদিন, তুমি তো সঙ্গে যাচ্ছ না–ট্যাক্সিঅলা এই ভরসন্ধ্যেয় আমাকে নিয়ে যদি নিজের খুশিমত একদিকে গাড়ি ছোটায়, তখন?

সুখেন্দু গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কেটেছে, ট্যাক্সিতে উঠেই তোমার মায়ের পরিচয়টা দিয়ে দিও আগে, তাহলে আর সাহস করবে না।

অতএব মাইনের টাকায় যে কুলোয় না সেটা ঠিকই। কিন্তু রাগের মাথায় অর্চনার সব সময় সেটা মনে থাকে না। আর থাকে না যখন সুখে এমনি শান্ত অথচ রূঢ়ভাবেই খরচের দিকটা স্মরণ করিয়ে দেয় তাকে। অর্চনা ভাবে মাকে নিষেধ করে দেবে এভাবে যেন খরচ না বাড়ান তিনি। কিন্তু পারে না, তাতে করে বাড়ির সকলেই আরো একটু করুণার চোখে দেখবে। তাছাড়া এ-সংসারের কল্পিত অনটনের ক্ষোভটাই মা ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় করে তুলবেন আরো।

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল আবারও। বিজনের জন্মদিন উপলক্ষ সেটা। একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও এবারে এই দিনটার সার্থকতা একটু অন্যরকম। বিজনের কাছে তো বটেই, তার মায়ের কাছেও। ইতিমধ্যে বিজনেরও একখানা গাড়ি হয়েছে, সেই গাড়ি চড়ে ননিমাধবকে নিয়ে আগের দিন সে নিজেই এসে অর্চনাকে বলে গেছে। সুখেন্দু বাড়ি ছিল না, সকালের ট্যুইশন সারতে বেরিয়েছিল।

অর্চনা খুশী হয়েছিল। তাদের বাড়িতে ননিমাধবের সেই প্রথম পদার্পণ। তাকে হাসিমুখে আদর-আপ্যায়ন করেছে। দাদাকে বলেছে, তুমি হোমরাচোমরা মানুষ এখন, নিজে নেমন্তন্ন করতে এসেছ, যাব না বলে কি?

চেষ্টা-চরিত্র করে ননিমাধব বলেছে, আজকাল তো তেমন আসোটাসো না

অর্চনা তক্ষুণি জবাব দিয়েছে, আমাদের তো আর আপনাদের মতো দুজনের দুটো গাড়ি নেই, ইচ্ছে থাকলেও যখন-তখন যাই কি করে! আর বলেছে, আপনি আসতে খুব খুশী হয়েছি, একদিনও তো আসেননি!

এর পর তার পকেটের রুমাল আর পকেটে থাকেনি। অর্চনা তার দিকে চেয়ে সকৌতকে মন্তব্য করেছে, টাকাই করুন আর গাড়িই করুন, সাইকেল-রিকশর ব্যবসায় কিন্তু আপনাকে মানায় না।

পার্টনারের মুখের অবস্থা দেখে বিজনের পর্যন্ত হাসি পেয়ে গিয়েছিল। যাবার আগে আবারও বলেছে, যাস কিন্তু তোরা তাহলে, সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা হল না–

দেখা হল না বলেই অর্চনা ভিতরে ভিতরে স্বস্তিবোধ করছে। এসেই চান করে কোনরকমে দুটি মুখে দিয়ে কলেজে যাবার তাড়া। সেই ব্যস্ততার মধ্যে বসে দু মিনিট কথা বলার ফুরসৎও পাবে না। অতিথিরা সেটা না বুঝে ক্ষু হতে পারে।

–আমি বল'খন। চকিতে অর্চনা কি ভেবেছে একটু।–তুমি না হয় পিসিমাকেও বলে রেখে যাও।

বিজন তাই করেছে। পিসিমা খুশী হয়ে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।

সকালে অর্চনা সুখেন্দুকে নিজে কিছু বলার অবকাশ পায়নি। তবে তাব খাবার সময় পিসিমা বলেছেন শুনেছে। অর্চনা বিকেলে বলেছে। অন্যত্র যে কোন জায়গায় যাবার কথা উঠলে সুখেন্দুর আগ্রহ অন্যরকম হত। কোথাও যাবার নাম করে অর্চনা দু-পাঁচদিন ছুটি নেবার কথা বললেও হয়তো খুশী হয়েই রাজী হয়। মাঝে-মধ্যে আশাও করেছে তার এত খাটুনি দেখে অর্চনা বলবে। প্রথম দিনের সেই একান্ত দুজনের দিনগুলির লোভ সুখেন্দুর এই একটানা নিস্পৃহতার তলায় তলায় ছড়িয়ে আছে এখনো। যাকে পেয়েছে সেটা কম পাওয়া নয় উপলব্ধি করে বলেই মনে মনে প্রত্যাশা বেশি। তাই অভিমানও বেশি। আর তাই উদাসীনতার রূঢ়তাও বেশি।

আমি যাব কি করে, কাল তো ছুটির দিন নয়!

রাত্রিতে তো—

রাত্রিতে বাড়ি বসে থাকি?

অর্চনা জোর দিয়ে বলেছে, একটা দিনের ব্যবস্থা করে নাও-ও-কাজ তো রোজই আছে। দাদা নিজে এসে বলে গেছে, না গেলে ভয়ানক বিচ্ছিরি হবে।

সুখেন্দু গুম হয়ে বসে রইল। এ সামাজিকতার তাৎপর্য বোঝার মত সুস্থ মেজাজ নয় এখন। উল্টে ভাবল, তার কাজটা অবহেলার চোখে দেখে অর্চনাও, আর বড়লোক দাদা নিজে এসে বলে গেছে সেটাই বড় ওর কাছে।

পরদিনও কলেজে যাবার আগে রাতের নেমন্তন্নের কথা অর্চনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সুখেন্দু চুপচাপ শুনেছে, চুপচাপ কলেজে চলে গেছে। অর্চনা নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু অভিমানের সঙ্গে বিবেচনার আপস নেই তেমন। সুখেন্দু বাড়ি ফিরল একেবারে রাতের ছেলে-পড়ানো শেষ করে। আর তার পরে ট্রামে-বাসে না উঠে দেড় মাইল পথ হেঁটে এলো।

হাতমুখ ধুয়ে একটা বই নিয়েই শুয়ে ছিল, আর মনে মনে একটুখানি উষ্ণ আনন্দ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিল। এতখানি রূঢ়তার দরুন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না বলেই বোধ হয়।

পিসিমা ঘরে এলেন।–তুই গেলি না যে?

না।

না তো দেখতেই পাচ্ছি, না কেন?

মুখে বলল, আমার কাজটা ওদের কাছে কিছু না হলেও আমার কাছে কম নয়। তারা টাকা দেয়।

পিসিমা বিরক্ত হলেন।–টাকা দেয় বলে কি লোক-লৌকিকতা কিছু নেই, না হয় তাড়াতাড়িই আসতিস একটু।

আমার জন্যে তো আটকায় নি কিছু, যার যাওয়া দরকার সে গেছে–

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

যাবে না তো করবে কি, কতবার করে টেলিফোনে ডাকাডাকি-তাও তো কতক্ষণ দেরি করেছে। সন্ধ্যে থেকে ঘর-বার করেছে মেয়েটা, শেষে চোখের জল আর সামলাতে পারে না–তোর সবেতে বাড়াবাড়ি!

সঙ্গে সঙ্গে খচ করে লাগল কোথায়। এই শাস্তিই দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ঠিকমত লেগেছে জেনে ভিতরে ভিতরে এখন অনুতপ্ত একটু। বউ নেই, এই অবকাশে পিসিমা কিছু বলবেন ঠিক করেই এসেছেন। বলেও গেলেন। তোদের হল কি আজকাল আমি তো কিছু বুঝি না, তোর শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগে না বলে কি মেয়েটা বাপ-মা ভাই-বোন সব ছেঁটে ফেলে দেবে? সে তো ওই সংসারেই অত বড়টি হয়েছে, না কি, তা সত্ত্বেও এমন ভাল মেয়ে বলেই এ-ভাবে থাকে। ভাইপোকে নীরব দেখে পিসিমা আর একটু চড়লেন এবং আরো একটা খেদ না প্রকাশ করে পারলেন না।-এ-ভাবে চলিস তো নিজেদের সংসার নিয়ে নিজেরাই থাক তোর, দু'বছর হতে চলল একটা ছেলেপুলে হবার নাম পর্যন্ত নেই, মা'টা তো কাঁদতে কাঁদতে চোখ বুজেছে, আমার অত পোষাবে না। সেই বউ এলো, দেখে চোখ জুড়লো, ভাবলাম এবার সব হবে, হতভাগী ওপর থেকে দেখবে–তোদের ব্যাপারখানা কি?

ঠিক সময়টিতে বেশ ভালমতই একটা নাড়া দিয়ে গেলেন পিসিমা। সুখেন্দু উসখুস করতে লাগল। টেবিলের ওপর টাইমপীস ঘড়িটার দিকে চোখ গেল।... ছাত্রের বাড়ি থেকে হেঁটে না এলেও যাওয়া যেত। এখন গেলে হয়তো দেখবে অর্চনা রওনা হয়ে গেছে। অন্যমনস্কতার ফাঁকে মায়ের ছবিটাই নজরে পড়ল। মা ওর দিকেই চেয়ে আছেন।...তার চোখেও পিসিমার অনুযোগ।

কিন্তু আর একদিকের মেঘ তখন ঈশান-কোণে। ওতে শুধু ঝড়ের উপকরণ। অত্যন্ত কাছের মানুষ অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় দূরে ঠেলে দিলে যে অপমান, সেই অপমানের যাতনা নিয়ে অর্চনা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ফিরেছে তারও চারগুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে।

বাপের বাড়িতে পা দিয়েই একটা আলগা খুশীর আবরণে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেছে সে। বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, দাদার জন্মদিন উপলক্ষে ঘরের আগের চেহারা বদলে গেছে, দামী সোফা-সেটি এসেছে। মাঝখানের টেবিলে বড় একটা কাচের চৌবাচ্চার ওপর ঝুঁকে রঙিন মাছের খেলা দেখছে দাদা বউদি বরুণা আর ননিমাধব। চৌবাচ্চার জলের ভিতর ইলেকট্রিক বা ফিট, করা, সেই আলোয় চৌবাচ্চাটা ঝকঝক করছে। ওপর থেকে বউদি খাবারের গুড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে বোধ হয়।

সকলের অগোচরে অর্চনা পা-টিপেই বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগোলে। এক্ষুনি আর-একজনের না আসার জেরার মুখে পড়তে চায় না। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে খাবার-দ্বয়ের দিক থেকে মায়ের তপ্তক কানে এলো। বকাবকিটা দাঁতর উদ্দেশে সন্দেহ নেই। এক মুহূর্ত থেমে অচলা চুপচাপ ওপরে উঠে গেল। উদ্দেশ্য, সকলকে একটু অবাক করে দেবার জন্য একেবারে বাবাকে নিয়ে নামবে। আসলে বাবার একটুখানি ছায়া কাম্য নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করতে চায় না। বাবার কাছে থাকলে এক মা ছাড়া আর সকলের অন্তত মুখ বন্ধ। আর দরকার হলে মাকে মুখ বন্ধ করতেও শুধু তিনিই পারেন।

ওপরে এসে দেখে বাবার ঘর ফাঁকা। অর্চনা অবাক, নিচেও তো দেখল না। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখল একটু। ওপরে নেই। বাবার বিছানাতেই এসে বসল আবার। তাকে না পেয়ে তার কাছে আসার দুর্বলতাটা নিজের চোখেই ধরা পড়ে গেছে হয়তো। ঘরের সর্বত্র অযত্নের ছাপ, অর্চনা সেই কারণেই যেন উষ্ণ হতে চেষ্টা করল। বরুণার ওপরেই চটে গেল, অতবড় মেয়ে করে কি। শেষবার ঘর গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মাস দুই আগে, তার পর আর বোধ হয় হাত পড়েনি। তাকের উল্টো-পাল্টা বইগুলি ঠিক করে রাখল, টেবিলটাও হাতে হাতে গোছাল একটু। কিন্তু এভাবে ওপরে এসে বসে থাকাটা বিসদৃশ। মুখে একটা হালকা ভাব টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে ওপরেই দাশুর সঙ্গে দেখা। কিছু একটা হুকুম তামিল করতে এসেছিল বোধ হয়। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

তাকে দেখে দাশু সানন্দে এক কথার জবাবে অনেক কথা জানিয়ে দিল। যথা দিদিমণিরা এলো না ভেবে মা বহুক্ষণ ধরেই ফাটছিলেন, সেই অবস্থায় বাবু ওকে চুরুট কিনে নিয়ে আসার কথা বলতে মা বাবুকেই দাবড়ে দিলেন, আর ওকে হুকুম করলেন কাজে যেতে। দাশুর অবশ্য হাতে তেমন কাজ নেই, কিন্তু সেটা আর তাকে বলে কেমন করে? বাবু নিজেই চুরুট আনতে গেছেন।

অর্চনা দাশুর ওপরেই রেগে গেল হঠাৎ।–চুরুট ফুরিয়েছে দেখে আগে থাকতে এনে রাখতে পার না? বাক্স থেকে সরাতে তো খুব পারো।

এ-সব অনুযোগ গায়ে মাখার লোক নয় দাশু। গলা খাটো করে প্রায় উপদেশই দিল, তুমি নিচে যাও তো, ওদিকে তোমার কথাই হচ্ছে।

কিন্তু নিচে বসার ঘরে কথা যা হচ্ছে তার একটুখানি কানে আসতে অর্চনা দরজার এধারেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অপমানের আঘাতে নিস্পন্দ। কারো কোন কথার জবাবে মায়ের নিদারুণ বিরক্তি।–কি জানি আসবে কি আসবে না, মাসের শেষ, হয়তো হাতে কিছুই নেই–আসতে হলেও তো একটা কিছু অন্তত

মা ওটুকু বলেই থেমেছেন। দাদার গলা শোনা গেছে, কি যে কাণ্ড, তা বলে আসবে না কেন?

অর্চনার মাথায় দপ করে যেন আগুন জ্বলল একপ্রস্থ। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অতিকষ্টে নিজেকে সামলাল সে। বিতৃষ্ণায় মা আজকাল অনেক সময় অনেকের সামনেই তাদের অপদস্থ করে বসে সে-আভাস অর্চনা আগেও পেয়েছে। কিন্তু সেটা যে এ-পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভাবতে পারেনি।

ঘরে এসে দাঁড়াতে বিজনই সর্বাগ্রে বলে উঠল, এই তো এসেছে! এত দেরি? সুখেন্দু কই?

সকলের দৃষ্টি দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো।

প্রথমেই অর্চনার চোখ গেল ননিমাধবের দিকে। দাদার দিকে ফিরে জবাব দিল, আসতে পারলেন না, কাজে গেছেন এখনো ফেরেননি।

তার বলার ধরনে বিজন মনে মনে অবাক একটু। বিস্ময় প্রকাশ করল, সে কি রে!

ওদিক থেকে বউদি বলে উঠল, ভারি অন্যায়, কোথায় গেছেন বলে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

অর্চনা বলল, আমরা ট্রামে-বাসেই চলাফেরা করি বউদি তাঁর আসা সম্ভব নয়।

বউদি থমকে গেল। মা ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তার মানে সে আসবে না?

অর্চনা মায়ের চোখে চোখ রাখল! নিজেকে সংযত করতেই চেয়েছিল, কিন্তু সবটা সম্ভব হল না।–সে তো কারো হুকুমের লোক নয় মা, আসতেই হবে ভাবছ কেন?

রাগ ভুলে মা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মেয়ের কথাবার্তা হাব-ভাব দুর্বোধ্য। শুধু মা-ই নয়, অন্য সকলেও হকচকিয়ে গেছে। একটু। বরুণাই সর্বপ্রথম ঘরর এই থমকানি ভাবটা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গটাই বাতিল করে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এসে দিদির হাত ধরে টানল, ননিদা কি এনেছেন দেখে যা–।

লঘু আগ্রহে কাচের চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে এলো তাকে। জলের গাছগাছড়ার মধ্য দিয়ে লাল নীল হলদে সবুজ মাছগুলি খেলে বেড়াচ্ছে।

চমৎকার, না?

খুব সুন্দর। দুই এক মিনিট দেখে অর্চনা এগিয়ে এসে দাদাকে প্রণাম করল। তারপর হাত-ব্যাগ খুলে কেস থেকে ঝকঝকে একটা ফাউন্টেন পেন বার করে তার বুকপকেটে লাগিয়ে দিল।

পেনটা আবার তুলে দেখে বিজন ভারি খুশী।–বাঃ।

বরুণ সাগ্রহে এগিয়ে এলো, দেখি দাদা দেখি- পেন হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বরুণার আনন্দে যেন লোভ ঝরে পড়ল, ও মা কি সুন্দর। এর যে অনেক দাম রে দিদি, সেই যে তোতে আমাতে একবার দোকানে দেখেছিলাম–

বিয়ের অনেক আগে একবার কলম কিনতে গিয়ে এই জিনিসই একটা দুই বোনের খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু দাম শুনেই তখন সে কলম রেখে দিয়ে অন্য কলম কিনতে হয়েছে। অর্চনার মনে আছে। মনে আছে বলেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে এটাই কিনেছে।

বিজন জ্যেষ্ঠোচিত অনুযোগ করল একটু, কি দরকার ছিল তোর এত দামী জিনিস আনার!

কিছু মনে করবার কথা নয়, বরং তুষ্ট হওয়ারই কথা। কিন্তু বাইরের এক জনের সামনেই একটু আগে যে আলোচনা এখানে হয়ে গেছে, সেই ক্ষোভের মাথায় দাদার এই স্বাভাবিক অনুযোগের তাৎপর্য বিপরীত। অর্চনা হাসল একটু। মায়ের দিকে তাকাল এক পলক, পরে দাদার দিকে। তার পর নিরুত্তাপ জবাব দিল, জিনিস দামী না হলে যে দেয় তার দামও একটু কমে যায় দাদা, কিন্তু এমন কিছু দাম নয় ওটার, তবু যদি খুশী হয়ে থাকে। সেই ঢের–

বিজন বিব্রত, একটু আগে মায়ের সঙ্গে আলোচনাটা কানে গেছে কিনা চকিতে সেই সংশয় মনে জেগেছে। মাও ক্রুদ্ধনেত্রে তাকালেন মেয়ের দিকে, খোঁচাটা বোধগম্য না হবার মত অস্পষ্ট নয়। বউদি গম্ভীর। ননিমাধব রুমালে মুখ ঘষছে। বরুণা চোখ বড় বড় করে দিদিকে দেখছে।

আরো একটু বাকি ছিল।

দরজার বাইরে থেকে ডক্টর বানুর গলা শোনা গেল, অর্চনা এলো? ঘরে এসে মেয়েকে দেখে নিশ্চিন্ত।–এই তো, সুখেন্দু কই?

তিনি আসতে পারলেন না বাবা।

কেন? অবাক একটু।

জবাবটা দিলেন মিসেস বাসু। গম্ভীর শ্লেষে বললেন, সে কাজের মানুষ আসবে কি করে, তাছাড়া সে কি হুকুমের লোক আমাদের যে হুকুম করলেই আসবে।

বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় অর্চনা আরক্ত। কিছু না বুঝে ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। শেষে মেয়ের দিকে ফিরে সহজ অর্থটাই গ্রহণ করলেন।–ও, কাজে আটকেছে বুঝি?

দিদিকে খুশী করার জন্যেই হোক, পরিবেশটা একটু সহজ করার তাগিদেই হোক, বরুণা কলমটা তাড়াতাড়ি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল, দেখ বাবা কি সুন্দর কলম, দিদি এনেছে।

বাবা কলম দেখলেন। তাঁর চোখেও সুন্দরই লাগল আর দামীই মনে হল। কলমের সুখ্যাতি করে সেই সঙ্গে আর যে কথাগুলো বললেন তিনি, তার জন্য দায়ী অন্তত তিনি নন। বললেন, তুই আবার এত খরচ করতে গেলি কেন, ক'টা টাকাই বা মাইনে পায় সুখেন! বুঝেসুজে না চললে ও বেচারী সামলাবে কি করে?

এই দুর্ভাবনা বাবার মাথায় কে ঢুকিয়েছে অর্চনা জানে। হয়তো আজও এই নিয়ে কথা শুনতে হয়েছে তাকে, নইলে কলম দেখেই আগে খরচের কথাটা মনে হত না। ভিতরে ভিতরে অর্চনা বুঝি ক্ষেপেই গেল এবার। দাতে করে নিজেই ঠোঁট কামড়ে আড়চোখে ননিমাধবের দিকে তাকাল।

মিসেস বাসু স্বামীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে উঠে সোজা দরজার কাছে চলে এলেন। তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে নীরসকণ্ঠে আদেশ দিলেন, বউমা, আর রাত না করে খাবার দেবার ব্যবস্থা করো।

বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গটগট করে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

অর্চনা সকলের সঙ্গেই খেতে বসেছে। কি খেল তাও বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করেছে। খাওয়া শেষ হতেই ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বাবা গাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন, তাতেও আপত্তি করেনি। বাড়ি ফিরে ধীর শান্ত পায়েই ওপরে উঠেছে।

পিসিমার ঘর অন্ধকার। শুধু ওর ঘরেই আলো জ্বলছে।

বিছানায় শুয়ে সুখেন্দু অন্যমনকের মত দেয়ালে ছবিটার দিকে চেয়ে, বুকের ওপর একটা খোল বই উপুড় করা। বিছানার গা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের অপবাদটা আজ অন্তত প্রয়োজ্য নয়। এক পলক দেখে নিয়ে অর্চনা সোজা তার ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

সাড়া পেয়ে সুখেন্দু ফিরে তাকাল। দেখল একটু। অনুতাপ প্রকাশের ৰীতি জানা নেই তেমন, চেষ্টা করে নিছক গদ্যাকারের প্রশ্নই করল একটা, হয়ে গেল?

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অর্চনা দুল খুলছে কানের। জবাব না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শুধু একবার, তার পর অন্য দুলটা খুলল।

তার দিকে চোখ রেখেই সুখেন্দু আধাআধি উঠে বসল। ওদিকে ফিরে থাকলেও আয়নায় সামনা-সামনি আর পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণের আপসোচিত প্রতীক্ষার পর হঠাৎই খুব ভাল লাগছে সুখেন্দুর। লোভনীয় লাগছে। মেজাজের ঝোকে অনেকদিনের উপোসী চিত্তটা যেন অভীষ্টপ্রাপ্তির তটে বসেও মুখ ঘুরিয়ে ছিল। বুকের তলায় অনেক অতনু-মুহূর্ত হারানোর খেদ।

আয়নার ভিতর দিয়ে কঠিন নিস্পৃহতায় অর্চনাও লক্ষ্য করেছে তাকে। এই মুগ্ধ দৃষ্টির ভাষা জানে। একসঙ্গে বাপের বাড়ি যাবে বলে সচেতন সাজসজ্জায় নিজেকে ঘিরে প্রলোভনের প্রচ্ছন্ন মায়া একটু রচনা করেছিল বটে। কিন্তু যার জন্যে করা, তারই এই বিহ্বল দৃষ্টি-লেহন সব থেকে বেশি অসহ্য এখন। অর্চনা ভাবল, পরিপূর্ণভাবে অপমান

করতে পারার অন্তষ্টির ফলেই এই ব্যতিক্রম, সেই তুষ্টির ফলেই আর এক আনুষঙ্গিক তৃপ্তির তাগিদ। দুল টেবিলে রেখে আস্তে আস্তে ঘুরে বসল তার দিকে।

সুখেন্দু চেয়েই ছিল, অপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।–শোন–

বলো, শুনছি।

এখানে এসো না–

অর্চনা উঠে সামনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যাখ্যানের বর্ম আঁটা।

সুখেন্দু তার হাত ধরে কাছে টেনে বসিয়ে দিল। নিজের একটা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সেই আনন্দটাই বড়।–রাগ করেছ?

সেটা তো তোমারই একচেটে সম্পত্তি।

সত্যি, এমন হয়–। সুখেন্দু অস্বীকার করল না।–যাইনি বলে নিজেরই

থাক। কঠিন শ্লেষে অর্চনা থামিয়ে দিল।– তাকে কি বলবে বলো।

তার রাগের মাত্রা অনুমান করে সুখেন্দু হাসল একটু। তার পর বলল, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুসময়ে তার চোখে এই ক'টি কথার আভাস দেখতে পেলেও অর্চনার খুশী ধরত না। এখন বিদ্রুপের মত লাগল। দারুণ বিরক্তিতে শয্যা ছেড়ে উঠতে গেল।

পারল না। দুই হাতের বেষ্টনে সুখেন্দু তাকে বসিয়েই রাখল। বাপের বাড়ি থেকে অর্চনা কি মন নিয়ে ফিরেছে তার ধারণা নেই। শুধু জানে, ও যায় নি বলেই রাগ। মনোরঞ্জনের কলাকৌশল জানা থাকলে রমণী-মনের দিকটাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা করত, নিজের না যেতে পারার পিছনে নরম কৈফিয়ত কিছু খাড়া করত, আর সন্তপ্ত অনুরাগে তার ব্যথাটাই আগে নিজের বুকে টেনে নিত। কিন্তু সুখেন্দু তার ধারকাছ দিয়েও গেল না, অর্চনার অপমানটা কোথায় গিয়ে বিঁধেছে খোঁজ নিতেও চেষ্টা করল না। মেজাজের বেগটা তার যেমন আকস্মিক, আবেগের মুহূর্তও প্রায় তেমনিই অশান্ত। সঙ্গতির পথে আনাগোনা নয় কোনটারই। তাই নিঃসঙ্গতার আবরণ থেকে নিজের এই সদ্য-মুক্তিটাই বিনম্র আপসের বড় উপকরণ মনে হয়েছে। যেন সেইটুকুই অর্চনার জানবার বিষয়, আর সেইটুকুই তারও জানাবার তাগিদ।

দুই হাতের নিবিড়তার মধ্যে সুখেন্দু তাকে আরও একটু কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করল।– সত্যি, শুয়ে শুয়ে আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম... পিসিমা খানিক আগে খুব বকে গেল আমাকে। হাসতে লাগল মৃদু মৃদু, কি বলল শুনবে?

অর্চনা কঠিন, শান্ত। শোনার কোনো আগ্রহ নেই।

আরো একটু অনুকূল মুহূর্তের আশায় পিসিমার সেই নিগুঢ় বচনটি সুখেন্দু আর একভাবে প্রকাশের চেষ্টা করল।–পিসিমা মায়ের কথা বলেও অনেক দুঃখ করে গেল...মা যে তোমাকে কত চেয়েছিল জান না।

অন্য সময়ে হলে অর্চনা টিপ্পনী কাটত, মা তাকে চায়নি, মা যে কোন একটি ছেলের বউ চেয়েছিল। এখন নির্বাক চোখে শুধু তাকাল তার দিকে। স্পর্শটুকুও যন্ত্রণার মত লাগছে।

সুখেন্দু আরো একটু কাছে ঘেঁষে এলো। মুচকি হেসে চোখে চোখ রাখল। প্রায় গোপন কিছু ফাস করে দেবার মত করেই বলল, মা আরো কিছু চেয়েছিল...!

মা আরো কি চেয়েছিল অর্চনা সেটা খুব ভালই জানে। আভাসে ইঙ্গিতে কখনো বা সরাসরি পিসিমা সেটা অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আজকের দুঃসহ অপমানের পর এই একজনের মুখেই সেই কথাটা শোনামাত্র দপ করে জ্বলে উঠল একেবারে। এতক্ষণের নির্বাক সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আচমকা তার হাত ছাড়িয়ে অর্চনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল। তীব্র জ্বালায় অনুচ্চ-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কণ্ঠে বলে উঠল, থাক। চাকরি করে ও ছেলে না পড়ালে যাদের দিন চলে না, একটা কলম কিনে নিয়ে গেলেও খরচ নিয়ে পাঁচজনের উপদেশ শুনতে হয়–তাদের আর কিছু চেয়ে কাজ নেই!

এক ঝটকায় পরদা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুখেন্দু বিমূঢ়, হতভম্ব। এতবড় সমর্পণের মুখে এমন এক বিপরীত আঘাত আনুভব করতেও সময় লাগে। তড়িতাহত বিস্ময়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল সে।

.

পরদাটা নড়ছে।

বিয়ের পর ছদ্ম-অভিমানে প্রথম প্রথম এক-আধদিন সুখেন্দু ঘর-বদল আগেও করেছে।

তাতে ব্যবধান রচনার অভিপ্রায় ছিল না একটুও, বরং গাঢ়তর অনুরাগের প্রত্যাশা ছিল। অর্চনা কোনদিন উঠে এসে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে, কোনদিন আপস করেছে, কোনদিন বা নিরীহ মুখে নিজে হাতে তার বালিশ টালিস এনে দিয়ে গেছে–অসুবিধে যাতে না হয়। পাশের ঘরটা সুখেন্দুর শুধু পড়ার ঘর নয়, রাগ হলে গোসা-ঘরও।

তাকে গুম হয়ে থাকতে দেখলে হাসি চেপে কখনো-সখনো অর্চনা নিজেও জিজ্ঞাসা করত, কোথায় শোবে–এই ঘরে, না গোসা ধরে?

এবারে ঘর-বদলের সুরটাই একেবারে ভিন্ন-রাগের।

কোন মান-অভিমানের তাপ নেই, সাধাসাধির প্রত্যাশাও নেই। পাশের ঘরের চৌকিতে বায়ো-মাস একটা গালচে পাতাই থাকে। সুখেন্দু নিজের হাতেই দুটো বালিশ তুলে নিয়ে যায়, আবার সকাল হলে সে-দুটো এ-ঘরে, খাটে ফেলে দিয়ে তার পর বারান্দার দিকের দরজা খোলে। অর্চনা চুপচাপ দেখে একটি কথাও বলে না। রাগ চড়তে থাকে তারও, নির্মম মনে হয় মানুষটাকে সহ করাও সহজ নয়, সাধতে যাওয়া আরো বিরক্তিকর। কাণ্ড একটা সে-ও বাধাত, পিসিমার ভয়ে চুপ করে আছে। নিস্পৃহতার আবরণে গুটিয়ে

রেখেছে। নিজেকে।–ক'দিন চলে চলুক। পুরুষের দুর্বার তাড়নার দিকটা তার জানা আছে।

কটা দিন বাদেই অর্চনা শুনল, কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পাঁচ-সাত দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে সে। সুখেন্দু নিজে বলেনি, পিসিমা তাগিদ দিয়েছেন, ওর সঙ্গে কি যাবে না যাবে সব ঠিকঠাক করে দাও–।

পিসিমা সেই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলে অর্চনার অবাক হওয়াটা চোখে পড়ে নি। অর্চনাও মুহূর্তেই সামলে নিয়েছে। পরে সুখেন্দুর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় যাচ্ছ শুনলাম?

সুখেন্দু বই পড়ছিল। মাথা নেড়েছে।

কোথায়?

বলেছে।

এডুকেশন টুরে?

সুখেন্দু বইয়ের পাতা উল্টেছে।

আমাকে জানানো দরকার মনে করনি?

সুখেন্দু বই সরিয়েছে।–তোমার মায়ের পারমিশান নেওয়া দরকার ছিল?

মায়ের নয়, আমার জানা দরকার ছিল।

যা-যা লাগতে পারে অর্চনা গোছগাছ করে দিয়েছে। সে যাবার আগে মনটাও নরম হয়েছিল একটু, কিন্তু সুখেন্দু একটা কথাও বলে নি।

ফেরার কথা পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে। ফিরল প্রায় দিন বানো পরে। পিসিমার তাগিদে অর্চনা কলেজে টেলিফোন করে জেনেছে, কলেজের ছেলেরা যথাসময়েই ফিরে এসেছে, শুধু সে-ই ফেরে নি।

ওর যেমন রাগ পড়ে এসেছে, অন্য দিক থেকেও অর্চনা সেই রকমই আশা করেছিল। স্বাভাবিক স্থলে এই কটা দিনের বিচ্ছেদ ব্যবধান ঘোচানোর অনুকুল। কিন্তু সুখেন্দুর একটুও পরিবর্তন নেই, বরং আরো সঙ্কল্পবদ্ধ কাঠিন্য নিয়েই ফিরেছে যেন। আগের মতই নিজের হাতে বালিশ তুলে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে পৃথক শয্যা রচনা করেছে। আঘাত দেবার বাসনা পোষণ করতে থাকলে চরমে না ওঠা পর্যন্ত বাড়াতেই থাকে সেটা। কদিন বাদে, পিসিমা জানালেন সে-চক্ষুলজ্জাও কাটল। পাশের ঘরের চৌকিতে একটা স্থায়ী শয্যার ব্যবস্থা করে নিল সে। টেবিলসুদ্ধ তার বই আর ঈজিচেয়ারটাও পাশের ঘরে চলে এলো। পিসিমা জানালেন, অনেক রাত পর্যন্ত আজকাল আলো জেলে পড়া না করতে হয় বলেই এই ব্যবস্থা।

তার পর থেকে পিসিমা ভাইপোকে চুপচাপ লক্ষ্য করছেন শুধু। অর্চনাকেও। মুখে কিছু বলেন নি।

কিন্তু অর্চনা বলেছে। সেদিনের সেই একান্ত প্রত্যাশার মুহূর্তে ও-ভাবে আঘাত দিয়ে ফেলে নিরিবিলি অবকাশে অনুতাপ একটু নিজেরও হয়েছে। বাপের বাড়িতে ওর সেইদিনের অপমানে অনুতাপ আর-একজনের হবার কথা। হল না যে সেইখানেই অর্চনার ক্ষোভ। তার ওপর এই রূঢ়তা আরো অপমানকর। তবুও, আগের মত না হোক, মানুষটার স্বভাব জেনে যতটা সম্ভব হালকা গাম্ভীর্যে এই গুমোট কাটিয়ে তুলতেই চেষ্টা করেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার এই এক-একটা রাগের ঝোঁক ক'দিন পর্যন্ত থাকে বলে দাও, ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রাখি।

ফল হয় নি। সুখেন্দুর মুখের রেখাও একটা বদলায় নি।

সেদিন নিজের কাজ সেরে এসে অর্চনা দেখে, পাশের ঘরের দেয়ালের কাছে চেয়ার নিয়ে হরিয়া চাকর নিবিষ্ট মনে দেয়ালে কতকগুলো পেরেক ঠুকছে। অর্চনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কি হবে। তার আগেই টেবিলটার ওপর চোখ পড়তে অবাক! টেবিলে শাশুড়ীর সেই ছবিখানা। হরিয়া ওটা খুলে এনে এ-ঘরে টাঙাবার তোড়জোড় করছে। ওদিকে পিসিমাও এসে দাঁড়িয়েছেন কখন। অবাক তিনিও। হরিয়া জানাল, কলেজ যাবার সময় দাদাবাবু তাকে ছবি ও-ঘর থেকে নামিয়ে এনে এ-ঘরে টাঙিয়ে রাখতে বলে গেছে।

পিসিমার চোখে চোখ পড়তেই অর্চনা তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এলো। এই সামান্য একটা ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া কম নয়। প্রথমেই মনে হল হরিয়াকে আবার আদেশ দেয়, ছবি যেখানে ছিল সেখানেই রেখে যেতে। পারল না। যেখানে লাগার লেগেছে, ছবি ফিরিয়ে এনে সেই যাতনার লাঘব হবে না। বরং হুকুম যে দিয়ে গেল হাতের কাছে তাকে পেলে

সামনা-সামনি বোঝাপড়া হতে পারত। অর্চনা গুম হয়ে বসে রইল খানিক। ও-ঘরে পেরেক পোতার কি-ঠাক শব্দগুলোও কানে লাগছে। অর্চনা নিজের ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকাল। যেখান থেকে ছবিটা নামিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে চৌকো দাগ পড়ে আছে একটা। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হল দাগটা যেন অশুভ সূচনা কিছুর।

অশুভ সূচনাই।

জীবনের পাশায় মায়ের দানগুলো বড় নিখুঁত ভাবে পড়ে।

টেলিফোন বাজল। অর্চনা উঠে এসে টেলিফোন ধরল। মায়ের টেলিফোন।

এক জায়গায় বরুণার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কিছুদিন ধরে। অর্চনা শুনেছিল, ছেলের বাড়ির মস্ত অবস্থা নিজেদের বাড়ি-গাড়ি, ছেলেও বড় চাকরি করে। কোন একটা পার্টিতে ছেলের এবং ছেলের বাড়ির সকলের সঙ্গে মায়ের পরিচয়। অর্চনার বিয়ের পর থেকেই মায়ের সঙ্গিনী বরুণা। বড় মেয়ের বেলায় যা তিনি পারেন নি, ছোট মেয়ের বেলায় সেটা পেরেছেন। মনোমত যোগাযোগ একটা ঘটেছে শেষ পর্যন্ত। মায়ের ছেলে পছন্দ হয়েছে, অপর পক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। অবশ্য বরুণা অপছন্দের মেয়ে নয়। আর ছেলের তরফের পছন্দটা আরো জোরালো করে তুলতে হলে মেয়ে ছাড়াও আনুষঙ্গিক আর যা দরকার বিজন দরাজ অন্তঃকরণে তার সবটা ভার নিয়েছে। খরচপত্র যা লাগে লাগুক, ভাল বিয়ে হোক একটা–।

সেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা এতদিনে।

টেলিফোনে মিসেস বাসু বড় মেয়েকে সেই সংবাদ দিলেন।

অর্চনা যথার্থ খুশী। এমন কি ক্ষণকাল আগের গুরুভারও অনেকটা হালকা হয়ে গেল। সানন্দে বলল, খুব ভাল মা, খুব ভাল হল।

ভাল যে হল সেটা মা খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু বড় মেয়ের ব্যাপারে সেই ভাল না হওয়ার খেদ তাঁর দিনে দিনে বেড়েছে বই একটুও কমে নি। ফলে এই মেয়ের জন্যেই তাঁর দুশ্চিন্তা আর দরদ বেশি। অথচ কিছুকাল ধরে তিনিও অনুভব করেছেন, মেয়ের নিরঙ্কুশ ভবিষ্যৎ-রচনা সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, মেয়েও যেন মনে মনে বিরাগ তাঁর ওপর। বিজ্ঞানের জন্মদিনে সেটুকু স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন তিনি। মেয়ে অবুঝ, মেয়ের এই মনোভাব তিনি গায়ে মাখেন না অবশ্য। কিন্তু সেটাও দুর্ভাবনার কারণ তো বটেই। ওকে সুদ্ধ বিগড়ে দিলে আশার আর থাকল কি? সেই কারণে জামাইয়ের ওপর সম্প্রতি আরো বেশি বিরূপ তিনি। শুধু জামাইয়ের ওপর নয়, এ-বাড়ির আর এক নির্বিরোধী মহিলার ওপরেও। অযাচিত অবাঞ্ছিত ভাবে যিনি মেয়ের সংসারটিকে আগলে আছেন বলে তার বিশ্বাস, আগলে থেকে মেয়ের সামান্য ভবিষ্যৎটুকুও ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছেন।

সম্প্রতি মেয়ের অশান্তির একটু-আধটু আভাস তিনিও পাচ্ছেন। আগের মত আর তেমন হৈ-চৈ করে না, তেমন খোলা-মেল হাসে না। আসেও না বড়। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় মিসেস বাসু মনে মনে অস্থির। তাই বরুণার বিয়ে উপলক্ষ করে শক্ত হাতে আর একবার হাল ধরবেন মনস্থ করেছেন। মেয়েকে কিছুকাল এখানে আটকে রেখে

জামাইয়ের সঙ্গে পষ্টাপষ্টি ফয়সালা করে নেবেন একটা। তাঁর কাছে থাকলে মেয়ের আলগা ভয়-ভাবনা সঙ্কোচও কাটবে কিছুটা।

তাঁর টেলিফোন শুধু বরুণার বিয়ের খবর জানার উদ্দেশ্যেই নয়।

কিন্তু সংকল্পটা আপাতত ঘুরিয়ে ব্যক্ত করলেন তিনি। প্রথমেই জেনে নিলেন সুখেন্দু ঘরে আছে কি না। তার পর প্রস্তাব করলেন, আসছে রবিবার বিজন আর বউমা ছেলের বাড়ি যাচ্ছে আলাপ-পরিচয় করতে, অর্চনাকেও যেতে হবে। অতএব কালই যেন সে চলে আসে, শুধু তাই নয়, এবারে এসে মাস দুই তাকে থাকতে হবে-নইলে বাড়িটা একেবারে খা খা করবে।

অর্চনা রবিবারে ছেলের বাড়ি যেতে রাজী, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে তার আপত্তি। বলল, অতদিন থাকব কি করে মা...

টেলিফোনের ওপার থেকে মায়ের বিরক্তি।–কেন, অসুবিধেটা কিসের, বিয়ের এই দু-বছরের মধ্যে একসঙ্গে দশটা দিনও এসে থেকেছিস? বিয়ে হয়েছে বলে কি মাথা কিনেছে নাকি তারা?

তাঁর দিক থেকে বড় সুসময়ে বলেছেন কথা ক'টা। এখানকার এই আবহাওয়া অর্চনাও বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না। আজকের গ্লানি আরো দুর্বহ।...দিনকতকের জন্য সরে গেলে মন্দ হয় না। ফোটো আপনিই আবার এ-ঘরে এনে টাঙাতে বাধ্য হয় কি না দেখা যেতে পারে। বিয়ে হয়েছে বলে সত্যিই তো মাথা বিকোয় নি। মেজাজের মাত্রাজ্ঞান নেই যখন মেজাজ নিয়েই থাকুক কিছুদিন।

অন্যমনস্কের মত বলল, আচ্ছা, পিসিমাকে বলে দেখি–।

পিসিমাকে আবার বলবি কি। মায়ের কণ্ঠস্বর চড়ে গেল, সুখেন্দুকে বলে সোজা চলে আসবি, বলবি আমি বলেছি।

আ-হা, তুমি বুঝছ না–

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে উঁচু থেকে কিছু একটা পড়া এবং ঝন ঝন ভাঙার শব্দ। অর্চনা চমকে তাকাল। রিসিভার কান থেকে সরে গেছে, মায়ের কথা কানে গেল না। ওধার থেকে পিসিমার উগ্রীব কণ্ঠ-বউমা, ও বউমা, কি ভাঙল?

কি ভেঙেছে অর্চনা না দেখেই অনুমান করতে পারে। টেলিফোনে মুখ নামিয়ে বলল, এখন থাক মা, পিসিমা ডাকছেন–

মেয়ের কথায় ওদিক থেকে মায়ের গা জ্বলে গেল...টেলিফোনে কথা কইছিস– পিসিমা ডাকছেন কি?

পিসিমা পূজোয় বসেছিলেন, জবাব না পেয়ে আরো উৎকণ্ঠিত।–কি ভাঙল? ও বউমা–

অর্চনা এবারে সাড়া দিল, যাই পিসিমা–। এদিকে টেলিফোন ছেড়ে দিলে মা চটবেন ভেবে তাকে বলল, আচ্ছা তুমি একট ধরে মা, আমি এক্ষুনি আসছি।

রিসিভার টেবিলে নামিয়ে রেখে ভিতরের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে এসেই অর্চনা স্তব্ধ। শাশুড়ীর ছবি মেঝেতে উল্টে পড়ে আছে, কাঁচ ভেঙে ছত্রখান। হতভম্ব হরিয়া হাতে করেই কাচের টুকরো কুড়োচ্ছ।

পূজোর আসন ছেড়ে পিসিমাও উঠে এসেছেন। ঘরের অবস্থা দেখে তিনি আর্তনাদই করে উঠলেন। হরিয়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন, ওরে ও হতভাগা, ছবিটা ফেললি কি করে?...বউমা, দেখ ছবিটা গেল কি না...

এগিয়ে এসে অর্চনা ছবিটা তুলল। কাচ নয় শুধু, ফ্রেমও ভেঙেছে। জায়গায় জায়গার কাচ বিঁধে আছে। মূর্তিটি অক্ষত আছে এই যা। বলল, না ছবি ঠিক আছে।

সুখেন কলেজ থেকে ফেরবার আগে ওটা বাঁধিয়ে আনার ব্যবস্থা করো। ...সখেদে হরিয়াকে তাড়া দিলেন তিনি, এই জংলি, ওগুলো রেখে ছবি নিয়ে আগে দোকানে যা শিগগির

ঘাবড়ে গিয়ে হরিয়া কাচ কুড়ানো ছেড়ে তাড়াতাড়ি ফোটো নেবার জন্য হাত বাড়াতে অর্চনা দেখে তার হাত কেটে রক্তাক্ত।–আবার হাতও কেচ্ছে, দেখি–ইস!

বেশিই কেটেছে মনে হল। সমস্ত হাত রক্তে মাখা। ছবিটা অর্চনা দেয়ালের এক ধারে সরিয়ে রেখে হরিয়াকে নিয়ে বাইরে এলো। তার হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে ঘরে আয়োডিন-তুলো আছে কিনা ভাবতে গিয়ে কি মনে পড়ল।...মা টেলিফোন ধরে আছেন। মুখ তুলে দেখে পিসিমা তখনো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে। বলল, পিসিমা, মা টেলিফোনে রয়েছেন, আপনি একটু বলে দিন না আমি পরে টেলিফোন করব’খন।

অর্চনা হরিয়ার হাত দেখায় মন দিল আবার, ক'জায়গায় কেটেছে ঠিক নেই।

টেলিফোন কানে লাগিয়ে পলে পলে জ্বলছিলেন মিসেস বাসু। যে মেয়ের জন্য এত ভাবনা তার, সে-ই যদি এমন হয় তিনি পাবেন কি করে। ডাক শুনেই অন্তে এ-ভাবে টেলিফোন ফেলে চলে যাওয়াটা অসহ তার কাছে। আর গেছে তো গেছেই। এমন নিরীহ বশ্যতার দরুন মেয়ের ওপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ। ওদিক থেকে টেলিফোন তোলা বা ভাল করে সাড়া পাওয়ার আগেই সপ্তকণ্ঠে ছিটকে উঠলেন তিনি।–দ্যাখ, এখনো নিজের ভাল বুঝতে শেখ,–উঠতে পিসিমা বসতে পিসিমা–টেলিফোনে কথা কইছিল, তাও পিসিমা–তোর হল কি?

এদিকের মহিলাটি হঠাৎ যেন হকচকিয়ে গেলেন একেবারে। নিজের অগোচরে সাড়া দিতে গেলেন, আমি–

আমি-আমি অনেক শুনেছি।...রাগের মাথায় মিসেস বাসু ভাবতেও পারেন না কি অঘটন ঘটাতে বসেছেন! রূঢ় কণ্ঠেই ঝাঁকিয়ে উঠলেন তিনি-অনাথা, বিধবা মানুষ বাড়িতে আছে থাক, তা বলে তার এত কর্তৃত্ব কিসের? আর তোদেই বা তাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? তুই এখানে এসে থাকবি দু-মাস তাকে বলেছিস?

সাড়া নেই। আচমকা আঘাতে পিসিমা একেবারে বিমূঢ়।

মেয়ে ঘাবড়ে গেছে ভেবে মিসেস বানুর অসহিষ্ণু নির্দেশ, তোর ভয়টা কিসের? পষ্ট জানিয়ে দিবি আমি বলেছি তুই এখানে এসে থাকবি দু'মাস। না পারিস আমিই সুখেনকে বলব–

আরো দুই-এক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে পিসিমা এবারে সাড়া দিলেন। শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি পুখেন্দুর পিসিমা...বউমা আপনাকে পরে টেলিফোন করবেন জানিয়েছেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। পাংশু, বিবর্ণ সমস্ত মুখ। খেয়াল হতে দেখেন সাবি অবাক চোখে তাকেই দেখছে। সে ওপরে আসতে বউদিমণি তাকে ঘর থেকে আয়োডিন-তুলে এনে দিতে বলেছিল। তাঁর টেলিফোনের কথাগুলো নয়, মুখের এই ভাবান্তরটুকুই সাবির বিস্ময়ের কারণ।

কি চাস?

আয়োডিন-তুলো–

নিয়ে যা।...তার পাশ কাটিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অদূরে ও-দিক ফিরে অর্চনা হরিয়ার হাত উল্টে-পাল্টে দেখছে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে অনুভূতিশূন্য মূর্তির মত বসে রইলেন তিনি।

হরিয়ার হাতের ব্যবস্থা করে অর্চনা ফিরে এসে ঘর পরিষ্কার করল। তার পর কি ভেবে শাশুড়ীর ছবিটা নিজেই বেরিয়ে ছবি-বাঁধাইয়ের দোকানে দিয়ে এলো। সন্ধ্যার আগে

আবার গিয়ে নিয়েও এলো। এ-বেলা হরিয়া আসেই নি। সদ্য-বাধানো ছবি অর্চনা পাশের ঘরে সুখেন্দুর টেবিলের ওপরেই রেখে দিল।

পিসিমার সামনা-সামনি বার-কতক এসেছে। নিজের ভিতরটা সুস্থির থাকলে তার স্তব্ধতা অস্বাভাবিক লাগত। যেটুকু চোখে পড়েছে, ভেবেছে, ছবিটা ওভাবে ভেঙেছে বলে মন খারাপ, আর ওদের ব্যাপারটা অনুমান করেই কিছুটা গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন।

বাড়ি ফিরে মায়ের ছবি টেবিলের ওপর দেখে সুখেন্দু প্রথমেই হরিয়ার উদ্দেশে হাঁক দিল। তার পর সদ্য পালিশ করা নতুন ফ্রেম নজরে পড়তে সেটা হাতে তুলে নিল। হরিয়ার বদলে জলখাবার হাতে অর্চনা ঘরে ঢুকেছে।–হরিয়া এ-বেলা আসে নি, জ্বর হয়ে থাকতে পারে, হাত অনেকটা কেটেছে। ছবি টাঙাতে গিয়ে ফেলে ভেঙেছিল, কাল আসে তো আবার চেষ্টা করা যাবে।

এই ফ্রেম আগে যা ছিল তার থেকে সুন্দর তো বটেই, দামীও। পছন্দটা হরিয়ার নয় বুঝেছে। ছবিটা টেবিলে রেখে সুখেন্দু, চুপচাপ হাতমুখ ধুয়ে এলো। অর্চনা নিঃশকে অপেক্ষা করছিল, তার খাওয়া শেষ হতে বলল–কাল আমি মায়ের ওখানে যাচ্ছি, কিছুদিন সেইখানেই থাকব ঠিক করেছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা উপলব্ধি করা গেল। সুখেন্দু উঠে টেবিলের একটা দরকারী বই-ই যেন উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল।–পিসিমাকে বলে যাও।

তোমাকে বলার দরকার নেই?

ঠিক করে ফেলার পর আর না বললেও চলে।

অর্চনা চুপচাপ দেখল দেখল একটু।--ঠিক আজই করেছি...ঘর থেকে তোমার মায়ের ছবি সরানোর পর। তখন তুমি ছিলে না।

সুখেন্দু চকিতে তাকাল একবার। আঘাতের বিনিময়ে ক্ষোভ অথবা সমর্পণটাই হয়তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা। অন্যথায় ফল বিপরীত। সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করল, আপাতত তাহলে বেশ কিছুদিনই সেখানে থাকবে?

তার দিকে চোখ রেখেই অর্চনা হাসল একটু, তার পর খুব সহজ ভাবেই জবাব দিল, কি করে বলি...আমার এখানে থাকাটা তেমন অসহ হবে না বুঝলে আগেই না-হয় গিয়ে নিয়ে এসো।

চলে এলো। বই ফেলে সুখেন্দু গুম হয়ে চেয়ারে এসে বসল আবার। একবার ইচ্ছে হল তক্ষুনি ডেকে বলে দেয়, কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু সেটা বলার মতও কোথাও যেন জোরের অভাব। অর্চনা হয়তো মুখের দিকে চেয়ে থেকেই হাসবে আবার আর বলবে, আচ্ছা যাব না।

বাধা দেবার মত জোরালো অথচ নিস্পৃহতর একটা উপলক্ষ মনে পড়ে গেল।...পিসিমা কি মনে করবে? পিসিমা দুঃখ পেতে পারে তেমন কারো ছেলেমানুষিই সে বরদাস্ত করবে না। তক্ষুনি উঠে পাশের ঘরে এসে দেখে অর্চনা নেই। বারান্দায় নেই। বোধহয় নিচে। ঝোঁকের মাথায় সামনে পেলে বলে ফেলত। না পেয়ে ভাবল পরে বলবে।

বারান্দায় পায়চারি করল দুই-একবার। পিসিমার পূজোর ঘরের দিকে চোখ পড়তে অবাক একটু। এ-সময়টা ও-ঘর অন্ধকার থাকে না বড়। পায়ে পায়ে সেই দিকে এগুলো। এমনিই। পাশে পিসিমার শোবার ঘরেরও আলো নেবানো। ফিরে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মনে হল, কোণের দিকে মেঝেতে কেউ বসে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বলল।

পিসিমাই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসে ছিলেন। দুই চোখে জলের ধারা। বিষম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আঁচলে করে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি।

সুখেন্দু নির্বাক খনিকক্ষণ।– কি হয়েছে?

কিছু না, এমনি বসে ছিলাম।...এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলাটা সামলে নিয়ে সহজ হতে চেষ্টা করলেন।–তুই কখন এলি, খেতে-টেতে দিয়েছে?

সুখেন্দু কাছে এগিয়ে এলো। আবারও নিরীক্ষণ করে দেখল।–কি হয়েছে?

কিছু না রে বাবা, ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন–কত সময় কত কি মনে পড়ে– যাই রাত হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়ালেন। চুপচাপ আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুখেন্দু নিজের ঘরে চলে এলো। একটু বাদে বইখাতা নিয়ে ছেলে পড়াতে চলে গেল। পিসিমাকে ওভাবে দেখে হঠাৎ ধাক্কাই খেয়েছে একটা। কিছু ভাবতে পারছে না।

সেই রাতেই অর্চনা পিসিমার কাছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাপের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকার প্রস্তাবটা উত্থাপন করল। আগে বোনের বিয়ের খবর জানাল, তারপর বলল, মা কিছুদিন গিয়ে থাকার জন্যে বার বার করে বলেছেন–

পিসিমার শুকনো উত্তর, আমাকে বলার কি আছে, সুখেনকে বলো–

এভাবে কথা বলতে অর্চনা শোনে নি কখনো। বোনের বিয়ে শুনেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন না সেটা আরো অপ্রত্যাশিত। তবু নিজে থেকেই অর্চনা বোনের বিয়ের প্রসঙ্গে এটা-সেটা জানাল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না বা আগ্রহ দেখল না। উল্টে কেমন একটা রুক্ষ নীরবতাই লক্ষ্য করল। এই প্রথম অর্চনা মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণ হল তার ওপরেও।...বাড়ির ছেলেটি তুষ্ট না থাকলে ও কেউ নয়, এই আচরণে পিসিমা সেটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন বোধহয়।

রাত্রিতে খাবার টেবিলে বসে সুখেন্দু নিজে থেকে কথা বড় বলেই না। আজকাল। খেয়ে চুপচাপ উঠে চলে যায়। এক একদিন অর্চনা সঙ্গে না বসেও দেখেছে, তাও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু সেই রাত্রিতে খেতে বসে ভাতে হাত দেবার আগেই ওর দিকে তাকাল! কিছু যেন নিরীক্ষণ করছে। অর্চনা ফিরে তাকাতে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, পিসিমার কি হয়েছে?

অর্চনা মনে মনে অবাক; এরকম প্রশ্ন কখনো শোনে নি।–-কি হবে?

জানো কি না জিজ্ঞাসা করছিলাম।

জিজ্ঞাসাটা জেরার মত লেগেছে অর্চনার। নিরুত্তাপ জবাব দিল, তোমাদের এখানে কার কখন কি হয় এই দু-বছরেও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

খেতে খেতে সুখেন্দু তেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পারলে ভাল হত।

অর্চনা চেষ্টা করল হাসতে, তার এবারের উক্তিটা বিদ্রুপের মতই শোনাল। কি আর করবে বলো, তোমাদের বরাত মন্দ ...কি ভাবে বুঝতে হবে বলে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি–

পরদিন যাবার আগে পিসিমাকে প্রণাম করার সময়ও একটি কথা বললেন না তিনি। ক'দিন থাকবে বা কবে ফিরবে, কিছু না। পিঠে হাত রেখে শুধু নির্বাক আশীর্বাদ করলেন একটু। সুখেন্দু বাড়ি নেই, সকালের টুইশনে বেরিয়েছে। তার ফেরার সময় হয়ে গেছে। ফেরে নি।

অর্চনা নীরব অভিমানে বাপের বাড়ি চলে গেল।

.

পাঁচ-ছ দিনের একটানা গাম্ভীর্যের পর পিসিমাকে প্রায় আগেই মতই সহজ হতে দেখা গেল সেদিন। সকালে সাবি রাধুনী অগোছালো কাজের দরুন বকুনি খেয়ে নিশ্চিন্ত, হরিয়া চাকরও হুকুম তামিল করে হালকা একটু। এই ক'দিনের মধ্যে সেদিন রাতেই বউয়ের ঘরটা অন্ধকার দেখে নিজেই ভিতরে এসে আলো জেলে দিলেন। শূন্য ঘরটার চারদিকে চেয়ে কেমন শূন্যতাও বোধ করলেন তিনি। দেয়ালের গায়ে ঠিক আগের জায়গায়

সুখেনের মায়ের ছবিটা টাঙানো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন! অর্চনা চলে যাবার পর সুখেন্দু নিজের হাতে এটা আবার এখানেই টাঙিয়ে রেখেছিল।

ভিতরের দরজা দিয়ে পিসিমা পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে বসেছিল। এ ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকিয়েছিল সে। পিসিমা বললেন–এ ঘরটা অন্ধকার করে রাখিস কেন,মেয়েটা না থাকলে এমনিতেই বর খাঁ খাঁ করে।

ব্যতিক্রম দেখে সুখেন্দুও বোধ হয় হালকা নিবাস ফেলল। পিসিমা সামনে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ রে, বউমা ফিরছে কবে?

সুখেন্দু অবাক একটু।–কিছুদিন তো সেখানে থাকবে শুনেছিলাম...তোমাকে বলে যায় নি?

পিসিমা জবাব দিলেন, বলেছে হয়তো...আমারই খেয়াল নেই। যাক তুই কালই গিয়ে নিয়ে আয় তাকে, আর যে-দুটো বাড়িতে আছে তাদের তো খাস জ্ঞান গম্যি–সময়মত হয়তো একটু ধূপধুনোও পড়বে না।

সুখেন্দু নিরুত্তরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আরো কিছু বক্তব্য আছে অনুমান কবেই শেষে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

জবাবে খুব সাদাসিধে ভাবেই যে সঙ্কল্পটি ব্যক্ত করলেন, শুনে নির্বাক কিছুক্ষণ। আগামী পরশু তিনি হরিদ্বার যাচ্ছেন জায়ের কাছে। জা কতকাল ধরে লেখালেখি করছেন যাবার জন্যে, কিন্তু হয়ে আর ওঠে না। এবারে মনস্থ করেছেন যাবেন। হরিদ্বারে চিঠি লিখে

জানানোও হয়ে গেছে। যাবার সঙ্গীও জুটে গেছে, তার গুরুদেব-বাড়ির আরো কারা যাচ্ছে সেদিন। তাই বউমাকে কালই গিয়ে ওর নিয়ে আসা দরকার।

যত সহজ ভাবেই ইচ্ছাটা ব্যক্ত করুন তিনি, শোনা মাত্র সুখেন্দুর মনে গভীর একটা আঁচড় পড়ল। স্থির দৃষ্টি তার মুখের ওপর সংবদ্ধ।...সেজন্যে তোমার যাওয়া আটকাবে না।...কবে ফিরবে?

জবাব দিতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছেন, দৃষ্টি এড়াল না। বললেন, আমি আপাতত ওখানেই থাকব ঠিক করেছি রে।আরো সহজ ভাবে প্রসঙ্গ নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেন তিনি- ক'বছর আগেই তো যাব ঠিক ছিল, তোর মায়ের জন্য পণ্ড এবারে আর আটকাস না বাবা।

সুখেন্দু চেয়েই আছে। দেখছে। চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল একবার। টেবিলের কাছে এসে অন্যমনস্কের মত একটা বই নাড়াচাড়া করল। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিল, আচ্ছা।

পিসিমা যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটু।–হ্যাঁ রে, রাগ করলি?

সুখেন্দু মাথা নাড়ল, রাগ করে নি। তারপর শান্ত মুখে বলল, তুমি এখানে। থাকতে পারবে না আমি আগেই জানতুম পিসিমা, কিন্তু সে-যে এত শিগগির, ভাবি নি।

হাতের বইটা ফেলে পিসিমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল সে। কণ্ঠস্বর বদলে গেল।–পিসিমা, কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

স্পষ্ট বিড়ম্বনা–এই দ্যাখো... আমাকে আবার কে কি বলবে।

পিসিমার বাহুতে একখানা হাত রাখল, সুখেন্দু। আবার জিজ্ঞাসা করল, কেউ বলেছে কিছু?

অর্থাৎ এবারে সে গা ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করছে, সত্যি না বললে ওরই অকল্যাণ। পিসিমার এই দুর্বলতা সুখেন্দুর জানা আছে। জবাব শোনারও আর দরকার ছিল না, তাঁর বিব্রত মুখভাবেই জবাব লেখা।

পিসিমা জোর দিয়েই বললেন, না রে না, যা ভাবছিস তা নয়, বউমা আমাকে কোনদিন এতটুকু অশ্রদ্ধা করে নি।

সুখেন্দু তাঁর বাহু থেকে হাত নামাল না তবু। স্থির নিস্পলক চেয়ে আছে।–বউমা ছাড়াও অশ্রদ্ধা করার লোক আছে, তার মা বা আর কেউ কিছু বলেছে?

ধরা পড়ে পিসিমা ফাঁপরে পড়ে গেলেন একেবারে। নিরুপায় মুখে রাগ দেখালেন, পাগলামো করিস নে, আর কারো কথায় আমার কি আসে যায় বউমাকে কালই গিয়ে নিয়ে আয়, বলবি আমি ডেকেছি।

সুখেন্দু হাত নামিয়ে নিল। যেটুকু বোঝার বুঝে নিয়েছে। আঘাতটা কোথা থেকে এসেছে অনুমান করতে পেরেছে। চুপচাপ চেয়ারে এসে বসল আবার।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তার মুখের দিকে চেয়েই পিসিম নির্বাক খানিকক্ষণ। যা গোপন করে নিঃশব্দে চলে যেতে চেয়েছিলেন সেটা যেন উল্টে আরো বেশিই স্পষ্ট হয়ে গেল। গেল বলেই সমস্ত মুখে ব্যথার ছাপ দু'চোখ ভরে জল আসার উপক্রম। সামলে নিয়ে আর একটু কাছে এলেন। স্পষ্ট কোমল সুরে বললেন–দ্যাখ, তোকে একটা কথা বলব–

কঠিন গাম্ভীর্যে সুখেন্দু চোখ তুলে তাকাল শুধু।

বউমা খু-ব লক্ষ্মী মেয়ে, আমার চোখ অত ভুল করে না। তাকে তুই কক্ষনো দুঃখ দিস নে–

চোখের জল সংবরণ করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়াতে চলল। বউমাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি বা হবে না সেটা তিনি আগেই অনুমান করেছেন। একবার ঠিক করলেন, নিজেই টেলিফোনে ডাকরেন তাকে। আবার ভাবলেন, হরিয়াকে পাঠিয়ে খবর দেবেন। সে বাড়ি চেনে। শেষে কি ভেবে কিছুই করলেন না। তার পরদিনও গোছগাছ করতে করতে সকাল কেটে গেল। সেই দিনই বিকেলে গাড়ি। সুখেন্দু কলেজে যাবার আগে বলে গেছে, সে-ই এসে সময় মত স্টেশনে পৌঁছে দেবে। গোছগাছের ফাঁকে ফাঁকে পিসিমা হরিয়া আর সাবিকে বাবতীয় খুঁটিনাটি নির্দেশ দিলেন! আর হরিয়াকে বলে রাখলেন, সে যেন চলে না যায়, কাজ আছে।

দ্বিপ্রহরের মধ্যে সব সেরে রেখে চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে হরিয়াকে ডাকলেন, আয় আমার সঙ্গে।

.

এই কটা দিন খানিকটা হৈ-চৈএর ওপরেই কাটিয়েছে অনা। ভিতরের তাপ একটুও বুঝতে দেয় নি। বরুণাকে আলটেছে, বউদির নভেল পড়া নিয়ে খুনসুটি করেছে, বাবার তত্ত্ব-বিশ্লেষণ শুনেছে আগের মতই, সেজেগুজে মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে কেনা-কাটাও করেছে। আর এই করে মনের দিক থেকে হালকাও হয়েছে অনেকটা। নিরিবিলিতে বাড়ির কথা বেশি মনে হয় বলেই নিরিবিলি চায় না। তা সত্ত্বেও টেলিফোনে পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে লোভ হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু অভিমানটা এবারে তার ওপরেই বেশি–একদিন টেলিফোন তুলেও আবার রেখে দিয়েছে।

সেদিন দুপুরের শো-এ দাদা-বউদির সঙ্গে কি একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ননিমাধবও ছিল এবং তার আগ্রহেই যাওয়া।

ফিরেও ছিল খুশী মনেই।

ওপরে নিজেদের ঘরে ঢুকে বরুণাকে দেখবে আশা করেছিল। ওকে কলেজে পাঠিয়ে নিজেরা কত ভাল ছবি দেখে এলো একটা, সেই সমাচার শুনিয়ে ওকে রাগাবার ইচ্ছে ছিল।

বরুণার বদলে মা বসে তাদের ঘরে।

কিছু একটা ভাবছিলেন, অর্চনার সাড়া পেয়েই চকিতে হাসি টেনে আনলেন মুখে।কেমন দেখলি?

ভাল। তুমি একলাটি বসে যে, বরুণা কই?

আছে ওদিকে কিছু একটা বলবেন বলেই যেন মেয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন তিনি। কিন্তু হাসিটা খুব প্রাঞ্জল মনে হল না অর্চনার।

কি মা?

ও-বাড়ি থেকে তোর পিসি-শাশুড়ী এসেছিলেন, তোরা বেরোবার একটু পরেই।

অর্চনা অবাক।–পিসিমা!!

হ্যাঁ। –আবারও মুখে হাসি টেনেই ডুয়ার খুলে একগোছ চাবি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোকে দেবার জন্যে দিয়ে গেলেন–

নিজের অগোচরে চাবি হাতে নিল অর্চনা। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। বাড়ির চাবি! বিমূঢ় মুখে বলল, চাবি ...চাবি কেন?

উনি যে আজ বিকেলের গাড়িতেই হরিদ্বার যাচ্ছেন...

অর্চনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু।

বিব্রত ভাবটুকু তল করে মিসেস বাসু বললেন, আদরযত্ন করতে গেলাম, এক গেলাস জলও মুখে তুললেন না, আমরা তো সব ম্লেচ্ছ কিনা–

অর্চনা অস্ফুট বাধা দিল–জল তিনি কোথাও খান না–কি বললেন?

বলবেন আবার কি, হুকুম করেই গেলেন, চাবিটা তোকে দিতে হবে আর আজই তোকে ও-বাড়ি চলে যেতে হবে–আজ কি করে যাওয়া হয় তোর?

অর্চনা অধীর মুখে বলে উঠল, কিন্তু উনি যাচ্ছেন কেন?

মেয়ের এত উতলা ভাবটা মনঃপূত নয় মিসেস বাসুর।–বুড়ো মানুষ, তীর্থ ধর্ম করে কাটাবেন, ভালই তো~-শুনলাম ওখানেই থেকে যাবেন।

অর্চনা চমকে তাকাল মায়ের দিকে। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে। পরক্ষণে ছুটে বেরিয়ে সোজা এসে ঢুকল বাবার ঘরে। বাবা ঘরে নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল একটু। তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে ডায়েল করল।

টেলিফোন বেজেই চলল। সাড়া নেই।

টেলিফোন রেখে ত্রস্তে বেরিয়ে আসতেই মায়ের মুখোমুখি আবার।–মা গাড়িটা আছে তো?

আছে, কিন্তু তুই যাবি কোথায়?

জবাব না দিয়ে অর্চনা তার পাশ কাটিয়ে তরতরিয়ে নিচে নেমে এসে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি বার করতে।

হাওড়া স্টেশন।

অর্চনা খবর নিয়ে জানল, হরিদ্বারের গাড়ি প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে ছেড়ে গেছে।

শ্রান্ত অবসন্ন চরণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠল। পরিত্যক্ত অনুভূতি একটা। জীবন থেকে এক নিশ্চিন্তনির্ভর বিচ্যুতির শূন্যতা।

কিন্তু– কেন? কেন? কেন? কেন?

অর্চনার কোনদিকে হুঁশ নেই। এই কেনটা আতিপাতি করে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছে। পিসিমা গেলেন কেন? আগে ওকে একটা খবর পর্যন্ত দিল না কেউ। কেন দিল না? অর্চনা ভাবছে। আসার আগের দিন আর আসার দিন পিসিমাকে একেবারে অন্যরকম দেখেছিল বটে। ওর দিক থেকেই যেন মুখ ফিরিয়ে ছিলেন তিনি। আসার দিন কিছু হয় নি, যা হয়েছে আগের দিনই। সেই দিনই রাত্রিতে খেতে বসে আর-একজনও জিজ্ঞাসা করেছিল, পিসিমার কি হয়েছে... কেন জিজ্ঞাসা করেছিল? কি দেখে?

ওই দিনটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখের সামনে দেখতে চেষ্টা করল।...শাশুড়ীর ছবি সরানো হয়েছিল, ছবিটা পড়ে ভেঙেছিল, পিসিমার ডাকাডাকি–ভাঙা ছবি দেখে তক্ষুনি বাঁধিয়ে আনার ব্যাকুলতা... চাকরটা হাত কেটে রক্তাক্ত...টেবিলে মায়ের টেলিফোন...

সহসা গাড়ির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠল অর্চনা। অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ সহের অতিরিক্ত এক ঝলক আলো সরাসরি চোখে এসে পড়লে যেমন হয় তেমনি। মা পিসিমাকে কিছু বলেছিল টেলিফোনে... মা? অর্চনার সমস্ত মুখ সাদা পাংশু। প্রথম সাক্ষাতে ঘুরেফিরে মায়ের সেই জেরা...ও টেলিফোন ছেড়ে গিয়েছিল কেন...পিসিশাশুড়ী কেন ডেকেছিল কিছু বলেছে কিন...দুর্ব্যবহার করেছে কিনা... অর্চনা ভেবেছিল, নির্দেশমত ও সত্যিই চলে এলো দেখে মায়ের কৌতূহল। ওর নিজেরই ভিতরটা ভারাক্রান্ত তখন, মায়ের জেরায় তাই বিরক্তি বেড়েছিল।

এক সময় খেয়াল হতে দেখে গাড়ি বাপের বাড়ির রাস্তা ধরেছে। ড্রাইভারকে অস্ফুট নির্দেশ দিল অন্য ঠিকানায় যেতে।

গাড়ি থেকে নেমে অর্চনা দোতলার দিকে তাকাল। ঘরে আলো জ্বলছে। ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলে দিল।

দরজা খুলে সাবি ওকে দেখেই নিশ্চিন্ত।–তুমি এসেই গেছ বউদিমণি, বাঁচা গেল–

তার দিকে চেয়ে অর্চনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু।–পিসিমা চলে গেলেন কেন সাবি?

ওমা, পিসিমা তো দুপুরে তোমার ওখান থেকেই এলেন, দেখা হয় নি?

অর্চনা মাথা নাড়ল।

সাবির কথায় কিছু বোঝা গেল না।–ক'দিনই থমথমে গম্ভীর দেখা গেছে তাঁকে, তারপর আজ চলে গেলেন।

অর্চনা পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এলো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে সুখেন্দু লিখছে কিছু। অর্চনা কাছে এসে দাঁড়াল। সুখেন্দু মুখ তুলে একবার তাকে দেখে নিয়ে আবার লেখায় মন দিল। বিস্মিত হয় নি, বরং জানত যেন আসবে। ও-াড়ি গেছলেন, পিসিমা জানিয়েছেন। আর, বউমার সঙ্গে দেখা হল না সেই খেদও প্রকাশ করেছেন। লিখতে লিখতে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, তুমি হঠাৎ...

পিসিমা চলে গেলেন কেন?

একটু থেমে মুখ না তুলেই জবাব দিল, আর থাকা সম্ভব হল না বলে।

কেন?

মুখ তুলে সুখেন্দু স্থির চোখে তাকাল। ওর ভিতরটাই দেখে নিতে চেষ্টা করল যেন। তারপর জবাব দিল, কেন সেটা আর তিনি মুখ ফুটে বলে যান নি।

আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

রুদ্ধ ক্ষোভ সংবরণ করে সুখেন্দ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, খবর দিলে কি হত?

তিনি যেতে পারতেন না। কেন খবর দিলে না, এতটাই জব্দ করার জন্যে?

জব্দ কিসের, খুশীই তো হওয়ার কথা। প্রচ্ছন্ন উষ্মায় বিদ্রুপের আভাস।

তার মানে? অর্চনা নিস্পলক চেয়ে আছে।

মানে তোমরাই জানো।

আমরা কারা?

ঘাড় ফিরিয়ে সুখে আবারও তাকাল তার দিকে।–তোমরা, তুমি আর তোমার মা।...অসহিষ্ণু হাতে কলমটা তুলে নিয়ে লেখার দিকে ঝুকল সে।

অর্চনা বেদনাহত, নিস্পন্দ। অব্যক্ত ব্যথায় খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। তার পর মাঝের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে চলে এলো। শয্যায় বসল। এ আঘাতের যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

দেয়ালের সেই পুরানো জায়গায় শাশুড়ীর ছবি। যাবার সময় মনে মনে আশা ছিল ফিরে এসে এই ছবি এখানেই দেখবে আবার। তাই দেখল। কিন্তু এরও আর যেন কোন সান্ত্বনা নেই। ছবি অনেক-অনেক দূরে সরে গেছে। সবই অনেক দূরে সরে গেছে।

বসে আছে মূর্তির মত। ছবির দিকেই চেয়ে আছে।

দুই চোখ-ভরা জল।

৭. বরুণার বিয়ে

বরুণার বিয়ে।

বিয়েবাড়ির আনন্দটা ঠিক কানায় কানায় ভরে ওঠে নি। অবশ্য আমন্ত্রিত অভ্যাগতজনেরা কেউ কিছু অনুভব করেন নি। বিজন আর ননিমাধবের সাড়ম্বর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নেই। সেদিক থেকে বিয়ে-বাড়ি সরগরম। আদর-অভ্যর্থনা, হাসি-খুশ, মাঙ্গলিক, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির ছড়াছড়ি।

এরই তলায় তলায় শুধু বাড়ির মানুষ ক'টির মনে একটা চাপা অস্বস্তি ক্রমশ থিতিয়ে উঠেছে। এমন কি ঘর্মাক্তকলেবর দাশু পর্যন্ত সহস্র কাজের ফাঁকে গাছকোমর শাড়ি-জড়ানো কর্মব্যস্ত বড় দিদিমণিকে দেখে বিমনা একটু। ও সামনাসামনি হলে বিজনের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ছে, মিসেস বাসু কলমুখর ব্যস্ততার মধ্যেও স্পষ্টই কিছু বলার ফাঁক খুঁজেছেন, আর ডক্টর বাসুও ওর দিকে চেয়েই অন্যমনস্ক হয়েছেন।

বিয়ে-বাড়িতে এখনো একজনের দেখা নেই।

সকলের সংশয়, হয়তো এর পর আর আসবেও না।

অর্চনাই শুধু এখনো ভাবছে না যে আসবে না। ভাবতে পারছে না।

পিসিমা যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটা রাতও সে বাপের বাড়িতে থাকে নি। মায়ের ক্ষোভ, দাদা-বউদির অনুরোধ, বরুণার অভিমান, এমন কি বাবার অনুরোধ সত্ত্বেও না। শেষের এই কটা দিনও খুব সকালে এসেছে আর যত রাতই হোক ফিরে গেছে। আর সেই কারণে ঘরের মানুষটাকে ভিতরে ভিতরে সদয়ও মনে হয়েছে একটু। ওর এত পরিশ্রম আর ছোটাছুটি দেখে দিনতিনেক আগেও সে ওকে বলেছে, এই কটা দিন তুমি সেখানে থাকতে পার, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

অর্চনা নিরুত্তাপ জবাব দিয়েছে, আমার হবে।

প্রগলভ সান্নিধ্যে এসে অর্চনা হয়তো অন্য কিছু বলতে পারত। আরো নরম, আরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আসার মতই কিছু। কিন্তু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে চিঠি লেখা, পিসিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বা ওর নিজের হরিদ্বারে যাওয়া নিয়ে আরো একাধিক রাত্রি নিঃশব্দে ওকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। সবকটা আবেদনের বিকৃত প্রতিফলনে রূঢ় আঘাত পেয়েই ফিরে আসতে হয়েছে। সে-আঘাত আজও থেকে থেকে টনটনিয়ে ওঠে।

দিনসাতেক আগে বাবা নিজে এসেছিলেন বড় জামাইয়ের কাছে। বলেছেন, সব দেখে-শুনে করে-কর্মে দিতে হবে, বলেছেন বাড়ির সকলেরই তো মাথা গরম কাজের কাজ কারো দ্বারা হবে না।

সব দেখে-শুনে করে-কর্মে দেবার জন্য যাবে, সুখেন্দু এমন কথা মুখে অবশ্য বলে নি। যায়ও নি। যাক, অর্চনাও মনে মনে চায় নি সেটা। মায়ের ভাবগতিক আর দাদার

বড়লোকী কাণ্ডকারখানা জানে। এই লোকের এই মানসিক অবস্থায় আগের থেকে যাওয়া মানেই গোলযোগের সম্ভাবনায় পা বাড়ানো।

তা বলে বিয়ের রাতেও আসবে না এমন সংশয় অর্চনার মনে রেখাপাতও করে নি। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে দমেই যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকজনের আনাগোনার দিকে সচকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে।

কাঁচা ক্ষতর ওপর অতি নরম পালক বুলেলেও অসহ্য লাগে অনেক সময়। বড় জামাইয়ের খোঁজে ঘনিষ্ঠ অভ্যাগতদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবাদও বাড়ির মানুষদের সেই রকমই লেগেছে। ছোটখাটো উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সামাজিক যোগাযোগে বড় জামাইটির সাক্ষাৎ কেউ বড় পায় নি বললেই চলে। অর্চনার বিয়ের পর অনেকেই হয়তো আর চোখেও দেখে নি তাকে। কাজেই এক বিয়েতে এসে ছোট জামাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে বড় জামাইয়ের তত্ত্ব-তালাসটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকে হয়তো কথায় কথায় নিছক সৌজন্যের খাতিরেই জিজ্ঞাসা করেছেন, বড় জামাই কোথায় বা বড় জামাইকে দেখলাম না! কিন্তু সেটুকুই বক্ত কৌতূহলের মত লেগেছে বাড়ির লোকেদের। বিজনের চাপ রোষ, মায়ের তার দ্বিগুণ, এমন কি বাবাও বিব্রত একটু।

সুস্থির বোধ করে নি অর্চনা নিজেও। একটু আগেই এক বান্ধবী সামনাসামনি চড়াও করেছিল ওকে, কি রে অর্চনা, তোর বরকে দেখছি না...কই?

অর্চনা হাসতে চেষ্টা করে ভ্রূকুটি করেছে–কেন, নিজেরটাতে পোষাচ্ছে না?

বান্ধবী অনুযোগ করেছে–থাক খুব হয়েছে, দু-বছর ধরে তো এমন আগলে আছিস যে একটা দিনও দেখলাম না ভদ্রলোককে।

অর্চনা বলেছে, তাহলে আর একটু ধৈর্য ধরে থা–এলেই দেখতে পাবি।

তখনো ধারণা, আসবে।

তার পর ইলা-মাসি জিজ্ঞাসা করেছে, ইলা-মাসির ছেলে মিন্টু খোঁজ করেছে, মাস্টার মশাই কোথায়?

নিচে এসেছিল বরুণার জন্যে এক গেলাস সরবত নিতে। বউদি এসে চুপি চুপি জানাল, এ বড় বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে...সবাই সুখেনবাবুর খোঁজ করছে, তোমার দাদা তোমাকে একবার টেলিফোন করতে বলছিল।

অর্চনা সরবত নিয়ে পাশ কাটাল। গম্ভীর মুখে বলে গেল, ইচ্ছে হয় তুমি কর গে–

বর এসেছে শুনে দোতলার মেয়েরা সব হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। হাতের গেলাস বাঁচিয়ে অর্চনার উপরে উঠতেও কম সময় লাগল না। তাদের বর দেখার হিড়িকে কনে-সাজে বরুণা ঘরে একা বসে। দিদির মুখের ওপর চোখ রেখে সরবতের গেলাস হাতে নিল। তার পর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল দিদি, জামাইবাবু এলো না রে?

অর্চনা থমকে তাকাল একটু। তার পর অনুশাসনের সুরে বলল, তোমার নিজের ভাবনা ভাব এখন–ওদিকে এসে গেছে।

দাঁড়াবার সময় নেই যেন, তাড়াতাড়ি বাইরে এলো। নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় বাবার ঘরের কাছাকাছি এসেছিল, সেইখানেও এই একজনের অনুপস্থিতির কারণে বাবা মায়ের বচসা কানে এলো... অর্চনা চুপচাপ সরে গেল। ডক্টর বাসু ঘরে এসেছিলেন আর একবার টেলিফোন করতে। টের পেয়ে মিসেস বাই সেই নিরিবিলিতে এসে চড়াও হয়েছেন।

তিনবার তো টেলিফোন করলাম, সাড়া না পেলে কি করব?–ডক্টর বাসু বিরক্ত।

সাড়া না দিলে সাড়া পাবে কি করে!–রাগে অপমানে মিসেস বাসু ক্ষিপ্ত। –আমাদের মুখে চুনকালি দেবার জন্যেই এ বিয়েতে সে আসছে না জেনে রাখো। কি লজ্জা, কি লজ্জা! যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই জিজ্ঞাসা করে বড় জামাই কোথায়? আমি আগেই জানতুম সে আসবে না–ওরা আজকাল একঘরে থাকে না পর্যন্ত সে খবর রাখো?

খবরটা ডক্টর বাসু স্ত্রীর মুখেই আজ পর্যন্ত অনেকবার শুনেছেন। বললেন, এ সব কথা থাক এখন, ওদিকে ডাকাডাকি পড়ে গেছে।

বিয়ের লগ্নও উপস্থিত একসময়। ছাদে বিয়ে। বাড়িসুদ্ধ লোক সেখানে ভি করেছে। এদিকটা ফাঁকা। অর্চনা পায়ে পায়ে বাবার ঘরে চলে এলো। আস্তে আস্তে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। নম্বর ডায়েল করল।

টেলিফোন বেজে চলেছে। অর্চনার শান্ত প্রতীক্ষা। ওদিক থেকে রিসিভার তোলার শব্দ এলো কানে। কণ্ঠস্বরের অপেক্ষায় সাতে করে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কণ্ঠস্বর নয়, ওদিকে রিসিভারটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখার শব্দ একটা। অর্চনা ফ্যাল ফ্যাল করে নিজের হাতের রিসিভারের দিকে চেয়ে রইল খানিক, আবারও কানে লাগাল ওটা। আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

রিসিভার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বাবার বিছানায় এসে বসল সে।

কিছু একটা কাজেই হয়তো মিসেস বাসু ব্যস্তমুখে ঘরে ঢুকেছিলেন। মেয়েকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। নীরব দৃষ্টি-বিনিময়। রুদ্ধ আক্রোশে যেন হিসহিসিয়ে উঠলেন তিনি, জামাই বলে তাকে আমি ছেড়ে দেব না, এ অপমানের কৈফিয়ত আমি নিয়ে ছাড়ব।

অর্চনা চেয়েই আছে।

মিসেস বাসু কটুক্তি করে উঠলেন, আগে যদি জানতুম এত ছোট, এত নীচ–

মা!

মা থতমত খেয়ে থেমে গেলেন। অর্চনা তাঁর পাশ কাটিয়ে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। বিয়ে হয়ে গেছে। বরকনেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হালফ্যাশানের বিয়ে, রাত দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বিয়েবাড়ি অনেকটা হালকা। অর্চনা

চুপচাপ নিচে নেমে এলো। ড্রাইভারকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। এত গাড়ি আসছে যাচ্ছে তখন–কেউ লক্ষ্য করল না।

.

দরজা খুলে সাবি বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই অর্চনা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বারান্দার দিকের দুটো ঘরের দরজাই আবজানো। দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অর্চনা নিজের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরে আলো জ্বলছে। পাশের ঘরেও। টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই স্তব্ধ রোষে সমস্ত মুখ কাগজের মত সাদা।

টেলিফোনের রিসিভারটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে তখনো। মাঝের দরজার দিকে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে রিসিভার তুলে রাখল। তার পর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে বসে বই পড়ছে।

অর্চনার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে আগুনের স্রোত। এক ঝটকায় তার হাত থেকে বইটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল, আমি জানতে চাই এর অর্থ কি?

সুখেন্দু চমকেই উঠেছিল। চুপচাপ তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে উঠে মেঝে থেকে বইটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার এসে বসল।-কিসের অর্থ?

আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ কি?

অপমান কিসের...তোমাদের ও-বাড়িতে যে আমি যাব না এ তুমি জানতে না?

কেন? কেন যাবে না?–অর্চনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আবারও।

হাতের বইটা টেবিলে রেখে সুখেন্দু জবাব দিল, যাব না তার কারণ সেখানে গেলে তোমার মা যে-ভাব দেখান, যে-ব্যবহার করেন আর যে-উপদেশ দেন তাতে আমিও খানিকটা অপমান বোধ করি।

আমার মা উপদেশ দেবে না তো উপদেশ দেবে বাইরের লোক এসে?

উপদেশ হলে কিছু বলতাম না, তিনি অপমান করেন–তোমাদের ও-বাড়ি আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

তা পারবে কেন?...রাগে কাঁপছে অর্চনা, নিজের নেই বলে যাদের আছে হিংসেয় তাদের কাছেও ঘেঁষতে চাও না, কেমন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুখেন্দু রূঢ় কঠিন জবাব দিল, হিংসে করার মত তোমাদের কিছু নেই, সেটা জানলে এ কথা বলতে না। আমার বরদাস্ত করার থেকেও, তুমি আমার মত একজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি না সে কথাটাই তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের আগে ভাবা উচিত ছিল।

কোন্ কথায় কোন কথা আসছে কারো হুঁশ নেই। আত্মসংবরণের চেষ্টায় অর্চনা টেবিলে একটা হাত রাখতে সেই বইটাই হাতে ঠেকল আবার। উষ্ণ ঠেলায় টেবিল থেকে পাঁচ

হাত দূরে মাটিতে ছিটকে পড়ল ওটা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বাবা-মার কথা থাক, আমি নিজে সব দিক ভেবেই এ-বাড়িতে এসেছিলাম সেটা তুমি টের পাও নি? কিন্তু তুমি? আজ এত বড় অপমানের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিতেও তোমার মায়া হয় নি। মানিয়ে চলার দায়িত্ব শুধু আমারই, তোমার নয়?

স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে সুখেন্দু জবাব দিল, না। পিসিমাকে যেদিন তাড়াতে গেছে সে দায়িত্ব সেদিনই গেছে।

কি বললে।... অর্চনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।

উত্তেজনা দমন করার জন্য সুখেন্দু উঠে মেঝে থেকে বইটাই কুড়িয়ে আনল আবার।

অর্চনার দুই চোখে সাদা আগুন। অনুচ্চ স্বরে বলল, তুমি অতি ছোট অতি নীচ...

আর দাঁড়ানো সম্ভব হল না, এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

.

ভাঙার পর্ব শেষ।

সকল সংগতির মাঝখান দিয়ে ভবিতব্যের ছুরি চালানো শেষ।

যে-কোন তুচ্ছ উপলক্ষে শান্ত বিচ্ছিন্নতা সম্ভব এখন।

এর পরের তিন মাসে, একটা নয়, এমনি অনেকগুলো উপলক্ষের সূচনা। পাশা পাশি দুটি ধরের দিনাবসানের মাঝে নির্বাক চিত্রের মতই সেগুলির আনাগোনা। অর্চনা নির্বাক দ্রষ্টা।

... চা নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে, আর একজন বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নামছে। চায়ের সরঞ্জাম হাতে অর্চনা দেওয়ালের দিকে একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সুখে নেমে চলে গেছে। অর্চনা দাঁড়িয়ে দেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে দোতলার বারান্দায় এসে দেয়ালের ধারে চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে এসে বসেছে। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে বুকের জামা ধরে ছদ্ম অনুশাসনে এই একজনকেই ওপরে টেনে নিয়ে এসেছিল। এই সেদিনের কথা, দু-বছরও নয়। কিন্তু বহুদিন যেন-বহু-দুরের কোন এক দিন।

...রাতে নিচের খাবারের টেবিলে দুজনের মুখোমুখি বসে আহারের যোগ টুকুও বিচ্ছিন্ন। অর্চনা যথাসময়ে টেবিলে প্রতীক্ষা করেছে। সাবি এসে টেবিল থেকে সুখেন্দুর খালাবাটি সব তুলে নিয়ে গেছে।–দাদাবাবু ওপরে খাবেন, দিয়ে আসতে বলেছেন–নিয়ে গেছে। অর্চনা চেয়ে চেয়ে দেখেছে। সে-দিন অন্তত ওর খাওয়া আর হয় নি। উঠে চুপচাপ নিজের ঘরের পাটের কোণে এসে বসেছে। ও-ঘরের আহার সমাধা হল টের পেয়েছে–তারপর ঈজিচেয়ারে বসে রাতের পাঠে মগ্ন। আলো নিবেছে এক সময়।...গাত্রোখান, শয্যালয়, ঘুম। এ-ঘরের আলো জ্বলছে। মাঝের দরজা দিয়ে সেই আলোর খানিকটা ও-ঘরে গিয়ে পড়েছে। সেই আলোর ওপর ছায়া পড়েছে একটা। মাঝের দরজায় অর্চনা এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই আছে। ও-ঘরে সুপ্তির ব্যাঘাত ঘটে নি।

...খাটে অর্চনা বসে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত, তার সামনেই একটা চেয়ারে বিজন বসে। সে-ও বিস্মিত, কিছুটা বিভ্রান্ত। কলেজ থেকে সুখেন টেলিফোনে বিজনকে জানিয়েছে, শিগগিরই সে এক মাসের জন্য বাইরে যাচ্ছে, কেউ এসে যেন অর্চনাকে নিয়ে যায়। বিজন নিতে এসেছে। অথবা অর্চনা কিছুই জানে না। তাই বিস্ময়, সেই সঙ্গে অস্বস্তি। এ-বাড়ির বাতাসের গতি তারাও উপলব্ধি করতে পারে। মা হাল ছাড়তে বাবা নিজেই হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অর্চনাই জামাইয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ঘটতে দেয় নি তার। নীরবে মাথা নেড়ে বাধা দিয়েছে। অস্বস্তি চেপে বিজন বসে থাকতে পারে নি বেশিক্ষণ, বলে গেছে, সুখেন্দু চলে গেলেই না হয় এসে তাকে নিয়ে যাবে। অর্চনা জবাব দেয় নি। কখন উঠে চলে গেছে তাও হুঁশ নেই।

উপলক্ষগুলি এই রকমের।

এমনি আরো দুটি ঘটনার পর উপলক্ষেরও প্রয়োজন থাকল না আর। একটা রাতের ঘটনা, অন্যটা দিনের।

ঘরের আলো নিবিয়ে সুখেন্দু শুয়ে পড়তেই মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরে আলোর ঝলক তার অন্ধকার শয্যার কাছাকাছি এসে থেমে আছে। বিছানায় গা ঠেকালেই ঘুম হয়, তবু কি জানি কেন সেদিন ওই আলোটুকুই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল। শেষে একসময় উঠে এসে সরাসরি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অর্চনা জানালার কাছে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছুই দেখছিল না, এমনিই দাঁড়িয়েছিল। শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেবে, মাঝে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের

অগোচরে দুই-এক পা সরে এলো। নিল র পর।. পাকাপাকি ব্যবধান রচনা, পাকাপোক্ত জবাব। দরজা বন্ধ হতে ঘরের আলোটা জোরালো লাগছে, হলদে, দরজাটা চকচক করছে। একটা অশুভ ইজিত চকচকিয়ে উঠছে যেন।

অর্চনা আলোটা নিবিয়ে দিল।

পরদিন।

অর্চনা তখন নিচে স্নানের ঘরে।

মেঝেতে উবুড় হয়ে সুখেন্দু মায়ের সাবেকী আমলের বড় ট্রাঙ্কটা খুলে বসেছিল। ট্রাঙ্কটা তার এই ঘরেই। গরম জামা-কাপড় সব ওতেই থাকে। বাইরে বেরুতে হলে যা-যা নেবে বার করে রোদে দিয়ে ঠিকঠাক করে রাখা দরকার। তাছাড়া কি আছে না আছে তাও স্মরণ নেই।

তার পিছনে সাবি দাঁড়িয়েছিল। একটু অপেক্ষা করে সে যে চলে গেছে সুখেন্দুর খেয়াল নেই। মেঝের চাবির গোছাটা একটু জোরেই পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এটা রেখে এসো।

চাবিটা সড়সড় করে টেবিলের নিচে গিয়ে থামল। যা-যা বার করেছিল একবার পরীক্ষা কবে সুখেন্দু সেগুলো নিয়ে ছাতে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটা হাতে হরিয়া ঘরে ঢুকেছে। দাদাবাবু দু-দশ মিনিটের জন্যে ঘর থেকে না বেরুলে ঘর ঝাঁট দেবার অবকাশ হয় না।

এই কাজটুকু সারবার জন্য সকালের মধ্যে অনেকবারই ফিরে যেতে হয় আর সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয়।

টেবিলের নিচে চাবিটা চোখে পড়ল। হরিয়া ওটা তুলে সামনের দোলকের কোণে রেখে দিয়ে গেল।

অর্চনার সেই চাবির খোঁজ পড়ল দুপুরে খেতে নামার আগে। মোজই খেতে যাবার আগে চাবি নিয়ে নামে। আসার সময় ভাড়ার রামার সব বন্ধ করে আসে।

বিছানা উল্টে-পাল্টে অর্চনা চাবি খুজছে। অবাক একটু।

এদিকে দেরি দেখে সাবি তাড়া দিতে এসে জিজ্ঞাসা করল কি খুঁজছ, চাবি?

কিছু না বলে অর্চনা শুধু তাকাল তার দিকে।

সাবি জানাল, বউদিমণি ধরে ছিল না বলে দাদাবাবু বিছানার নিচে থেকে চাৰিটা তাকেই এনে দিতে বলেছিল। চাবি দাদাবাবুর কাছেই।

অর্চনার মুখের দিকে চেয়ে সাবি যে-জন্যে এসেছিল তা আর বলা হল না, পায়ে পায়ে প্রানি করল। অর্চনা খাটের বাহু ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় বসে পড়ল। নির্বাক, অনুভূতিশূন্য।...শুধু এটুকুই বাকি ছিল। এইটুকুই শুধু বাকি ছিল। মাঝের দরজার দিকে চোখ গেল।

দরজা বন্ধ।

বিকেল থেকেই আকাশের রঙ অন্যরকম। সূর্যাস্তসীমার ওধারে কালো মেঘের ভিড়। একটার সঙ্গে আব একটা জুড়েছে, আর একটার সঙ্গে আর একটা। ছেঁড়া ত্বকের মত মেঘের গা-ছেঁড়া দগদগে লাল আলো। বিকেল শেষ হতে না হতে পাটকিলে রঙের অন্ধকারে ঘর ছেয়ে গেল।

অর্চনা উঠল এক সময়। আলো জ্বালল।

ও-ঘরের আলো জ্বলতে সে এসেছে টের পেল। আবার বেরুলো, তাও। ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে আসাটাও। সাবি যথারীতি রাতের খাবার রেখে এ-ঘরে এলে তাগিদ দিতে। দুপুরেও খাওয়া হয় নি বউদিমণির, তাই রাত্রিতে আর ভাত ঢেকে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। অর্চনা জানালার কাছ থেকে একবার ফিরে তাকিয়েছে শুধু। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি চেপে সাবি ফিরে গেছে।

দূরে দূরে ক্ষীণদ্যুতি তারাগুলোর অসময়ে ঘরে ফেরার তাড়া। টুপটুপ করে একটার পর একটা নিবেছে। মেঘের পায়তাড়া চলছে সেই থেকে। টিপটিপ দুই এক ফোঁটা পড়ছে কখনো-সখনো। বর্ষণের নাম নেই, ভ্রুকুটি বেশি।

রাস্তার লোক-চলাচল কমে আসছে।

টেবিলের টাইমপীস ঘড়িটায় রাত দশটা বাজে।

সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে শুয়ে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে। শান্ত মুখে অর্চনা বারান্দা দিয়ে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই দু-চার মুহূর্ত দেখল। তারপর ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

বই নামাও। কথা আছে!

সুখেন্দু বই নামাল, তাকাল।

খুব শান্ত কণ্ঠে অর্চনা বলল, বিয়ের পর থেকে আমাদের বনিবনা হল না, সেটা বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না?

একটু থেমে নিস্পৃহ জবাব দিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

অর্চনার দুই চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ।–তাহলে চিরকার এভাবে চলতে পারে না বোধ হয়?

সুখেন্দু নিরুত্তর। চেয়ে আছে।

অর্চনার মুখের একটা শিরাও কাঁপছে না। কণ্ঠস্বর আরো ঠাণ্ডা, আরো নরম। বলল, আমাদের তাহলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল, কেমন?

সুখের মুখে চকিত রুক্ষ ছায়া পড়ল একটা। তার পর স্থির সে-ও।– কি করে?

অর্চনা তেমনি শান্তমুখে বলল, আইনে যেমন করে হয়।

আত্মস্থ হবার জন্য সুখেন্দু হাতের বইখানা টেবিলে রাখল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে পায়চারি করল একবার। আবার বসল। ভাবল কিছুক্ষণ।

অর্চনা জবাবের প্রতীক্ষা করছে।

সুখেন্দু জবাব দিল। বলল, যদি তাই চাও আমার দিক থেকে কোন বাধা আসবে না।

আর একটুও অপেক্ষা না করে ধীর শিথিল পায়ে অর্চনা এ-ঘরে চলে এলো। টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে বসল। ভাবলেশহীন পাথরের মূর্তি।

বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। উঠল। আস্তে আস্তে আবার ওই জানালার কাছেই দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে আছে।

রাত বাড়ছে। নিচের রাস্তাটা নিঝুম। অবসানের মুহূর্তগুলি শূন্যতার মন্ত্রে নিটোল ভরাট হয়ে উঠছে ক্রমশ।

স্তব্ধতায় ছেদ পড়তে লাগল। বাতাস দিয়েছে। বিকেল থেকে আকাশের যে সাজ-সরঞ্জাম শুরু হয়েছিল সেখানে তাড়া পড়েছে। অনার হুঁশ নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। খোলা চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচলের অর্ধেক মাটিতে লুটিয়েছে।

বাতাসের জোর বাড়তে লাগল। মেঘে মেঘে বিদ্যুতের চলাফেরা, বাতাসে ঝড়ের সংকেত। অদূরে গাছ দুটোর সসড় মাতামাতি। লাইট পোস্টের আলোগুলো কবলিত মেয়ের মত বিড়ম্বিত, নিষ্প্রভ।

ঝোড়ো বাতাসে আর বৃষ্টির ঝাপটায় অর্চনার সম্বিৎ ফিরল।

জানালা বন্ধ করে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়াল। দু চোখ মাঝের বন্ধ দরজা থেকে ফিরে এলো। টেবিলের টাইমপীস ঘড়িতে রাত্রি একটা। পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো সে। সুখের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল আবার। ঘরে আলো জ্বলছে।

বই-কোলে ঈজিচেয়ারে শুয়ে সুখেন্দু অধোরে ঘুমুচ্ছে। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঝড়জলের ঝাপটা আসছে। অর্চনা ঘরে ঢুকে জানালা বন্ধ করল। ফিরে আসার মুখে ঈজিচেয়ারের সামনে দাঁড়াল একটু। দেখল চেয়ে চেয়ে। তারপর বিছানা থেকে পাতলা চাদরটা তুলে নিয়ে তার গায়ে ঢেকে দিয়ে আস্তে আছে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

৮. বিচ্ছেদের পরোয়ানা

দু পক্ষের অনুমোদনের ফলে যা ঘটবার সহজেই ঘটে গেছে।

বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরিয়েছে।

বাপের বাড়ির আবহাওয়া রীতিমত গরম সেদিন। বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গেছে একটা। বিজনের উত্তেজনা, বরুণার উত্তেজনা, মায়ের উত্তেজনা। বিজন পারলে তক্ষুনি আর একটা বিয়ে দিয়ে দেয় অর্চনার। হাতের কাছে তেমন পাত্র মজুত নেই নাকি?

আছে সকলেই জানে। এমন একটা দিনে ননিমাধবও এসেছে। তার ফস। মুখখানি একটু বেশি লাল হয়েছে, পকেট থেকে ঘন ঘন রুমাল বেরিয়েছে। ওদিকে শুভার্থী আত্মীয়-পরিজনও কেউ কেউ এসেছেন। আজকালকার দিনে এটা যে এমন কিছু ব্যাপার নয়, বার বার সে-কথাই ঘোষণা করে গেছেন তারা।

অর্চনা তার নিজের ঘরে। বিয়ের আগে যে-ঘরে থাকত। নিচের জটলায় তারও নিঃসঙ্কোচ উপস্থিতি সকলের কাম্য ছিল। বিশেষ করে মায়ের আর দাদার। যার জন্য এত বড় গুরুভার লাঘব করার চেষ্টা, সে একপাশে সরে থাকলে নিস্পত্তিটা খুব সহজ মনে হয় না।

আর অনুপস্থিত বাড়ির কর্তা ডক্টর বাসু। অবশ্য এ-সভায় তিনি অবাঞ্চিতও বটেন। তাঁর অনুমোদন ছিল না সেটা সকলেই জানত। কিন্তু আজ আর তাকে আমল দিচ্ছে কে, হুট করে এমন একটা বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বলেই তো এ রকমটা ঘটল। নিজের ঘরে

বসে স্তব্ধ বিষণ্ণতায় চুরুট টানছেন। ইদানীং ঘন ঘন চুরুট ফুরোচ্ছে। দাণ্ডকে পাঠিয়েছেন বাক্স ভরে চুরুট কিনে নিয়ে আসতে।

তিনি না এলেও মিসেস বাসু অব্যাহতি দেন নি। তাঁর কাছে এলে থেকে থেকে জ্বলে উঠেছেন, সেই অমানুষ লোকটার বিরুদ্ধে যে একটা দিন শান্তিতে থাকতে দেয় নি তার মেয়েকে-এবারে হাড় জুড়োবে। সমর্থন না পেয়ে স্বামীর ওপরেই আগুন।–যত কিছুর মূলে তুমি, তুমি তো চুপ করে থাকবেই এখন!

ডক্টর বাসু তার পরেও চুপ করে থাকেন নি। গম্ভীর আদেশের স্বরে বলেছেন, তুমি দয়া করে যাবে এখান থেকে?

মিসেস বাসু হকচকিয়ে গেছেন। এ-ধরনের কণ্ঠস্বর বড় শোনেন নি। মুখে যতই বলুন, মেয়ের জন্য দুর্ভাবনায় ভিতরে ভিতরে মায়ের মন শুকিয়েছিল বটেই। অসহায় ক্ষোভে সেটুকুই প্রকাশ হয়ে গেছে।-ও... আমাকে বুঝি এখন তোমার সহ্য হচ্ছে না! কোথা থেকে একটা অপদার্থ অমানুষ ধরে এনে সংসারটাকে একেবারে তছনছ করে দিলে, অপমানে অপমানে মেয়েটার হাড় কালি-তার দিকে একবারও চেয়ে দেখেছ তুমি?

নারীর বল চোখের জল। কান্নার বেগ সামলাবার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

বাড়ির মধ্যে সেদিন বিমর্ষ দেখা গেছে আর একজনকে। দাঁত। বাক্স ভরা চুরুটের গোটাকতক অন্তত তার পকেটেই থাকার কথা। কিন্তু খেয়াল ছিল না। দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গতি তার আপনি মন্থর হয়েছে।...জানালার দিকে মুখ করে বসে

আছে, বাইরে থেকে সে-মুখের আভাস দেখা যায় শুধু। চুরুটের বাক্সটার দিকে চেয়ে আর-একদিনের স্মৃতি তার মনে পড়েছে। বড় মিষ্টি স্মৃতি। সেদিনের পাওয়ার আনন্দে দিদিমণি নিজের হাতে ওর পকেটে একটা চুরুট গুঁজে দিয়েছিল।

নিচের ঘরে বরুণার উত্তেজনা এবং আক্রোশ দুই-ই স্বতঃস্ফুর্ত। বার বার বলেছে– ঠিক হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, যেমন লোক তেমন শিক্ষা হয়েছে। তার দিদিকে হেনস্থা করেছে যে লোকটা তার কত বড় শিক্ষা হল সেটা ভেবে ডগমগিয়ে উঠছে থেকে থেকে। বিজনকে জিজ্ঞাসা করেছে-আচ্ছা, খবরটা কাগজে বেরুবে?

অদূরে বসে তার স্বামী বেচারা যে ওর আনন্দ-মিশ্রিত উত্তেজনাটুকু করুণ নেত্রে লক্ষ্য করছে সেদিকে খেয়াল নেই।

স্বামীর কাছে অবর্ষণ করতে হলেও ছেলের কাছে সত্যিকারের সান্ত্বনা পেয়েছেন মিসেস বাসু। বিজন বলেছে–অত মুষড়ে পড়লে চলে, এ-রকম তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এই তো কোর্টে দেখে এলে তিন হাজার খুলছে এই কেস, তারা কি সব চোখে অন্ধকার দেখছে?

ভরসার অঙ্কটার ওপরেই জোর দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাণু দেবী। তিন হাজার।

কম করে। তোমরা তো তবু চট করেই রেহাই পেয়ে গেলে-যা হবার হয়ে গেল, ভালই হল। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে বিজন আশ্বস্ত করেছে মাকে। বলেছে, আইনের কড়াকড়ির সময়টা পেরুলেই এমন বিয়ে দেবে অর্চনার যাতে গায়ে আর আঁচটি না লাগে সারা জীবনে।

এত বড় আশ্বাসের গাত্রটি কে তাও সকলেই জানে।

দিন কাটতে লাগল।

এর মধ্যে দুটি পরিবর্তন হয়েছে। এক, বাসা-বদল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিপরীত এলাকায় বিজন বড় বাড়ি ভাড়া করেছে। নিজেদের বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের বাসনা। তাছাড়া পূর্বস্মৃতির কাছাকাছির মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়, নতুন পরিবেশে অর্চনারও কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব।

দ্বিতীয়, অর্চনা আবার এম. এ. পড়া শুরু করেছে।

দিন যায়। অর্চনার মনে হত, কি করছে সেই মানুষটা, মনে মনে কেমন জ্বলছে, জানতে পেলে হত। জানার উপায় নেই বলেই নিজে জ্বলত। জীবন থেকে যাকে ধুয়ে মুছে ফেলেছে, মন থেকে তাকে বিদায় দেওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না বলেই আরো জ্বালা। পার্টি ভাল লাগে না, ক্লাব না, থিয়েটার না। বই পড়ে। দিনরাত্রির বেশির ভাগই বই নিয়ে কাটে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরি থেকে আসতেও বেশ রাত হয় এক-একদিন। কিন্তু বইও ভাল লাগে না সক সময়।

সকলেরই একটা চোখ আছে তার দিকে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে যে একজনের সস্নেহ দৃষ্টি আর আহ্বানের আশায় ভিতরটা প্রতীক্ষাতুর সর্বদা, তিনি যেন চেনেনও না ওকে। তিনি বাবা। সামনাসামনি হলেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। বিরক্তও হন! অর্চনা পারলে

তার সামনে আসে না। বাবা ঘরে না থাকলে সংগোপনে তার ঘর গুছিয়ে রেখে আসে। তার পর একটা দুর্বহ বেদনা বুকে চেপে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে।

বাবার উপেক্ষা মা অবশ্য দ্বিগুণ পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে কিছু একটা প্রোগ্রাম করে মেয়ের মত নিতে আসেন প্রায়ই। অর্চনা কখনো নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকে, আবার অকারণে ঝাঁঝিয়েও ওঠে এক-একদিন। ননিমাধবের সিনেমার টিকিট কেনা নিয়ে সেদিনও মায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ হয়ে গেছে। অর্চনা সবে যুনিভার্সিটি থেকে ফিরেছিল। ননিমাধবের গাড়িটা প্রায়ই যেমন দাঁড়ানো দেখে, সেদিনও তেমনি দেখেছিল। নিজের ঘরে এসেই একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে।

মা ভিতরে ঢুকে প্রসন্ন মুখে সংবাদ দিয়েছেন, ননিমাধব সকলের জন্য সিনেমার টিকিট কেটে বসে আছে, তার জন্যেই সকলের প্রতীক্ষা এখন।

সকলের অর্থাৎ দাদা বউদি। অর্চনা মায়ের মুখের ওপর একটা শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বই হাতে আবার পাশ ফিরে শুয়েছে।

মা মনে মনে শঙ্কিত।–শুয়ে পড়লি যে, শরীর খারাপ হয় নি তো?

না।

ওঠ তাহলে, চট করে মুখ হাত ধুয়ে নে–আর সময় নেই।

ওঁদের যেতে বলে।

ওদের যেতে বলব...ননিমাধব যে চারখানা টিকিট কেটে এনেছে।

বই রেখে অর্চনা আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। মাকে নিরীক্ষণ করেছে একটু।–আমার টিকিটে তুমিই যাও তাহলে।

মিসেস বাসুর মেয়ের এই বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবের সঙ্গেই যুঝতে হচ্ছে ক্রমাগত। বলেছেন, কি যে করি ভাল লাগে না, ওঠ

ভাল আমারও লাগে না মা।–অর্চনা চেষ্টা করেও খুব শান্ত থাকতে পারে নি, কতদিন তোমাকে নিষেধ করেছি তবু তুমি কেন এভাবে আমাকে বিরক্ত করে বলো তো?

আমি তোকে বিরক্ত করি!–মা আকাশ থেকে পড়েছেন প্রথম। তার পর সখেদে প্রস্থান–আমারও হয়েছে যেমন জালা তাই সবেতে আসি, তোর যা খুশি কর, আর কখনো যদি কিছু বলতে আসি–

কিন্তু আবারও বলতে না এসে পারেন নি তিনি। সরাসরি না বললেও চুপ করে থাকতে পারেন নি। ননিমাধবের কর দিনে দিনে বাড়ছে। এলেই চা করে দেন, ভালমন্দ খবর নেন, কারণে-অকারণে অর্চনাকে ঘরে ডাকেন। বরুণা

শ্বশুরবাড়িতে থাকে, আসে প্রায়ই, মায়ের সঙ্গে তার গোপন পরামর্শের আভাসও অর্চনা পায় একটু আধটু। . যে বরুণা ননিমাধবকে দেখলেই মুখ চোত আর দিদিকে ঠাট্টা

করত, সে-ও আজকাল ঠাট্টা দূরে থাক, কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়েই ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। পারলে একটু যেন তোয়াজ করে চলে। আর, দাদা-বউদির কথাই নেই। ননিমাধবের মত এমন লোক তায় একজনের বেশি দুজন দেখেছে বলে মনে হয় না।।

দাদা বা মায়ের বিশেষ এক ধরনের ডাক শুনলেই অর্চনা বুঝতে পারে, ঘরে কেউ আর আছে, আর সে ননিমাধব ছাড়া আর কেউ নয়। ওর ভিতরের বিরক্তি বাইরে তেমন প্রকাশ পায় না। ডাকলে সাড়া দেয়, থরে আসে, কথা বলে। আর রুমালে মুখ ঘষতে ঘষতে একখানা কর্ণা মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাও লক্ষ্য করে।

অর্চনা আর বিয়ে করবে না এমন কথা কখনো বলে নি, এমন মনোভাবও কখনো প্রকাশ করে নি। সেই বিচ্ছেদের দিন থেকেই বলতে গেলে তার আবার বিয়ের কথা উঠেছিল। কিন্তু আইনগত বাধার আর সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সম্ভবত প্রথম বছরটা কেউ সরাসরি এ-প্রস্তাব তোলে নি। তার পর তার ভাবগতিক দেখে কথাটা সামনা-সামনি তুলতে তেমন ভরসাও পেয়ে ওঠে নি কেউ। যেটুকু বলে, আভাসে ইঙ্গিতে। অর্চনা তার জবাবও দেয় না। সকলেই মনে মনে তখন তার এম এ পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

সেই বহু প্রতীক্ষার এম এ পরীক্ষাও হয়ে গেল।

ফল দেখে আনন্দে আটখানা সকলে। ননিমাধব সকালেই মস্ত এক ফুলের তোড়া এনে হাজির। মিসেস বাসু আনলে সেদিন তাকে সোজা অর্চনা ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।–তুমি তো ঘরের ছেলে, নিজের হাতেই দাও গে যাও।

সিঁড়িতে রাণু বউদি আর একদফা চাঙ্গা করেছে তাকে। উৎফুল্ল ইশারায় ঘর দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ঘরেই আছে, সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়ুন

কিন্তু ঢুকে পড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছে ননিমাধব। নিরাসক্ত মুখে পরীক্ষা পাসের কোন আনন্দ চোখে পড়ে নি। দোরগোড়া থেকে একটু নিরীক্ষণ করে ঢোঁক গিলে বলেছে, আসব?

অর্চনা অন্যদিকে ফিরে ছিল। ফুলের তোড়া হাতে তাকে দেখে একটু থেমে বলেছে, আসুন–

ননিমাধব আরক্ত মুখে তোড়া এগিয়ে দিয়েছে।

ফুল হাতে নিয়ে অর্চনা খুশীর ভাব দেখাতেও চেষ্টা করেছে একটু।...কি ব্যাপার–

সকালে উঠেই এম এ রেজাল্ট দেখলাম—

ও...। অর্চনা মুখ হাসির মতই। সহজভাবে বলল, এ পাবার মত একমন কিছু রেজাল্ট হয়নি।

ননিমাধবের সলজ্জ বিস্ময়ে, সে কি! ফার্স্ট ক্লাস–

অর্চনা বলতে যাচ্ছিল, ফার্স্ট ক্লাস ফি-বছরই দুই-একজন পায়। কিন্তু রুমালের খোঁজে পকেটে হাত ঢুকতে দেখে বলা হল না। ওদিকে উৎফুল্ল আনন্দে দিদিকে ডাকতে

ডাকতে বলাও হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ফুল এবং ননিমাধবকে দেখে যেমন খুশী তেমনি অপ্রস্তুত।

আপনি। আমি এসেছিলাম দিদিকে কংগ্রাচুলেট করতে—

ননিমাধব বলল, আমিও।

অর্চনা তাকের থেকে ফুলদানি এনে টেবিলে ফুলের তোড়া রাখছিল। বরুণা খুশী মুখে ননিমাধবকে আপ্যায়ন করল। টেবিলসংলগ্ন চেয়ার আর বিছানা ছাড়া বসার আর জায়গা না দেখে ননিমাধব ইতস্তত করছিল।

বাইরে থেকে বিজনের ডাকাডাকিতে ছন্দপতন। সাড়া দিয়ে বিরসবদনে প্রস্থান করতে হল তাকে।

বরুণা হেসে ওঠার মুখেও সামলে নিল, দিদির গম্ভীর মুখের দিকে তাকালে হাসি আসে না। অর্চনা বিছানায় বসে তাকে ডাকল, বোস, তোর কি খবর?

তার গা ঘেঁষে বসল বরুণা।–খবর তো আজ তোর, বা-ব্বা কি পড়াই পড়লি দুবছর ধরে।...তার আরো কাছে এসে উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা করল, দিদি, বাবা খুব খুশী হয়েছেন রেজাল্ট শুনে?

কি জানি...

বরুণা থমকে তাকাল।

একটা উদগত অনুভূতি সামলে নিয়ে অর্চনা হাসল একটু, তারপর আস্তে আস্তে বলল, যারা এই দু বছরের মধ্যে একটা দিনও আমার সঙ্গে ডেকে কথা কন্ নি রে।

বরুণা জানত। আর বাবার ওপর রাগই হল তার। উঠে দাঁড়াতে গেল, তাই বুঝি, বাবাকে দেখাচ্ছি মজা–

অর্চনা হাত ধরে বসিয়েই রাখল তাকে উঠতে ছিল না। চুপচাপ দুজনেই। দুজনেরই চোখ ছলছল।

এর পর যত দিন যায়, অর্চনার বিয়ের চিন্তায় মনে মনে উদগ্রীব সকলে। এ. এ. পাশ করার পর ননিমাধবের হাজিরাও নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়ের গরজ বালাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবাহ-প্রসঙ্গটা তিনি এখন উত্থাপন করলেন মেয়ের কাছে। করে, ধমক খেলেন। তার পর মায়ের তাড়নায় ভয়ে ভয়ে হাল ধরতে এলো বরুণ। এসে সে-ও ধমক খেল। সব শেষে বউদি। রঙ্গরস করে তিনি অগ্রসর হলেন, বলি ব্যাপারখানা কি?

বসে কি একটা পড়ছিল অর্চনা। মুখ তুলে তাকাল।

রোজ রোজ ভদ্রলোক এসে বসে থাকেন, দেখে মায়াও হয় না একটু?

অর্চনা তেমনি চেয়ে আছে। একটু বাদে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কি করতে বলো?

অস্বস্তি চেপে বউদি একটু জোর দিয়েই বলল, বিয়েটা করে ফেললেই তো চুকে যায়।

ভিতরে ভিতরে তেতে উঠলেও সেটুকু প্রকাশ পেল না। বিয়ে করব কোনদিন তোমাদের বলেছি?

বলছ না বলেই তো ভাবনা–

তোমরা এই ভাবনা-টাবনাগুলো বাদ দিয়ে চললে আমার এখানে থাকাটা একটু সহজ হয় বউদি।

গম্ভীর মুখে আবার বই টেনে নিল সে। বউদি পালিয়ে বাঁচল।

বই রেখে অর্চনা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। পড়াশুনো নিয়ে ছিল ভাল। এই ঢালা অবকাশ দুর্বহ। স্মৃতিপথে যারা ভিড় করে আসে দু-হাতে তাদের ঠেলে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত সে। প্রতিটি দণ্ড পল মুহূর্ত ভারি বোঝার মত।

রাস্তায় দুটো মেয়ে পুরুষ গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। পুরুষের গলায় সস্তা একটা হারমোনিয়াম বোলানো, মেয়েটির কাঁধের দুদিকে দু-পা ঝুলিয়ে বসে একটা কচি বাচ্চা। হালকা গান। এই দুনিয়ায় নারী-পুরুষের অনাবিল বিনিময় গানের বিষয়বস্তু। অনেকে শুনছে, কেউ কেউ পয়সা দিচ্ছে। অর্চনা নির্নিমেষে দেখছে। জীবন-ধারণের একটা যৌথ প্রচেষ্টা দেখছে। মেয়েটার কাঁধের শিশুটিকে দেখছে।

অর্চনার সর্বাঙ্গে কিসের শিহরণ। চেষ্টা করেও পারছে না অন্যমনস্ক হতে। ঝাপসা চোখের সামনে একটা অয়েল-পেন্টিং ছবি এসে পড়ছে বার বার। সেই ছবিতে নারীর আকুতি। অব্যক্ত নীরবতায় সেই নারী যেন ওই প্রতীক্ষা করে ছিল, ওর কাছেই কিছু

চেয়েছিল। সেই চাওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বসে ছিল আর একটি বৃদ্ধা বিধবা।...আর তারা চাইবে না। তাদের চাওয়া শেষ।

অর্চনা জানালা থেকে সরে এলো। ভিতরটা ধড়ফড় করছে কেমন।

অব্যক্ত যাতনায় মন থেকে সবকিছু আবার বেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল সে। আবার পড়বে। হোক একটা বিষয় নিয়ে আবারও পড়ায়ে শুরু করবে।

সঙ্কল্পটা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকের ভি ভাবনা। বিশেষ করে মায়ের আর বিজনের। এখনই একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। পড়াশুনায় এগিয়ে গেলে আবারও দু বছরের ধাক্কা। এম. এ পাস করেছে তার সাত-আট মাস হয়ে গেল।

অর্চনা জানে, ননিমাধবের সঙ্গে তার বিয়েটা সম্পন্ন করার পিছনে দাদারই আগ্রহ আপাতত সব থেকে বেশি। শুধু বন্ধু নয়, এতবড় এক উঠতি ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার। তাকে আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে ষোল-আনা নিশ্চিন্ত।

রাত্রিতে সেদিন দাদার ঘরে ডাক পড়তে অর্চনা এসে দেখে, ঘরে শুধু মা আর দাদা বসে। সঙ্গে সঙ্গে কেন ডাকা হয়েছে অনুমান করতে দেরি হল না।

বিজন মোলায়েম করে বলল, বোস, কি করছিলি?

কিছু না।...বিছানার একধারে মা বসে, অন্য ধারে সে-ও বসল।

বিজন জিজ্ঞাসা করল, তুই আবার কি নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করছিস শুনলাম?

অর্চনা জবাব দিল না। দোরগোড়ায় ডক্টর বাসু এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকেই চোখ গেল সকলের। একবার দেখে নিয়ে তিনি দরজার কাছ থেকে সরে গেলেন। বিজন ভণিতা বাদ দিয়ে সোজা আসল বক্তব্য উত্থাপন করল। এম. এ. পাস তো হয়েই গেছে, আবার পড়াশুনো কিসের–তাছাড়া, তুই এভাবে থাকবি কেন, আমি তো কিছু বুঝি না।

অর্চনা দাদার চোখে চোখ রাখল।–তোমার কি ইচ্ছে?

মিসেস বাসু নীরবে ছেলের দিকে তাকালেন। বিজন আমতা-আমতা করে বলল, আমার ইচ্ছে, আমার কেন–আমার, মার, তোর বউদির, সকলেরই ইচ্ছে, হাতের কাছে এমন একটি ছেলে

কিভাবে বলে উঠবে কথাটা ঠিক করতে না পেরে ধমকাল একটু। মিসেস বাসু সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক সুলভ মন্তব্য করলেন, হীরের টুকরো ছেলে ...

অর্চনা অপলক চোখে বিজনের দিকেই চেয়ে ছিল।–এই জন্যে ডেকেছ?

ভাবগতিক দেখে বিজন মনে মনে ঘাবড়েছে। আরো মিষ্টি করে বলল, হ্যাঁ, কথাটা তো ভেবে দেখা দরকার–

দরকার দেখতেই পাচ্ছি! তোমার স্বার্থটা কোথায় আমি জানি দাদা, কিন্তু—

স্থির কঠিন চোখে মায়ের দিকে ফিরল সে।

মিসেস বাসু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এ আবার কি কথা। আমরা তো তোর ভালর জয়েই বলছি–

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা জলে উঠল যেন। এতদিনের ধৈর্যের প্রয়াস এক মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল।–ভালর জন্যে বলছ, আমার ভালর জঙ্গে–না মা?...মুখে চোখে নির্মম বিপ। আমার শুধু ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় তোমার মত ক'জন মা ক'টি মেয়ের এত ভাল করছে।...আরো তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে, কিন্তু কেন? কেন এত ভাল করতে চাও তোমরা? কেন ভাল করার এত মোহ তোমাদের? তোমাদের ভাল করার এই নিষ্ঠুর লোভে জ্বলে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল মা।

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। অন্য দুজন চিত্রার্পিত। প্রাণপণ চেষ্টায় অর্চনা সামলে নিল একটু। আস্তে আস্তে দাঁড়াল।-কিছু মনে করো না মা, আমার ভাল তোমরা অনেক করেছ...দোহাই তোমাদের, আর ভাল করতে চেয়ো না।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অদূরের রেলিঙের কাছে স্তব্ধ মূর্তির মত আরো কেউ দাঁড়িয়ে, চোখে পড়ল না। নিজের ঘরে এসে শয্যায় মুখ ঢাকল সে।

পায়ে পায়ে রেলিং ছেড়ে ওর দোয়গোড়ায় এসে দাঁড়ালেন ডক্টর বাসু। দেখলেন। ভিতরে এসে বিছানার এক পাশে বসলেন। তার পর আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন মেয়ের পিঠের ওপর।

সূচিপত্র

অর্চনা মুখ তুলল। গাল বেয়ে অঝোরে ধারা নেমেছে। নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। দুই হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে অর্চনা ছোট মেয়ের মত বাবার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজল এবার।

ডক্টর বাসু গভীর মমতায় মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দু-চোখ তাঁরও চিক চিক করছে।

.

দিন যায়। বছর ঘুরে আসে আরো একটা।

মা বলতে গেলে একরকম তফাতেই সরে আছেন। আর কারো কোন ভাল-মন্দে নেই যেন তিনি। দাদাও চুপচাপ, নির্লিপ্ত। শুধু বাবার ঘরেই আগের মত ডাক পড়ে অর্চনার। আগের মত নয়, আগের থেকেও বেশি। আলোচনার ঝোঁকে এক-একদিন সব দুর্ভাবনা সত্যিই ভোলেন তিনি।

কিন্তু অর্চনা ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়েই উঠছে। বিষয়ারে প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষা দেবে আবার, ঠিক করেও পড়াশুনা বলতে গেলে এগোর নি। এক একসময়ে ভাবে, চাকরি-বাকরি নিয়ে কোথাও চলে যাবে। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার দরুন চাকরি সহজেই জুটতে পারে। কিন্তু তাতেও উৎসাহ নেই খুব। তার ওপর কোথাও দরখাস্ত করেছে দেখলে বাবাই প্রকারান্তরে বাধা দেন বলেন, করবি'খন চাকরি, এত তাড়া কিসের, চাকরি না করলেও তোর কোন ভাবনা নেই।

নেই বলেই এমন ক্লান্তিকর শূন্যতা। কোন কিছুর জন্যেই আর ভাবনা নেই তার। সব ভাবনা চুকিয়ে বসে আছে। এমন ভাবনাশুন্যতার মধ্যে নিজের অস্তিত্বটাই দুর্বহ বোঝার মত মনে হয়। বাড়িতেও আর অশান্তির কারণ নেই। কিছু, গৃহকর্তার নিষেধ আছে কেউ যেন ওকে উত্ত্যক্ত না করে। কাদার সামনে মায়ের মুখের ওপর সেই মর্মান্তিক আলা প্রকাশ করে ফেলে অর্চনা নিজেই অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছে।...নিজেরই ভাগ্য, দোষ কাকে দেবে।

একটানা অবকাশে আর একজনের কথাও মাঝে মাঝে ভাবে। জীবনের সঙ্গী হিসেবে যাকে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি, সেই একজনের কথা। ননিমাধব–। এখনো আসে। দাদা আর মায়ের মুখ চেয়েই বুঝতে পারে বোধহয় একটু কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। তবু আসে...তার এই নীরব প্রতীক্ষা যাতনার মত বেঁধে। ইচ্ছে করলেই ভাল বিয়ে করতে পারে, সুখী হতে পারে। কিন্তু সেটা তাকে বুঝিয়ে বলে কে। অর্চনা ভাবে, সম্ভব হলে ও নিজেই একদিন বলবে। ননিমাধব এলে ওকে আর ডাকাডাকি করে ঘরে আনতে হয় না। নিজে থেকেই এসে বসে এক-একদিন। দু-পাঁচটা সাধারণ কথাও বলতে চেষ্টা করে, চা করে দেয়।

কিন্তু ওইটুকুই যে-ভাবে নাড়া দেয় ভদ্রলোককে দেখে সব সময় আবার সামনে যেতেও ইচ্ছে করে না। তার চোখে-মুখে প্রত্যাশার আলো দেখে থমকে যায়। অর্চনা দিকতকের মত নিজেকে গুটিয়ে ফেলে আবার।

কি-ই বা করতে পারে এছাড়া। ওর জীবন-বাস্তবে, যৌবন-বাস্তবে ঘর মতই আবির্ভাব যার তার আনন্দ বিষাদ হিংসা ক্রোধ সবই পুরুষের। সেই পুরুষ ছিনিয়ে নিতে জানে।

নিয়েছেও। ওখানেই নিঃশেষে সর্বসমর্পণ ওর বিধিলিপি। ...আজও সেটুকু গোপন স্মৃতির মতই। ও-যে কিছুই আর হাতে রেখে বসে নেই। এই রিক্ততা নিয়ে নতুন করে আবার একজনের সঙ্গে আপস হবে কেমন করে।

এক বছরে মানুষ অতি বড় বিপর্যয়ও তোলে, মায়ের আর দাদার রাগ বা অভিমান ভোলাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া অর্চনার শান্ত পরিবর্তনটুকুও হয়তো কিছুটা আশার কারণ তাদের। বউদি আয় মায়েতে মিলে গোপনে গোপনে আবার বেন কি পরামর্শ শুরু হয়েছে একটা।

অর্চনা হঠাৎ শুনল, কিছুদিনের জন্যে বাইরে বেড়াতে বেরুনো হবে। দাদা জানাল, অর্চনার জন্যেই বিশেষ করে চেঞ্জে ঘুরে আসা দরকার, দিনকে দিন তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া একঘেয়ে ব্যবসায়ের ঝামেলায় ক্লান্ত নাকি নিজেরাও। নিজেরা বলতে আর কে অর্চনা বুঝে নিল। দাদার মুখের ওপর আপত্তি করতে পারল না। এমনিতেও বাদ-প্রতিবাদ আর কারো সঙ্গেই করে না বড়। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে সত্যিই এমন ক্লান্ত যে কোথাও বেরুনোর প্রস্তাবটা নিজেরই খারাপ লাগল না। তার ওপর বাবাও ওকে ডেকে বললেন, তোর শরীর সত্যিই ভাল দেখছি না, ওদের সঙ্গে–দিনকতক ঘুরে-টুরে এলে ভালই লাগবে।

সত্যিই বেরিয়ে পড়া হল একদিন। অর্চনার ইচ্ছে ছিল বরুণাও সঙ্গে থাক। কিন্তু তার নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি মিলল না। আসলে বরুণ নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে এবং দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে সরে রইল। চারজনে বেরিয়েছে। সদা বউদি ননিমাধব আর অর্চনা।

দিল্লীতে দিনকতক থেকে যাওয়া হবে আগ্রায়। আগ্রায় আবার দিনকতক থাকা, তারপর প্রত্যাবর্তন।

একেবারে কাছাকাছি থাকার দরুন এবারে কিছুটা সহজ হল ননিমাধব। তার রুমালে করে মুখ মোছা কমতে লাগল। দলের দুজন যে তার দিকে সে তো জানেই, এই বেড়ানোর তাৎপর্যও জানে। সুযোগ-সুবিধে মত অর্চনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ অন্য দুজনেই করে দেয়।

অর্চনাও সদয় ব্যবহারই করছে তার সঙ্গে। হেসে কথা বলে কথা শোনে। সে ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাস স্মৃতি বা ইতিহাস-নিদর্শনের প্রতি ননিমাধবের সদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হেসেই জবাব দেয় যেটুকু জানে। অন্য দুজনের শোনার থেকেও দেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই দেখার সমারোহের মধ্যে দেখতে দেখতে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়বে তার, সে আর বিচিত্র কি।

দিল্লী-পর্ব সেরে আগ্রায় আসার মধ্যেই ননিমাধব মনে মনে অনেকটা ভরসা পেয়েছে। তার থেকেও বেশি ভরসা পেয়েছে–বউদি। আগ্রায় এসে ইতিহাসের আয় ছাড়াও অন্য দু-চারটে কথা বলতে শুরু করেছে ননিমাধব। যেমন, বেড়াতে কেমন লাগছে, আজকাল কথা এত কম বলে কেন অর্চনা, ইত্যাদি।

তাতেও বিরূপ বা বিরক্ত হতে দেখা যায় নি অর্চনাকে। চতুর্থবার তাজমহল দেখতে দেখতে ননিমাধবের কথা শুনে তো বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিল। ননিমাধব একটা বড়

নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, তাজমহল যে প্রেমের স্মৃতি-সমাধি, এখানে আসার আগে এমন করে কখনো মনে হয় নি–শাজাহানের দীর্ঘনিঃশ্বাস গুলোই যেন জমে পাথর হয়ে আছে।

অর্চনাকে হঠাৎ অমন হেসে উঠতে দেখে ননিমাধব অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। লজ্জায় ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। দাদা বউদি উৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। অর্চনা হেসেই বলেছে, কেন তোমরা রোজ রোজ এই তাজমহলে আস বল তো...ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে যায়।

এতদিনে বিজন মনে মনে সত্যিই পার্টনারের তারিফ করল। খুশীর কানাকানি চলতে লাগল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। একটা গুরু বোঝা হালকা হল।

পরদিনের প্রোগ্রাম ফতেপুর সিক্রি।

মাইল পঁচিশ দূর আগ্রা থেকে। মোটরে চলেছে সকলে। দূর থেকে ইতিহাসের স্মৃতি-সমারোহের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অর্চনার দিকে চেয়ে ননিমাধব নীরব কৌতূহলের আভাস পেল।

মোটর থেকে নামতেই তিন-চারজন গাইড ছেঁকে ধরল তাদের। এই ব্যাপারটা দিল্লীতেও দেখেছে, আগ্রাতেও দেখেছে। অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একজন অতিবৃদ্ধ গাইড। শনের মত সাদা চুল, সাদা দাড়ি। পরনে সাদা মলিন ঢোলা আলখাল্লা। জোয়ানদের সঙ্গে ঠিকমত পাল্লা দিতে পারে না বলেই হয়তো সবিনয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি কেউ নিজে থেকেই ডেকে নেয়।

ডেকে নিল। কে জানে কেন তাকেই পছন্দ হল ননিমাধবের। বুড়ো মানুষ, দেখাবে-শোনাবে ভাল।

সামনেই আকাশ-ছোঁয়া সিঁড়ির সমারোহ। বিশাল, বিস্তৃত সিঁড়ি। প্রতিটি সোপান মর্ত্যের মানুষের কালোত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর। সকলে উঠতে লাগল। অনেক দূর থেকে কোন মুসলমান পীরের যান্ত্রিক সুরের স্তোত্র-গান ভেসে আসছে। অদ্ভুত যুক্ত পরিবেশ। কাল যেন এক অপরিমেয় স্মৃতিভার বুকে করে এইখানটিতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

সিঁড়ির শেষে বিশাল চত্বর। গাইড ঘুরতে লাগল তাদের নিয়ে। গল্প করতে লাগল। ইতিহাসের গল্প। এটা কেন, ওটা কি ইত্যাদি। চোস্ত উদ্র অনেক কথাই বোঝা গেল না। কেউ চেষ্টাও করল না বুঝতে। গাইড আপন মনে তার কাজ করে যাচ্ছে, অর্থাৎ বকে যাচ্ছে–এরা নিজেদের মনে কথাবার্তা কইতে কইতে দেখেছে। শুধু অর্চনারই দু-চোখ ইতিহাস-স্মৃতি-প্রাচুর্যের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সকলে। শেষ নেই যেন। রাণুদেবী এক জায়গায় বসে পড়ল, তোমরা ঘোরর বাবা, আমি আর পারিনে

জলের ফ্লাস্কের জন্য হাত বাড়াল সে। ফ্লাস্ক বিজনের কাঁধে। অতএব বিজনও বিশ্রামের সুযোগ পেল একটু। ওদিকে গাইডের পাশে অর্চনা, কাজেই তার পাশে ননিমাধব। তারা এগিয়ে চলল আবার। ওই দুজনের বসে-পড়াটা মিষ্টি কিছু ইঙ্গিত মনে করে শ্রান্তি সত্ত্বেও ননিমাধব তুষ্ট এবং উৎফুল্ল। কিছু একটা বলার জন্যেই এক সময় মন্তব্য করল,

কি উদ্ভট শখ ছিল আকবর লোকটার, এ-রকম একটা ছন্নছাড়া জায়গায় এসে এই কাণ্ড করেছে বসে বসে!

গাইড তার কথাগুলি সঠিক না বুঝুক, বক্তব্য বুঝল। গল্পের খোরাক পেল আবার।–শখ নয় বাবুজি, শাহান-শা বাদশা এখানে ফকির চিশতির দোয়া মেঙে সব পেয়েছিলেন বলেই এখানে এই সব হয়েছিল।

গাইড বলতে লাগল, এই তামাম জায়গা তো জঙ্গল ছিল, কেউ আসত না, শের আর বুনো হাতী চরত। শাহান-শা আকবর যুদ্ধফেরত এখানে এক রাতের জন্য আটকে পড়েছিলেন। এই ভীষণ জঙ্গলের গুহায় সাধন-ভজন করতেন এক পয়গম্বর পুরুষ–ফকির সেলিম চিশতি।...

কথা শুনতে শুনতে এগোচ্ছিল ওরা। খুব যে আকৃষ্ট হয়েছিল এমনও নয়। ননিমাধব তো নয়ই। অর্চনার মন্দ লাগছিল না অবশ্য। গাইড গল্প বলে চলেছে, এতবড় বাদশা সেই ফকিরকে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন!

...তাঁর দোয়া মাঙলের বাদশা।

শাহান শার মনে ছিল বেজায় দুঃখু। খাস বেগমের দু-দুটো ছেলে হয়ে মরে গেছে, আর ছেলে হয় নি। তখৎ-এ-তাউসে বসবে কে? কাকে দিয়ে যাবেন মসনদ।

ফকির চিশতি বললেন, আল্লার দোয়ায় বাদশার আবার ছেলে হবে। বেগমকে এইখানেই নিয়ে আসতে বললেন সেলিম চিশতি। আকবর বাদশা তাই করলেন। ন-মাস ছিলেন

এখানে বাস বেগমকে নিয়ে। তার পর ছেলে হল। ছেলের মত ছেলে। বাদশা জাহাঙ্গীর। শাহান-শা গুরুর নামে ছেলের নাম রাখলেন সেলিম। আর ফকিরগুরুর আশ্রমে বাস করবেন বলে সব জাল সাফ করে এখানে এত বড় রাজদরবার গড়ে তুললেন তিনি। ফকির বই বাদশা আকবর আর কিছু জানতেন না।

কখন যে নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুরু করেছে অর্চনা নিজেই খেয়াল নেই। হঠাৎ কেন এমন করে স্পর্শ করল এই কাহিনী তাও জানে না। শুনতে শুনতে একটি সমাধির কাছে এসে দাঁড়াল তারা। মার্বেল পাথরের অভ্র সমাধি লাল কাপড়ে জড়ানো চারিদিকে নক্সাকাটা পাথরের জালি দেয়াল।

গাইড জানাল, এই ফকির চিশতির সমাধি।

অর্চনা কেমন যেন অভিভূত। দেখছে চুপচাপ। আর কি-একটা অজ্ঞাত আলোড়ন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সেই জালির দেয়ালে অসংখ্য সুতো আর কাপড়ের টুকরো বাঁধা। সুতোয় আর কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত দেয়ালটাই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

গাইডকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কি?

গাইড জানাল, যাদের ছেলে হয় না তারা ছেলের জন্য ফকিরের দোয়া চেঙে এই সুতো বা কাপড় বেঁধে রেখে যায়। কত দুর দূর দেশ থেকে নিঃসন্তান মেয়েরা সুতা বাঁধার জন্য এখানে আসে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীস্টান, সবাই আসে। ছেলে কামনা

করে এখানে এসে ভক্তিভরে সুতো বেঁধে দিলে ছেলে হবেই। ফকিরের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না–তিনশ বছর হয়ে গেল কিন্তু লোকের বিশ্বাস আজও যায় নি।

অর্চনার কানে আর এক বর্ণও ঢুকছে না। কি একটা সুপ্ত ব্যথা খচখচিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখ। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ফকিরের সব কথা ননিমাধব শোনে নি। কিন্তু অর্চনার দিকে চেয়ে থমকে গেল সে।–কি হল?

জবাব না দিয়ে অর্চনা সুতো-বাঁধা সেই জালির দেয়ালের চারদিকে ঘুরতে লাগল। মুখে অব্যক্ত যাতনার চিহ্ন, চোখে নিষ্পলক, বিভ্রান্ত আকুতি। অজস্র সুতো বাঁধা-সুতোর পর সুতো। এই প্রত্যেকটা সুতো যেন এক একটা রক্ত-মাংসের কি হয়ে দেখা দিতে লাগল চোখের সামনে।

অজস্র, অগণিত তাজা শিশু!

কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় অর্চনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আবারও কাছে এগিয়ে এল ননিমাধব। কি হল? খারাপ লাগছে কিছু?।

তার কথায় হঠাৎ যেন সচেতন হল অর্চনা। তাকাল। এপলকে ভেবে নিল কি। সমস্ত মুখ আরক্ত তখনো। বলল, না, গরম লাগছে, একটু জল পান কি না দেখুন তো...

হন্তদন্ত হয়ে জলের সন্ধানে ছুটল ননিমাধব। জলের তৃষ্ণা দু-চোখে এমন করে ফুটে উঠতে জীবনে আর দেখে নি কখনো।

ননিমাধব পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা একটা কাণ্ড করে বসল। ফ্যাশ করে দামী শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে ফেলল। বৃদ্ধ গাইডের বিমূঢ় চোখের সামনেই সেই শাড়ির টুকরো জালির দেওয়ালে বেঁধে দিয়ে স্কুত সরে এল সেখান থেকে। সর্বাঙ্গে থরথর কাপুনি। দেহের সমস্ত রক্তই বুঝি মুখে উঠে এসেছে।

গাইড কয়েক নিমেষ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি বুঝল সে-ই জানে। টেনে টেনে বলল ফকিরের দোয়া কখনো মিথ্যে হয় না মাইজী, শুচিমত থেকে। আর বিশ্বাস করে।

জল নিয়ে এসে ননিমাধব হতভম্ব। কারণ অর্চনা অন্যমনষ্কের মত বলল, জলের দরকার নেই। দাদাবউদিও এসেছিল, ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক তারাও। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হয়েছে।

অর্চনা কথা বলতে পারছে না। নিজেকে আড়াল করতে পারছে না বলেই বিব্রত হয়ে পড়ছে আরো বেশি। ছেঁড়া শাড়ির আঁচল ঢেকে ফেলেছে, তবু অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, শরীর ভাল লাগছে না, এক্ষুনি ফেরা দরকার।

দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল সে। ব্যাকুল, উদগ্রীব। একটা মুহূর্তও হাতে নেই যেন আর। তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগল।

সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি। মাগো! এ-সিঁড়ির কি শেষ নেই?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাড়াহুড়ো করে সকলে হোটলে ফিরল আবার। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটে গেল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে সকলেই বিভ্রান্ত একেবারে। দাদা-বউদি ননিমাধবকেই এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কিন্তু সে-ও বিমূঢ় কম নয়।

অর্চনা ঘোষণা করল সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতা ফিরবে। আবারও আকাশ থেকে পড়ল সকলে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরে না কারো। স্থানীয় ডাক্তার ডেকে ব্লাড প্রেসার দেখিয়ে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে সকলেরই। কিন্তু শোনামাত্র অর্চনা রেগে উঠল এমন যে সকলে নির্বাক।

ট্রেনে সারা পথ এক অধীর প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে ছটফট করতে দেখা গেল তাকে। বেশি রাতে অন্য দুজন যখন তন্দ্রাচ্ছন, ননিমাধব কাছে এল। সত্যিকারের আকৃতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বলবে না?

অর্চনা সচকিত হয়ে তাকাল। কিছু একটা ভাবনায় ছেদ পড়ল। ও-টুকু স্নেহের স্পর্শেই দু-চোখ ছলছল করে এল। অস্ফুট জবাব দিল, কি বলব।

এভাবে চলে এলে কেন?

তেমনি মৃদুকণ্ঠে অর্চনা বলল, আসা দরকার যে ... আবারও তাকাল। হঠাৎ এই মানুষটির জন্যেও বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। একটা উদগত অনুভূতি ভিতরে ঠেলে দিয়েই অস্ফুট স্বরে বলল, একটা কথা রাখবেন?

উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ননিমাধব আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো শুধু।

আমাকে ভুলে যান। নইলে এত অপরাধের বোক আমি বইব কেমন করে!

জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মুখ ফেরাল সে। বিস্ময়ে বেদনায় ননিমাধব বোবা একেবারে।

কলকাতা।

হঠাৎ এভাবে ফিরতে দেখে মিসেস বাসু পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বিজন বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার মেয়েকে, আমরা কিছু জানি না।

মেয়েকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে ডক্টর বাসুও কিছু হদিস পেলেন না। ধীরে-সুস্থে জানা যাবে ভেবে আর উত্ত্যক্ত করতে চাইলেন না।

দুপুরের দিকে বিজন বেরিয়েছে। বউদি রাতের ক্লান্তি দূর করছে।

অর্চনা চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল।

ট্রাম থেকে নেমে একটুখানি হাঁটা-পথ, তার পর বাড়ি। অর্চনা সমস্ত বাড়িটাকে একবার দেখে নিল।

দরজা বন্ধ। বন্ধই থাকে।

কড়া নাড়ল। একবার, দুবার—

সাড়া নেই।

আরো জোরে কড়া নাড়ল। মনে মনে হিসেব করছে, যতদূর মনে পড়ে এ দিনটা অফ-ডে। নাকি রুটিন বদলেছে কলেজের। কিন্তু তাহলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কেন, বাইরে তালা ঝোলার কথা। অবশ্য, সাবি থাকতে পারে

ও-দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ।

শরীরের সমস্ত রক্ত আবার মুখে এসে জমেছে অর্চনার।

দরজা খুলল। অর্চনা স্তব্ধ।

দুপুরের ঘুম-ভাঙা চোখে দরজা খুলেছে একটি মেয়ে। বিবাহিত। সুশ্রী স্রস্ত বেশবাস। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু।

দরজা খুলে মেয়েটিও অবাক একটু।

। আচমকা ধাক্কাটা অর্চনা যেন যন্ত্র-চালিতের মতই সামলে নিল। জিজ্ঞাসা করল, এবাড়িতে কে থাকেন?

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না। দরজার নেমপ্লেটে সুখেন্দু মিত্রের নাম লেখা। আর শিশুটির মুখের আদলেও তার জবাব লেখা।

মেয়েটি ইশারায় নেমপ্লেটটাই দেখিয়ে দিল।

ও... অর্চনা বিব্রত মুখে হাসল একটু, আমি ঠিকানা ভুল করেছি। হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি শিশুটির গাল টিপে দিল।–বেশ ছেলেটি তো...আপনাদের ছেলে?

মেয়েটির মুখে তুষ্টির আভাস একটু। মাথা নাড়ল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, আপনি যাবেন কোথায়?

অর্চনা ব্যস্তভাবে জবাব দিল, এই এ-দিকেই যাব, আপনাকে বিরক্ত করলাম... নমস্কার।

আর জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসৎ না দিয়ে ছেলেটির গালে আর একবার আঙুল স্পর্শ করে অতি-আধুনিকার মতই টক-টক করে রাস্তায় নেমে এলো অর্চনা বসু ...

.

সূচিপত্র

০৯. পাখি-ডাকা আবছা

পাখি-ডাকা আবছা অন্ধকারে ভোরের আভাস।

খরখরে দু-চোখের ওপর দিয়ে আর একটা রাতের অবসান। অর্চনা বসু উঠবে। ঈজিচেয়ারটা ঠেলে ভিতরে নিয়ে যাবে। তার পর, হাত-মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে ঝিমুবে খানিক। দাশু চা নিয়ে আসবে। পর পর দু-তিন পেয়ালা চা খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে সে, চান করে আসবে। ইস্কুলের খাতা দেখে বা বই পড়ে কাটবে কিছুক্ষণ। তারপর শুচি শুভ্র বেশবাসে নিজেকে ঢেকে ইস্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে।

সেই ধপধপে সাদা পোশাক। আর সাদাটে ব্যবধান।

গাইডের শুচি-মত থাকার নির্দেশ ভোলে নি।

আর, তার কথা-মত বিশ্বাসটাও দূর করে উঠতে পারে নি।